বন্দরের কাল

বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ

আষাঢ়—১৩৬৬

প্রকাশক

জি, বসু

পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা—৭

মুদ্রাকর

সুনীল সাহা

নিউ ইম্পিরিয়াল প্রেস

১২২বি, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড,

কলিকাতা—৫

প্রচ্ছদ

মণীন্দ্র মিত্র

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই

আলম এ্যাণ্ড কোং

চার টাকা

শিল্পিশ্রেষ্ঠ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

এই কাহিনীর কোনো কোনো অংশ 'মাসিক বসুমতী' ও 'তেরো নদী' পত্রিকায় 'অঙ্গরাগ', 'বন্দরের কাল' ও 'অবাক পৃথিবী' নামে প্রকাশিত হ'য়েছিলো—

প্রায়-বিস্মৃতির তীর ঘেঁষা, আবছা-অস্পষ্ট দেখতে পাওয়া প্রাতঃ-কৈশোরে প্রথম-ক্রিকেট্ খেলায় প্রথম 'রান' করে, ভয়ে ভয়ে, আর ততোধিক রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম—'নোঙর' বলে, উইকেটের সামনের মাটিতে ব্যাট্ ঠুকে—।

কী হাসি সেজদার!

—নোঙর কীরে গাধা? শব্দটা nomore!

এখন নানা রকম হ'লেও, তখন সকলেই রান শেষ-সূচক ঐ একটি শব্দই ব্যবহার করতো। নোমোর শব্দটা ইংরিজী বটে, তবে নোঙরটা বাংলা হ'লেও, খুব যে বেশি শুনেছিলাম এমন নয়। হঠাৎ কেমন এসে গিছলো যেন। আমাকে অপদস্থ দেখে আমার সর্বাঙ্গ-খেলোয়াড় মেজদা এগিয়ে এলেন ত্রাণকর্তা হ'য়ে; —আমাকেই জোরালো সমর্থন—।

—কেন, ভুল কী বলেছে ও? একটা নতুন কথা বলেছে বরং! ও হয়তো নিজেই জানে না যে একটা মৌলিক expression-এর সৃষ্টি করে বসল হঠাৎ। আসলে রান করতে করতে মাটিতে ব্যাট্ ঠুকে নোঙরই করে থাকি আমরা! ইংরিজী শব্দটার পরিবর্তে এটার ব্যবহারে সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য, ধ্বনি, অর্থ আর ব্যঞ্জনা—না কি যেন সব বলে—আরো বেশি করে ঝরে পড়বে বলেই মনে হচ্ছে; আরো effective হবে যাকে বলে!

এগিয়ে এসে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন মেজদা—বহোৎ আচ্ছা সুবুলাট্! তুই একটা ক্রিয়েটিভ্-জিনিয়াস!—Go ahead my boy!!

কেন জানিনা, আমার ডাকনামের সঙ্গে মেজদা একটা 'লাট্' যোগ করে তৃপ্তি পেতেন—। সাধারণ ছেলেকে ঐ বয়সে লাটে

তুললেও, বলা বাহুল্য, লাটে আজ পর্যন্ত উঠিনি ;—তবে ডকে উঠেছি অস্বীকার করিনা! সেই যে নোঙর আমার সঙ্গে লেগে থাকলো, তো থাকলোই! নোঙরটা যে আমার জীবনের সঙ্গে এমন ভীষণ ভাবে গেঁথে থাকবে তখন কী আর জানতাম? ঘুরে ফিরে, কতো কীই করে, শেষে কিনা পোর্টে চাকরি? জাহাজ নোঙর করানোই কাজ?

ছুষ্টু-শব্দটা আমার কর্ত্তব্যের অঙ্গ জাহাজ নোঙর করানোয়, আমার জীবিকার একটা প্রতীক হয়ে থেকেই সন্তুষ্ট হলোনা,—সঙ্গে সঙ্গে আসল যাযাবর বৃত্তি-দিলো আমাকে, তিষ্ঠুতে দিলোনা একজায়গায় বেশিদিন। নোঙরের প্রয়োজন বন্দরে বন্দরে, মাঝ-দরিয়ায় বাঁধার জন্যে—। ভেসে ভেসে বাঁধা আর বেঁধে বেঁধে ভাসা। ওর প্রয়োজন স্থিতির জন্যে নয়, গতির নেশায় ক্ষণিক ঝিম্ লাগাবার জন্যে। আমাকে তাই করিয়ে নিয়ে চলেছে। এখানেও টিকলো কই? চাকরি ছেড়ে পাড়ি দিতে হচ্ছে—।

—বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হ'লো শেষ—!

হ্যাঁ সুমিতা! এ বন্দরের পালা সত্যিই শেষ হলো আমার। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? শোনো তবে—

চার বছর আগে এক জাহাজ তার অরিজিন্যাল শিপ্-ইয়ার্ড থেকে বাণিজ্য যাত্রা করে ভিড়েছিলো এ বন্দরে। কোলকাতা বন্দর। কিন্তু ঐ যে বললাম—বন্দরের কাল থাকে: সীমিত সেখানের স্থিতির মেয়াদ। ফুরোল এবার—। এখানকার সার্ভিস কণ্ডিশনের মোটা কাছিও ধ'রে রাখতে পারলো কই? আমার পণ্য-বোঝাই শেষ বোধ হয়! তাই নোঙর তুলে নিয়ে—যাত্রা হলো শুরু—।

আমি একাই নই। আমার মতো বা আমার চেয়ে ছোট বড় অনেককেই এ বন্দর ত্যাগ করতে হয়েছে। কেউ কেউ আবার

অন্য জগতের অজানা অন্ধকার বন্দরের দিকে পাড়ি জমিয়েছে দেখেছি—।

কতো—কতো !—সংখ্যা নেই—।

আমার একার হলে এতো কথা বলতে হতো না হয়তো—। তাদের সবাইকে নিয়েই কথা ; কথা আর কথা,—কাহিনীও—। এই আমার পণ্য। আমি বোঝাই। কতোই তো ভ'রেছি—। সমস্ত কাজে লাগাতে পারব কিনা সন্দেহ থাকায় তোমাকেই দিলাম উজাড় করে। আজ মুক্ত আমি। স্বস্তির নিঃশ্বেস পড়ছে দেখো—। তোমাকে অনেক কিছুই ছিলো দেয়। দেয়া তো হলো না প্রায় কিছুই—। আফসোস্—। তবু যা হোক, মনটা উজাড় করতে পেরেছি বলেই যা সান্ত্বনা। সেই ভর্তির দিনের ফুর্তি, আর আজ মুক্তির আনন্দ ; ভালোয় মন্দোয় মেশানো,—হর্ষ—বিষাদ !

—আশ্চর্য !—

প্রত্যহের রুদ্রাক্ষ দিয়ে গাঁথা চার-বছরের-মালা, চলন্ত ট্রেনের দুপাশের ভূপ্রকৃতির মতো চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে ঘুরে সরে সরে যাচ্ছে—তার কথা-কাহিনী-ঘটনার পরম্পরা নিয়ে—বাঁধা গতিতে—।

স্পষ্ট—।

ফুটে উঠছে সেই প্রথম দিন—

—রোজারিও !

—ইয়েস স্যার !

—আর্ণ্টউ মাই সার্ভেণ্ট ?

ইয়েস্ বস্ ! এ্যাম্ ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট্ সার্ভেণ্ট্ ! অলওয়েজ্ এ্যাট্ ইওর সার্ভিস স্যার !!

—গিভ্ মি এ সিগ্রেট্ !

আমি অবাক।—

একটা ভদ্র-ভিখিরী ক্লাসের লোক। ছেঁড়া ধলধলে ট্রাউজার; মুহুরির কাছে অনেকটা ফাড়া; পায়ে পায়ে লেগে কিংবা ছেঁড়া, ফটফটে, পেরেক ওঠা স্যাণ্ডালের গোড়ালি লেগেই হয়তো—! কোমরে এক নারকোলের দড়ির মনোমত বেল্ট টান টান করে বাঁধা—। জামাটার আদি রঙ-নির্ণয় গবেষণার অপেক্ষা রাখে—। রুক্ষ কালিপড়া চেহারা। গালে কপালে আরো কালো চামড়ার আস্তরণ—বোধহয় লিভার-স্পট্—। ওকে, রোজারিওকে, অমন করে ডাকে কী করে?—

প্রথম দিন। সবেমাত্র নিয়োগ-পত্র নিয়েছি কয়লাঘাটের প্রধান অফিস থেকে। বিচিত্র দর্শন। সেই শুরু। অফিসের সামনে রোজারিওর সঙ্গে আলাপ। সুপার কারগো। অর্থাৎ কিনা জাহাজের মাল বোঝাই আর খালাসের তদারকি—মজতুর পরিচালনার কাজ—। মাইনে ভালোই। ফিরিঙ্গী—। কিন্তু অবাক এইজন্যে যে এহেন ভিখিরীটা ঐ রকম করে কথা বলে কী করে? আর রোজারিওই বা সহ্য করে কোন আক্কেলে? কোনো কূলকিনারা পেলাম না ওর ব্যবহারের। ইতিমধ্যে রোজারিও একটা সিগ্রেট্ বার করে দিয়েছে।

—সিজারস্? ফুঃ! হাউ ডেয়ার ইউ—! ক্যাপ্স্ট্যান ম্যান, ক্যাপ্স্টান !!

—ও, কে, স্যার! জাষ্ট্ এ মিনিট—!

রাস্তার ওপাশে রেল-অফিসের চাতালে বসে থাকা মোটা সোটা বৌবাজার-বাসিনী পানওয়ালীর কাছ থেকে একটা ক্যাপ্স্টান নিয়ে দৌড়ে এলো রোজারিও, লোকটার হাতেও দিলো। মুখে লাগিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল লোকটা! তারপর হঠাৎ চড়ানো ভাঙ্গা ঝাঁজালো গলায় ফ্যাঁসফ্যাঁসিয়ে উঠল—লাইট্ ইট্ আপ্ ম্যান! আর্ণ্টউ মাই সার্ভেন্ট্? —ইয়েস্ স্যার! রোজারিও কাঁপা কাঁপা হাতে আগুন ছুঁইয়ে দিলো সিগারেটে—

গাঁজা খাওয়ার ভঙ্গীতে প্রাণপণে একটা টান দিয়ে লোকটা নিজের অন্ধকার অন্ধকার মুখই আড়াল করে ফেললো ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়।

—Where is Wilkinson?, I saw him just now ! Fled away?, Afraid of me ? Ha ! Ha !!

রোজারিও ভালোই জানতো Wilkinson কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, তবু বলল, ডোণ্ট্ নো স্যার ! পারহ্যাপস্— !

ড্যাম্ ইট্ ! গিভ্ মি ফাইভ্ পাইস্ রোজারিও, গুড ফেলো ! ফরগট্ টু ব্রিং মাই পার্স ! নো ট্রাম্ ফেয়ার !

—ইয়েস্ স্যার, হেয়ার ইউ আর ! একটা দুআনি বাড়িয়ে দিলো রোজারিও অঞ্জলি দেবার ভঙ্গীতে।

—চিয়ারিও ! লোকটা একটা পা টানতে টানতে, একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে গেলো।

আমি ঘাড় নেড়ে, কী ব্যাপার ? কে লোকটা ? এই রকম ভঙ্গী করলাম শুধু—!

—আরে স্যার, আর বোলেন কেনো ! উনি আমার বস্ ছিলো ! রোজারিও ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্লা বেশ গুছিয়ে বলতে পারে,—উনি মিঃ বাহুড়ি ! সিনিয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট্ জেটিস্ এ্যণ্ড্ হোয়ার্ভ্স্ ছিলো। আজ অবস্থা দেকেন ! ইল্লাক্ ! একসেসিভ্ ড্রিংক্ করে চাকরি খতম হলো ! ডিউটিতে ড্রিংক্ করে পড়ে থাকতো ! আরে স্যার, আগাড়ি কেইসা ফাষ্ট্ক্লাস আদমি থা কেয়া বাতায় গা ! কেয়া হোগিয়া থা উনকা কৌন জানতা ! ডিউরিং ওয়ার একজন মেজর জেনারেল রাংকের ইংরেজ ওয়ার মেটিরিয়ালস্ landing'এর সমস্ত খবর নিতে গিয়ে দেখেন টেবিলের নিচে ফ্লাট ! ডেকে তুলেচে কি গালাগাল শুরু হো গিয়া !

—Who the devil are you ?

—I'm Mazor General Hunt! Ay, what's the trouble? Drunk? On duty? Wonderful!

—Damn it! মিঃ বাহুড়ি জড়ানো গলায় বললেন—Why have you entered into my room without permission? w-h-y?

I'm Mazor General Hunt! want some secret information, very urgent!

—Damn it! I've seen so many commanders and Generals! Seen a lot of them! Push out!!

তারপর আর কি? গ্রহ! মেজর জেনারেল গিয়ে সোজা চেয়ারম্যানের কাছে রিপোর্ট—! Defence of India'র তাড়ায় চেয়ারম্যান নিজে দৌড়ে এসে দেখেন ঐ কাণ্ড! আর যাবে কোথায়?—

—Submit your papers! চেয়ারম্যান অর্ডার করে চলে গেলেন। তখুনি রেজিগ্‌নেশন দিতে হলো! চৌদাশো রূপেয়া মাইনে থেকে কয়েক মিনিটে বেকার, কয়েক মাস পরেই পপার!

রোজারিও কি রকম কি রকম হাসল একটু আর আঙুলের এক টুসকিতে ফুটিয়ে তুলতে চাইলো ব্যাপারটা টক্ ক'রে শব্দে।

—তারপর? জমে-ওঠা গল্পের রসে টলটলে-আগ্রহী চোখ তুলে চাইলাম—।

—তারপর আর কী, loafing like anything! এর কাছ থেকে সিগারেট্, ওর কাছ থেকে ট্রাম ফেয়ার, তার কাছ থেকে টাকা—! কাউকে হয়তো ধরে বসলো—stand me a lunch! তবে মেজাজটা ঠিক আছে। ওগুলো জোর করে আদায়। Complex পুরা হ্যায়, ডাঁট্‌সে চলছে!

—তা আপনারা এখনো ভয়ে তটস্থ কেন সব?

—ডিয়ার স্যার ! বোঝেন না কেনো ? যাকে বলে, রাজা রাজড়ার ব্যাপার ! ওদের কিছু কি ঠিক আছে ? কোনদিন শুনবো reinstated ! আবার আমারই তো boss হোবেন ! বড় বড় সব মিশ্ খেয়ে যাবে, মাঝখান থেকে আমি ছিটকে পড়বো। চটানো ঠিক ? তার ওপর আমাদের complex! মাঝে একবার চাকরি ফিরে পেয়েছিলো—রাখতে পারলো না ঐ একই reasonএ'। Wilkinson কী আর সাধে পালিয়েছে ! এর আগে একদিন পাঁচ টাকা দিতে হয়েছে ওকে। আর কি হিসেব ! মাইনের দিন pay draw করার পরেই ধরেছে ওকে ! আজ আবার landslideএর ভয়েই না ভাগলপুর দিয়েছে ও।

—খুব interesting লোক তো !

—তাতো বুঝলাম ! এদিকে আমাদের যে প্রাণ যায় ঐ interesting ব্যাপারের জ্বালায় ! রোজারিও পেটে গ্যাসট্রিক যন্ত্রনায় বিকৃত হওয়ার মতো মুখ করলো গাল কপাল কুঁচকে।

তারপর শোনালো ভাদুড়ির জীবনকাহিনী।—

সত্যিই, এমন আর হয় না ! দশজনের মতো সাধারণ মানুষরা তো আর আকর্ষণ করে না আমাদের, করে ভাদুড়িরা। সাধারণ দশজন জোলো জোলো, একঘেয়ে, সোঁদা সোঁদা, ভ্যাপসানি ঘেমো গন্ধের মতো। না উগ্রতা না ঝাঁঝ। কোথায় ফেনিল উচ্ছলতা ? এদের দেখছি প্রতিমুহূর্তের ভাসা ভাসা আলতো-দৃষ্টিতে ; নিরীক্ষণ করছি না। আর ওরা ? দশজনের থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ; হয়তো স্বল্পায়ু হাউইএর অনিবার্য নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার জন্যেই সে আরোহণ, —তবু। তবুও সে ওঠা। নিঃশেষ আমরা সবাই হবো—শুধু সময়ের একটু ফারাক। কিন্তু এর মধ্যে একটা বিরাটত্ব—মহত্ব রয়েছে, একটা শক্তি, ফোর্স্ :—মাথা উঁচু করে দেখার, মাথা নিচু করে শ্রদ্ধা করার, ভাবার। এরাই চরিত্র—character—

অক্সফোর্ড থেকে মা সরস্বতীর সর্বোচ্চ যজ্ঞতিলকের ললাট-লিখন নিয়ে পোর্টের কাজ নিয়েছিলেন মিঃ ভাদুড়ি, ক্লাস টু অফিসার হয়ে।

অসাধারণ মেধা, অদ্ভুত কর্মশক্তি, ক্ষুরধার বুদ্ধি আর সোনা-হৃদয়ের দীপ্তির জ্যোতির্গোলোক ওঁর চারদিকে। উচ্চসুরে বাঁধা জিব আর আর মন, ঘা লাগলেই বেজে ওঠে উচিত মতো সুরে।

অতি অল্পদিনেই সুদক্ষ অফিসার হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হলেন অবলীলাক্রমে। সহকর্মীরা অবাক হলেন, হলেন ঈর্ষাকাতর, ভয় জরজর, অপ্রকাশ্যে ; প্রকাশ্যে কেউ কেউ।

কিন্তু একজন দেখালেন না কিছুই। প্রাণ দিয়ে ভালবাসলেন ওঁকে, সব চেয়ে বড় বন্ধু হলেন। ভালো মানুষরা নির্বোধ, এ এ্যাটমিকযুগীয় সংজ্ঞা মেনে নিলে বলতে হয় ভাদুড়িও নির্বোধ, কারণ তিনি ভালো মানুষ।

সেই একজনের নাম করল না রোজারিও, বলল যে, তিনি বুঝেছিলেন যে ভাদুড়িকে বাড়তে দিলে তিনি বাড়তে পারেন না। আকাশে দুটো সমশক্তির সূর্য কটমট করলে ঝলসে যাবে সব। একজনকে রাহুগ্রস্ত করতেই হবে চিরকালের মতো। পূর্ণগ্রাস। তিনি বুদ্ধিমান, কূটনীতিপরায়ণ, উচ্চাশী।

আসল দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে বিভ্রান্ত করার জন্যে দাবায় যেমন একটা অপ্রয়োজনীয়, কিছুটা বা বিপজনক, চাল দিয়ে মার খেতে হয় মার দেয়ার জন্যে, তেমনি করলেন তিনি।

ফুর্তি। ভাদুড়িকে নিয়ে। মদ ধরালেন। অন্যান্যও। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ফিরিঙ্গি মেয়ে থেকে, ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীট পর্যন্ত carefree গতায়াত।

তাঁর নিজের পদক্ষেপ কিন্তু গুনে গুনে, তাল রেখে, হিসেব করে। ভাদুড়ির ভবিষ্যৎ তাঁর ছ'কে নেয়া। মাত্রা তিনি রাখলেন সব নেশার, ভাদুড়ির মাত্রার বলিতে, ওঁর ধ্বংসের মূল্যে। এল্‌কহলের ঝাঁজালো

ফেনিল স্রোত ঢেইয়ে ঢেইয়ে ভাত্বড়িকে নিয়ে গিয়ে ফেললো মরা সমুদ্রে, শৈবাল সাগরে, আগাছার ভিড়ে, ভিখারী নাগারীদের সঙ্গে। ঝড় শুধু ঝড়ই নয়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ অন্ধকার। একা নয় কেউ।

ওঁর সমস্ত খবর পেয়ে আত্মীয়স্বজনও ত্যাগ করে গেল সব। স্ত্রী, ধনী-দুহিতা, পিতৃগৃহের দরজা বন্ধ করলো সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে।

দুষ্টগ্রহ-গ্রস্ত ভাত্বড়ি, সোনার পুত্তুলি যেন ধুলিতে লোটায়। আর যিনি ওঁর উচ্চারোহণে ছেদ টানার জন্যে এসব করলেন, তিনি, তিনি তো ওঁর শূন্য আসন পূর্ণ করবেনই। করেছেনও।

ভাত্বড়ির কথায় মন ভারি ; বুকে মোচড় দিয়ে উঠল আমার। যে তখন ফোর্ড গাড়ীতে বেড়াতো, সেই ব্যক্তিকেই ট্রামের পাঁচটা পয়সা চেয়ে নিতে হচ্ছে, তাও আবার তিন পয়সায় গিয়ে দু' পয়সা বাঁচাবেন ভাত্বড়ি ; বাঁচাতে হবে ওঁকে। ভাগ্য কী নিষ্ঠুর ?

সেই প্রথম দিন—

আর আজ ? শেষ। আমিও ঠিক ঐ ধরণের না হলেও, প্রায় অনুরূপ এক শয়তানী-চক্রের বাধায় লক্ষ্য ভেদ করতে পারলাম কই ? লক্ষ্য-বেধ সভার ইন্দ্রতুল্য রাজাদের মতোই বিরসবদনে চলে যেতে হচ্ছে। career-যাজ্ঞসেনী লাভ হলো না। প্রথমদিন দেখেছিলাম জাহাজের চিমনী আর পোর্টের এঞ্জিনের ধোঁয়া, আর আজও নীল-বনাত আকাশ-ইজেলে চিমনীর এঁকে বেঁকে গাঢ় হয়ে ওঠা ধোঁয়াকে কার এলো-চুল মনে করতে করতে ছেড়ে যাচ্ছি এই ধোঁয়াটে রহস্য-ঘন এলাকায় চার চারটে বছর উৎসর্গ করে। আশ্চর্য! ধোঁয়াই। ending in smoke ?—

সে কালের আশীর্বাদ ছিলো—সুখে রাজত্ব কর! তারপর এলো বেঁচে থাকো, রাজা হও! চাকরি কর! চাকরি পাকা হোক!

চাকরি করতে করতে পাকো, পাকতে পাকতে চাকরি কর! বাঁচতে বাঁচতে চাকরি কর—মরতে মরতেও!

সুখে দিনাতিপাত? অতীতের স্মৃতি! আজকের বিকিয়ে দেয়া-দিন সুখের নয়, অবমাননার; দাসত্বের নিপীড়নের, বিবেক-বিলোপের অবমাননার।

রাতের কথা স্বতন্ত্র হতে পারতো, যদি নাকি নিজস্ব স্বাধীন রাত থাকতো কারো। এখন রাতও বিলিয়ে দেয়া। বর্তমানে বাঁচাই একটা চাকরি। এ চাকরি কী একরকমের? অর্থের জন্যে, পারিপার্শ্বিকের অধীনে, শিক্ষা আর তার প্রভাবের, শক্তি, সামর্থ্য, এমন কী স্বাস্থ্যের জন্যেও ওষুধ পথ্য চিকিৎসকের দাসত্ব। আসলে আমাদের জীবনে ও জগতে এ শাশ্বত, অবিচ্ছিন্ন অবিরল চলে নিরবধি—

হাজার মনিব মানুষের। এক মনিবের কাছে সারা তো অন্যের কাছে শুরু; ছাড়ান নেই। ভাবছ, মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে মুক্তির স্বাদ? না সুমি, সে স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা—। তাছাড়া সবার কাছে ছুটি পাচ্ছ না। মন লাগাম লাগানো-ঘোড়ার মতো ছুটছেই, ছুটবেই—।

ব্যক্তি স্বাধীনতার রিভার্স গিয়ারে সবার সেরা দাসত্ব হচ্ছে বাঁচার চাকরি, দৈনন্দিন অভাব সন্তুষ্টির, চাহিদা পূরণের চাকরি। তুলনা নেই এর। কেমন করে মানুষ একাধারে জেকিল আর হাইড হ'তে পারে তার প্রত্যক্ষ জীবন্ত রূপ দেখতে পাবে তুমি প্রত্যেকটি চাকুরের মধ্যে—প্রত্যেকটির।

যে যা নয় তাকে তাই নিখুঁত অভিনয় করে যেতে হবে। মনের মধ্যেও কতকগুলো সম্পর্কশূন্য বিভাগ! সেটা অফিসের, ওটা ক্লাবের, এটা বাড়ির। একটার সঙ্গে অন্যটার সমুদ্র এভারেষ্টের ফারাক।

আর আশ্চর্য, দিনের এই কর্ম-সময়টা আসমুদ্র-হিমাচল রাজত্ব করবে। এর অধিকার সুদূর প্রসারী, প্রভাব অতলান্ত, চরিত্র সাম্রাজ্যবাদী। অর্থ যোগায় বলেই এর ডিক্‌টেটারী।—

একই ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে ভেদে কতো বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া! রাজার ছবিতে আঘাত করলেও হয় রাজদ্রোহের অপরাধ। আবার ডাকঘরে সেই মুখ আঁকা' ডাকটিকিটে শিলমোহর দিয়ে প্রাণপণে আঘাত করলে হবে রাজকার্য।

গায়ে কেউ কালি বা রঙের ছাপ দিয়ে দিলে তার উর্ধ্বতন কয়েক পুরুষের খোঁজখবরে তৎপর হই, বিচার বিবেচনাহীন হয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর যাই থাক, কি এক যাদুবিদ্যা আছে নিশ্চয়ই—। তা যদি না হবে' তা'হলে ওর ছাপের পর ছাপ আমাদের আনন্দিত, আরো উর্ধ্বায়িত, আত্মসচেতন করে তোলে কী করে?

মহাকব্যের যুগে কঠোর তপস্যায় দেবদেবীদের তুষ্ট করে লাভ করতে হতো অমোঘ অস্ত্র শস্ত্র—। তূণীর ভর্তি করতে হতো ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরের কাছে। অধিকারী হতে হতো কবচকুণ্ডলের—।

আজকে ও সবের স্থান গ্রহণ করেছে অধ্যয়ন তপস্যা, ডিগ্রি অস্ত্র লাভ, ক্লাস ডিষ্টিংশনের কবচকুণ্ডল। বি এ. এম্ এ. বি. ই. এম্ বি. বি এস্. এ-যুগের একঘাতি, পাশুপত। এ না হলে জীবনের কুরুক্ষেত্রে নামে সাধ্য কার? জীবনরথের মহারথী হয়েই নেমেছিলাম সে কুরুক্ষেত্রে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, ইণ্টারভিউ আর ডাক্তারী পরীক্ষার চক্রব্যূহ চোখের নিমেষে ভেদ করেছিলাম বটে, তবে এই দুর্বৃত্ত-বৃত্ত সপ্তরথীর কথা অজানা ছিলো তখনো,—সে কথা যাক।

শুনেছিলাম আমার ঠাকুরদাদামশাই বংশে প্রথম চাকরি নিয়েছিলেন এ, জি, বেঙ্গলে, উনবিংশ শতকের অষ্টম দশকে। তখন ঘোর ইংরেজ আমলাতন্ত্রের যুগ। ওঁর ডাক্তারী পরীক্ষার ভার

প'ড়েছিলো এক সাতফুটী সামরিক ডাক্তার কর্ণেল কুটের ওপর। ঠাকুরদামশায়ের ছিলো কাশীর অবোধবিহারী সিংএর আখড়ায় কুস্তি করা, এক সের পানফলের জিলিপি আর দু'সের দুধে প্রাতরাশ করা-তাগড়াই চেহারা। পরীক্ষাও অভিনব। কর্ণেল দু'কাঁধ ধরে কয়েকটা ঝাঁকানি দিয়ে দেয়ালে ঠুকে ঠুকে দেখছিলেন শক্তি সামর্থ্য আর স্বাস্থ্য। প্রত্যেককেই অমনি করে দেখা নাকি অভ্যেস তাঁর। আর প্রত্যেকেরই তাঁর এ অভ্যেসের কাছে বিনীত আত্ম-সমর্পণ। কেউ যে পরিবর্তে কর্ণেলের শক্তি সামর্থ্য পরীক্ষা করতে চাইলেও চাইতে পারতে পারে, এমন দুঃস্বপ্ন কর্ণেল কেন, তাঁর পূর্বপুরুষরাও কেউ কখনও দেখেন নি সম্ভবত, বিশেষ করে কালাআদমীর দেশে। ঐ ঝাঁকুনি আর ঠুকুনিতে ঠাকুরদার দাসত্বে অনভ্যস্ত খাঁটি রাজ-রক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠল। প্রায় একশো ওজনের বিরাট এক ঘুষি চালিয়ে দিলেন তিনি কর্ণেলের গালে। কর্ণেল চিত—।

এর ফল সে যুগে কী হওয়া উচিত ছিলো ভাবা শক্ত নয়। কিন্তু ইংরেজ জাতটার জাতীয় বৈশিষ্ট্য, রসজ্ঞান কিংবা খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তিতে কিনা জানিনা, ফল উল্টোই হলো—ঠাকুরদামশাই ফার্ষ্ট ক্লাস হেল্‌থ্ সার্টিফিকেট পেলেন কর্ণেলের কাছে, সেই দিনই—। শক্তের ভক্ত পৃথিবী?

সৌভাগ্যবশতঃ বিংশশতকের দ্বিতীয়ার্ধের ঊষায় আমাকে ঐ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়নি; হলে নিঃসন্দেহে নিয়োগপত্র নেবার আগে চেষ্ট্ ক্লিনিকে ছুটতে হতো এক্স্‌রে রিপোর্টের জন্যে। তবে আজকের পরীক্ষা পদ্ধতিতেও প্রশ্ন জাগে—। আমরা কী রকম সভ্য মার্জিত হচ্ছি? শরীরের কোনো অংশই পরীক্ষার আওতার বাইরে থাকে না আজকাল। এর যেমন যুক্তি আছে তেমনি আছে তথাকথিত সভ্যতার অশুভ ক্লেদাক্ত নগ্নদিক,—শতাব্দীর অভিশাপ—পশ্চিমী-সভ্যতার কলঙ্ক—।—

বৈষ্ণব সাহিত্য-জগতের ধাপ্পায় নায়িকার প্রকারভেদ হয় বিপ্রলব্ধ থেকে মানেতে। কানুকে প্রেমলম্পট বলে হাহুতাশ করেন রাই। কিন্তু চাকরি জগতের ধাপ্পা আর তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার নামকরণ করতে মস্তিষ্কে চিড় খেয়ে যাবার অবস্থা। প্রথম দিনেই—।

ধাপ্পা সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের রাতারাতি এতোটা রূপান্তর আশা করিনি। কয়লাঘাট অফিস থেকে কাগজপত্র নিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষার হার্ড্‌ল পেরিয়ে, নিয়োগপত্র আর তিনমাস learning duty-র প্রোগ্রাম হাতে নিয়ে প্রথমেই হাজির হ'তে হলো এক নম্বর খিদিরপুর ডকের সুপারিণ্টেডেণ্ট্‌ মিষ্টার এম্‌, এল, লিউইসের কাছে। এতোক্ষণের অস্বস্তি থেকে আস্তে আস্তে আশ্বস্তিতে গেলো মন। মনিব দেখে খুশি। ছিপছিপে ছ'ফুটী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক। মাথায় রুক্ষ চুলের বোঝা। মাঝখানে আবছা সরু সিঁথির মতো হয়ে পেছন দিকে চলে গেছে—। বেশ জোরে আর দমক দিয়ে দিয়ে পরিষ্কার ইংরিজী বলেন। যে কোনো প্রশ্নের জবাব সব সময় লিপষ্টিকের মত ঠোঁটে লাগানো ; একটু যেন খেয়ালী খেয়ালী। অবসর পেলেই দাঁত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নখ কাটেন ; মুখ দিয়ে কলম খোলেন—।

আমি ট্রাফিক প্রবেশনার। তিন বছর পরে এ্যাসিটাণ্ট্‌ সুপারিণ্টেডেণ্ট্‌ হয়ে যাবো। এর পূর্বেই হওয়া নির্ভর করছে উৎকৃষ্ট কর্মপটুতা প্রদর্শনের ওপর,—ওপরওয়ালা খুশি রাখার পারদর্শিতা হলেও চলতে পারে।

আমাকে একটু জিজ্ঞেস-পড়া করেই ভদ্রলোক টেলিফোনে ওপর-ওয়ালাকে কী সব হিসেব দিতে শুরু করলেন বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে—। ব্যাপার দেখে মনে হল ওপরওলা ওঁর হিসেবে ঠিক বিশ্বাস করলেন না। উনি বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন—Listen Jim! I am hundred percent correct! The particulars are on my table just now!

টেলিফোনের তারের অপর-পার সন্তুষ্ট হলো মনে হলো—।
আর আমি সবিস্ময়ে দেখলাম টেবলের ওপর কাচ ঢাকা যৌবন মদমত্তা লানা টার্ণারের ছবি ছাড়া আর কিছুই নেই—।

—আই থিঙ্ক আই হ্যাভ্ টট্ ইউ দি ফার্ষ্ট লেশন অলরেডি! দ্যাট্ ইজ, দি আর্ট অফ্ ব্লাফিং। ইট্ ইজ দি সামাম্‌বোনাম্ হেয়ার! বাট লুক্ হেয়ার, ডোণ্ট্ ট্রাই টু এক্সপেরিমেণ্ট্ ইট্ অন্ মী, বিকজ এ্যাম্ নোন্ হেয়ার এ্যজ দি মাষ্টার অফ্ দ্যাট্ আর্ট—! ফলো—?

চেয়ারটাকে ঠেলে এলিয়ে দিয়ে দেয়ালে ঠেকিয়ে আধশোয়া মতো বসে দাঁতে নখ কাটতে কাটতে অন্যমনস্ক-ডাক দিলেন—Basu!

—Yes Sir!

পাশের ঘর থেকে কাটা দরজা ঠেলে একটি সুদর্শন যুবক বেরিয়ে এলেন। চমৎকার ব্যাক্‌ব্রাশ করা চকচকে চুল। ছিপছিপে চেহারার মার্কিণ চলচ্চিত্র-নায়ক সুলভ গোঁফ,—চোখে হাফ্ রিমড্ চশমা। স্মার্ট চাউনি।

মিঃ লুইস্ আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন—নতুন প্রবেশনার। সেক্‌সন দেখাও আর কাজ শেখাও। I am off for my lunch! আমাকে বললেন—ইনি মিঃ বাসু, আমার এ্যাসিটাণ্ট সুপারিণ্টেডেণ্ট্। তারপর কলিংবেলে মারলেন বিরাট এক চড়। বেয়ারা এসে দাঁড়ালো—।

—ক্রেন্ শীট্ লেয়াও—!

শুনেই গেলাম। ক্রেন্-শীট্ জিনিসটা পরে বুঝেছিলাম হাড়েহাড়ে। ওরই ওপর পোর্ট কমিশনারস্’এর আয়ের যতোকিছু। চব্বিশ ঘণ্টায় সমস্ত জাহাজ কতো ক্রেন কতো ডেরিকে কাজ করবে, কতোক্ষণ করবে, তারই বুকিং—। তাছাড়া লোডিং আনলোডিং এর বন্দোবস্ত—। কর্ম-তালিকা, কর্মসূচী—। এক কথায় worktng order বলা হয়ে থাকে—।

বেয়ারার এহেন ক্রেন্-শীট্ আনামাত্র উনি ঘসঘস করে মোটা হাতে

পেন্সিলে সই করে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন নিজেকে সম্পূর্ণ প্রসারিত ক'রে—। ছ'ফুটেরও বেশি। লম্বা লম্বা পা ফেলে, ভারী ক্রেপসোলের জুতোর কোনো শব্দ না করে, বেরিয়ে গেলেন। ফিরেও চাইলেন না আর।

—অবাক হয়ে গেছেন খুব নয়? মিঃ বাসু আমাকে দরজার দিকে কেমন কেমন চোখে চেয়ে থাকতে দেখে বললেন,—তাতো হবেনই। আমরা রোজ দেখছি তবু অবাক! এমন একটা দোষগুণের আশ্চর্য মানুষ সহজে নজরে পড়ে না। পাগল ছাড়া বুঝি এমন হয়ও না!

—হ্যাঁ, প্রথমেই ধাপ্পা দেয়াটা শিখিয়ে দিলেন।

—ও কী শিখেছেন! দাঁড়ান, দু'চারদিন যাক! আসল ধাপ্পাই তো শোনেন নি এখনও। ভদ্রলোক এক ধাপ্পা কখনও দুবার দেন না। প্রতিদিন নতুন নতুন ধাপ্পা আবিষ্কার করছেন—। এইভাবে অনেক দিন পর সকলে ভুলে গেলে-প্রথম ধাপ্পা রিপিট্ করেন—। তীক্ষ্ণবুদ্ধি! একটা জিনিয়াস বলা চলে। উচ্চ শিক্ষিতও। ধাপ্পার মৌলিকতার জন্যে ওঁকে ডক্টরেট্ উপাধি-ভূষিত করা হয়েছে—। Dr. of Bluff!

—হ্যাঁ, বোঝা যায়! স্বীকার করতেই হলো,—চলুন এখন, কী দেখাবেন!—

—আরে সব দেখাবো! সেকশন্ দেখতে হলে আগে সেকশন্-ইনচার্জকে দেখুন। আজ লিউইসের পরিচয় নিয়ে বাড়ি যান। কাল তখন—

—জিজ্ঞেস করেন যদি কী দেখলাম?

—তা করুন না! সেটা যদি সামলাতে না পারি তো মিছেই লিউইসের অধীনে কাজ করলাম!

হেসে ফেললাম। মিঃ বাসুও। তারপর গল্প—। কাজ-কর্ম, দেখা-শেখা-ভোলা গল্প—।

—লিউইসের কথা বলতে গেলে একখানা বিরাট বই হয়ে যায়। নাটকীয় ভাবে হঠাৎ আরাম্ভ করলেন মিঃ বাসু,—একবার ডক্স্ ম্যানেজার মিঃ কামাস্‌কী ওঁকে ফোনে জিজ্ঞাসা করলেন—ওমুক জাহাজটা বার্থে লেগেছে?

উনি না জেনেই বলে দিলেন—Yes sir, the vessel has made fast just now at no. 11 K. P. D. মিটে গেলো। কিন্তু অত সহজে কী মেটে সব সময়! আড়াইটের সময় লাঞ্চ্ থেকে ফেরার পথে জাহাজ পার করার জন্যে ঝোলা-ব্রিজ খুলে দেয়ায় রাস্তায় আটক প'ড়ে কামাস্‌কী দেখলেন, সেই জাহাজখানাই এক নম্বর ব্রিজ পার হচ্ছে, অর্থাৎ সবে মাত্র গঙ্গা থেকে জাহাজখানা ডকের জলাধারে প্রবেশ করেছে বার্থে ভেড়ার জন্যে। আর যায় কোথায়? নিরীহ ভালো সায়েবের মাথায় আগুন চ'ড়ে গেলো—। গাড়ি নিয়ে তিনি সোজা লিউইসের অফিসে চলে এলেন—। কাটা দরজাটা খুলে দুটো পাল্লায় দুটো হাত রেখে, ভীষণ চড়া গলায় বললেন—Lewis I am giving you final warning!

প্রায় লাফিয়ে উঠলেন লিউইস, What is the trouble sir?

—The vessel in question has just entered the docks, and passing through no 1 Swing Bridge! Do you hear? লিউইস্ একটুও ভড়কে না গিয়ে, সার্কাসের ক্লাউনের মতো চূড়ান্ত মুখ কাঁচুমাচু করে চটপট বিনীত জবাব দিলেন—I'm really sorry, Boss! That's a genuine mistake। আবার জোর দিয়ে বললেন—Genuine mistake sir; এরপর আর কি? কামাস্‌কী সায়েব যে গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলে আসতে পেরেছিলেন এই তাঁর পরম সৌভাগ্য। আর উনি চলে যেতেই লিউইস চোখ কপালে তুলে দুই শব্দে শিস দিয়ে উঠেছিলেন, যার অর্থ—খুব বাঁচা গেছে এবারের মতো—।

মিঃ বাসু আসর জমিয়ে তুললেন।

—শুধু কি তাই? ওঁর ঐ আর্টের আবার বাইপ্রডাক্ট আছে কতকগুলো—। লোকের কলম নেবেন, সাইকেল চেয়ে নেবেন, ফেরত দেবার নামও করবেন না। করলেও অনেক ভুগিয়ে। রেস্ খেলার টাকা কম প'ড়ে যাবে, আর ধার করবেন বেপরোয়া। শোধ ক'রবেন না। আবার টাকা নেবেন অধীনস্থ কর্মচারী, কেরানীদের কাছ থেকে, যাঁরা চাইতে সাহসই ক'রবেন না কখনো।

বাড়িতে কড়া স্ত্রী। সমস্ত টাকা তাঁর হাতে। মাইনের টাকার পুরো হিসেব নিয়ে ওঁকে হাত খরচ আর রেসের একটা নির্দিষ্ট টাকা দেবেন প্রতি সপ্তাহে। তাতে লিউইসের চলবে? নতুন নতুন বান্ধবী জোটানো আছে, মদের মতো রেসের নেশা বেড়ে যাওয়া আছে। তবু তো লাঞ্চটাঞ্চ, বাড়তি মদ, অন্যের ওপর দিয়ে চলবে। এই যে এখন লাঞ্চে গেলেন,—কোথায় জানেন? কোনো জাহাজে। চিফ্ অফিসারকে পটিয়ে-সটিয়ে ব্যবস্থা করে রেখেছেন সকালে এসেই। রোজ এক জাহাজে নয়। ছ'দিনে ছ'টা জাহাজ। সপ্তাহ কাবার।

হেড্‌ক্লার্ক দিবাকরবাবু জব্দ করেছিলেন একবার। সেবার বড়-সাহেব ওঁর কাছ থেকে দশ টাকা ধার নিয়ে দেন না কিছুতেই।

কয়েক মাস পরে ঠিক মাইনের দিন Pay clerk ওঁর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দিবাকরবাবু ঢুকেছেন—স্যার আমার টাকাটা? একশো টাকার নোটের চেঞ্জ দিতে ব'লে বিব্রত ক'রে ফাঁকি দেবেন ব'লে লিউইস পরম সাহস আর অবহেলায় একখানা একশো টাকার নোট বার করে হাওয়ায় কড় কড় ক'রে ওড়ালেন—Have you got change? মৃদু হাসির প্রসাধন মুখে।

—Yes sir!

দিবাকরবাবু একতাড়া নোট পকেট থেকে বার ক'রে গুনে গুনে নব্বইটা টাকা দিয়ে নোটখানা নিয়ে নিলেন।

তিতবিরক্ত হয়ে উঠলেন মিঃ লিউইস। এতোটা আশংকা করেন নি। My god! You have come fully prepared?
ফোঁস ক'রে নিঃশ্বেস পড়ল। মিসেস্‌কে কী হিসেব দেবেন আজ!

Thank you sir! হেড্‌ক্লার্ক মাথা নোয়ালেন, অতিকষ্টে হাসি চেপে। লিউইস অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে, সাধারণ ভদ্রতা ভুলে চুপ ক'রে থাকলেন বিরসমুখে।

এখন অন্য কারোর কাছে টাকা ধার ক'রে পুরো করে তবে স্ত্রীর সামনে যাওয়া চলবে। জারিজুরি খাটবে না সেখানে।

—কতো বলবো? মিঃ বাসু সিগারেট ধরালেন: আর আমিও অনভ্যস্ত ঠোঁটে সিগারেট চেপে ধরলাম অজ্ঞাতসারেই—

—দু'একদিনের মধ্যে আপনিও পরিচয় পেয়ে যাবেন। একবার মিঃ টমাস্, ডেপুটি ডক্স-ম্যানেজার-কমার্শিয়ালের জিজ্ঞাসার উত্তরে মিথ্যে বললেন—চল্লিশখানা ওয়াগন ভর্তি ক'রেছেন এইমাত্র! তখন দু'নম্বর ডকের সাতাশ নম্বর শেডের শেড্‌-মাষ্টার উনি। সকালবেলায় যে সমস্ত খবর নিয়ে গেছেন তাতে ওরই মধ্যে চল্লিশখানা ওয়াগন কী ক'রে বোঝাই হয়? মিঃ টমাস সন্দেহাকুল হলেন।—আচ্ছা পরীক্ষা করেই দেখা যাক। শোঁ ক'রে তিনি তাঁর লালরঙের ছোট ফিয়েট্ গাড়িখানা ছুটিয়ে নিয়ে গেলেন সাতাশ নম্বরে।

কোথায় মালগাড়ি? গুদামের পেছনের প্লাটফরম্ লাইন ফাঁকা। গাড়ির কোনো চিহ্নই নেই।

গাড়িতে ব'সেই ভারি গলায় একজনকে লিউইস্‌কে ডেকে দিতে বললেন তিনি। শেডের ওপরের অফিস থেকে খাড়া-সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন লিউইস।

—কোথায় তোমার গাড়ি? I say, don't try to bluff me atleast!

ভাগ্যক্রমে সেই মুহূর্তে রাস্তার ওপারের লাইন দিয়ে কয়েকখানা বোঝাই-ওয়াগনের একটা রেক্‌কে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ইষ্ট্ জংশনের দিকে। সেইদিকে চোখ পড়তেই লিউইসের বিভ্রান্ত দৃষ্টি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

—See! The wagons have been driven out just now! The shunting order was issued immediately after the loading! See!

ঐ দিকে লিউইসের আঙ্গুলের বিদ্যুৎ-সঞ্চালন।

I see! I am sorry Lewis! Cheerio!

সেল্‌ফ্-ষ্টার্টারের আড়ামোড়া ভেঙ্গে ঘুমন্ত ফিয়েট্ ঝাঁকানি দিয়ে উঠল জেগে। ক্ল্যাচ্ আর গিয়ারের মোজা জুতো প'রে এ্যাক্সিলারেটরের দ্রুতগামী পা চালিয়ে দৌড় দিলো good-ম্যান টমাসের লাল গাড়ি! লজ্জায় লাল টমাস!—বেশ বলতে পারেন মিঃ বাসু। চমৎকার ক'রে বলেন। আমি ঠিক ওঁর মতো ক'রে বলতে পাচ্ছি না নিঃসন্দেহে। তাছাড়া বলার সময় মুখ-পেশী আর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গতে যে সুর আর রস সমন্বয়ের সৃষ্টি করছিলো তা শুধুমাত্র কালি-কলম-মনে বোঝাই কী করে? তবে নাকি কিছু সাহিত্য-গন্ধ আছে গায়ে, আঙ্গুলে আছে রঙ! আর সাহিত্যের যে চিত্রের দিক আছে সেদিকে যদি আমার লেখনী সফল পরিস্ফুটনে সক্ষম হয়ে থাকে, তবেই তোমার উপলব্ধি বাধা পাবে না মনের চোখে দেখে নিতে—। পাও নাকি দেখতে? পাচ্ছ?—

জানলার বাইরে দিয়ে ঢালু পাহাড়টা যেখানে আবার উঠতে শুরু ক'রেছে, যেখানে শাল আর বন-হরতুকি গাছের ফাঁক দিয়ে দামোদরের জলস্পর্শ করার জন্যে পৃথিবী তার একটা লাল-রাস্তার হাত

বাড়িয়ে দিয়েছে নীচের দিকে ; সকালের রোদের গয়নায় ঝিকমিকিয়ে ওঠা-রাস্তাটা ওদিকের ছোট পাহাড়টার চূড়োর পাশ কাটিয়ে কোন অতলে নেমে গেছে যেন : পড়তে পড়তে সেদিকে চেয়েও কি দেখতে পাচ্ছ না কিছু ? বর্ষার দামোদর যে বনভূমি অধিকার করে, আর ফেরার সময় তার অধিকারের চিহ্ন, দখলী বালুকা-ফৌজ রেখে আসে অনেক দূরে, ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে যাওয়া-উপত্যকায় ; সেখানে দৃষ্টি পড়লেও কী শাদা বালির পর্দায় কোলকাতার এই ধোঁয়া-কালির এলাকার এক ছোট অফিস ঘরে মুখোমুখি বসে-থাকা দুটি যুবকের মধ্যে একজনের—তোমারই অভিধানের—মিষ্টি-মিষ্টি-মুখখানা দেখতে পাও না ? আমি কিন্তু দেখছি তুমি কী দেখো। তোমাকে তো দেখছিই। মাঝে মাঝে স্নান করোনা তুমি। চুল হয় রুক্ষ, উদ্ধত ; কানের দুপাশে কেমন যেন পাকিয়ে পেঁচিয়ে নেমে আসতে চায়। তোমার সারা শরীরে রুক্ষতার একটা অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য নামে : চোখ ঝলসানো দীপ্তি। স্নান না-করা তোমাকেই যেন ভালো লাগে বেশি ক'রে।

আজো তুমি স্নান করনি হয়তো—। পাতা উল্টে চলেছ : যেন নিঃশ্বেস পড়ছে কি পড়ছে না। মাঝে মাঝে ঝুলে-পড়া চুলগুলোতে সরু আঙুল চালিয়ে সংযত ক'রতে চেষ্টা করছ আর জানালার বাইরে, সরার মতো চারদিকে উঠে-যাওয়া পাহাড়ের পশ্চিম ঢালে প্রায়-ঝুলে-থাকা-বাংলোটা থেকে দৃষ্টির বলাকা উড়িয়ে দিচ্ছ দূরে, দূরান্তরে—আরো—আরো দূরে—* * *

—আশ্চর্য তো !

আমি অবাক-দৃষ্টি ফেললাম

—একদিনে ফুরোবার নয়। তাছাড়া যে-কদিন এখানে থাকবেন আরো নতুন গল্প সংযোজিত হবে নিঃসন্দেহে। পয়সা কড়ির ব্যাপার তো নয়। অন্তত এ ব্যাপারে মিঃ লিউইস্‌কে কৃপণ বদনাম তাঁর উত্তমর্ণরাও দেবেন না নিশ্চিত।

—চলুন, এবার একটু ঘুরে আসা যাক!

—হ্যাঁ চলুন, একটা ফার্স্ট হ্যাণ্ড নলেজ দিয়ে দিই! আমার হাতেই হাতেখড়ি হ'য়ে যাক্! হুটোয় আমার ছুটি! এক সঙ্গে যাওয়া যাবে!

টেলিফোন বেজে উঠল—। টেলিফোনের কাণে কতকগুলো খবরের গুঞ্জন তুলে সন্তুষ্ট করে, উঠলেন মিঃ বাসু—

ওঁর মুখে শুনতে শুনতে, জানতে জানতে আর দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম।

এই খিদিরপুর ডক্। এক নম্বর। এর আবার হুই অংশ, পুব আর পশ্চিম, মাঝে কৃত্রিম জলাধার। এটা পুব। ওপারেতে, পশ্চিমে ছ'টা বার্থ্ আর এপারে ছ'টাকে পাঁচটা করা হয়েছে পাঁচ নম্বর আর সাত নম্বর গুদামকে এক ক'রে। আমদানী-বার্থ্ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই যুদ্ধের সময় থেকেই। বাকিগুলো সবই রপ্তানী-বার্থ্। এ পারে এক, তিন, পাঁচ-সাত, নয় আর এগারো, আর ওপারে হুই, চার ছয়, আট, দশ আর বারো নম্বর বার্থ্ আর সংলগ্ন গুদাম। তাছাড়া এপারে 'এ'আর ওপারে 'বি', এই হু'টো স্টক-শেড্। প্রত্যেক গুদামের টিনের দেয়ালে নম্বর লেখা আর ধূমপানের কড়া-নিষেধাজ্ঞা। গুদাম থেকে জল পর্যন্ত কোয়ে; সেখানেও রেল-লাইন পাতা, মাল গাড়িতে সরাসরি মাল বোঝাই করার ব্যবস্থা, গাড়ি থেকে খালাস ক'রে সোজা জাহাজ বোঝাই করারও—। গুদামের পেছন দিকে প্লাটফরম্-লাইন! রেল স্টেশনের মতো। মালগাড়ি দাঁড়ায়, খালাস হয়—গুদাম বোঝাই—। কোয়েতে আর এক লাইন আছে একেবারে জলের ধারে, ক্রেন্-লাইন। ছোটো ছোটো চাকার পায়ে বিরাট বিরাট জিরাফ্-গলা-ক্রেন্ দাঁড়িয়ে সার সার। এক এক বার্থে পাঁচটা থেকে সাতটা। জলশক্তি-চালিত-ক্রেন—। সাধারণত পঁয়ত্রিশ হন্দর ভার বহন ক্ষমতা। হু'টন-পাঁচ টনের হেভীলিফ্ট্-ক্রেনও ছড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। সবার ওপরে পাঁচ-সাত বার্থের মাঝে তিন-পেয়ে

শিয়ারলেগ্-দানব। একশো টন তোলে! এতো বেশি ওজন তুলনেওলা ক্রেন নাকি শুধু ভারতেই নয়, এশিয়াতেও বেশি নেই। এটা কিন্তু ষ্টিমে চলে—।

—মারো জোয়ান!

—হেঁইও—!!

—আউর থোড়া!

—হেঁই ও— !!

—তলব হোগা!

—হেঁই ও— !!

একটা ক্রেনের চাকায় বালি ছিটিয়ে শাবলের চাড় দিয়ে দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে জিগির তুলে, মদত দিয়ে দিয়ে। জগদ্দল-ক্রেন্ সহজে নড়বে না। হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছে জন-বারো খালাসীকে আর গলা ধ'রে যাচ্ছে তাদের দলপতি নীল-পোশাকী সারেঙের, চীৎকারে চীৎকারে—।

—হেঁইও জোয়ান!

—হেঁইও—!!

—সাহাব আয়া!

—হেঁইও—!!

বালি, উৎসাহ-ধ্বনি আর শাবলের চাড়—শাবলের চাড়, উৎসাহ-ধ্বনি আর বালি—।

মিঃ বাসু সমস্ত বুঝিয়ে বুঝিয়ে চললেন পরিষ্কার ক'রে—।—ছোট-বড় নানান মাপের জাহাজ আসে তো? জাহাজের হ্যাচ্ অনুযায়ী সরিয়ে সরিয়ে ক্রেন্‌গুলোকে প্লেস করে নিতে হয় ফলকাকে ক্রেনের নাগালের মধ্যে আনার জন্যে—। তাই ফিক্স্‌ড্ ক্রেন্ রাখা হয় না। এতে যেমন স্পেস্ পাওয়া যায়, কম ক্রেনে কাজ চলে, তেমনি, ক্রেনে ক্রেনে

ঠোকাঠুকি লাগার ভয় থাকে না! মিঃ বাসু বুঝিয়ে চললেন তো চললেনই—।

ফার্স্ট্-হ্যাণ্ড্ নলেজকে মনে মনে হস্তান্তরিত করে অচিরাৎ সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড্ দিয়ে পিছলে নিয়ে গিয়ে থার্ড্ হ্যাণ্ডের ওপর উপুড় করে দিলাম প্রায়। এখন যে কোনো এইমাত্র ভর্তি হওয়া-প্রবেশনারকে আমিও বুঝিয়ে দিতে পারব ঠিক ঠিক। এই কাজ? খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মনে ক'রে বসলাম। এর জন্যে, আমার নিজের ধারণায়—প্রতিভাশালী মস্তিষ্কের সমস্তটা খরচ করা হবে না কিন্তু! এ সবের জন্যে পুরো-আমিটা নয়—। নেহাৎ বাঁচার জন্যে যেটুকু কাজে লাগাতে হয়—।

চলুন! আজ আর বেশি নয়। এর বেশি বদহজম হবে! ফ্রেশ্ ফ্রম্ দি য়ুনিভার্সিটি। বিষাক্ত কাজের ফিরিস্তির ইন্‌জেক্‌শন আর দেব না! রোম-ইতিহাসের যুদ্ধ জয় ক'রে ট্রায়াম্প্ ক'রে ফেরার ধরনে, লম্বা লম্বা পদক্ষেপে অফিসের দিকে নিজেদের গুটিয়ে নিলাম আমরা—। কী গুরুত্ব পূর্ণ কাজই না করে এলাম—!

কোনো হালকা জিনিসকে না জেনে ভারি মনে ক'রে তদনুযায়ী জোর দিয়ে তুলতে গিয়ে অতিরিক্ত হালকা দেখে খানিকটা শক্তির অপব্যয়ের যে অনুভূতি হয়, কিংবা অন্ধকারে শেষ সিঁড়িতে উঠে, বা নেমে, আরো একটা সিঁড়ি আছে মনে ক'রে অনুরূপ পদচালনা করে, সেইখানেই পা পড়ায় মচকানির, আর কী এক ধরনের শূন্যতার যে আস্বাদ মেলে, কাজটা না জেনে একটা বিরাট কিছু মনে ক'রে এসে কাজের নগণ্যতা দেখে আমার প্রায় ঠিক সেই রকম অনুভূতি হলো বলা চলতে পারে অনায়াসেই—।

এই কাজ—?

যতোখানি কঠিন ভাবা গিছলো ঠিক ততখানি তরল আর আর সরল হয়ে এলো ব্যাপারটা দেখতে দেখতে। ইম্‌পোর্ট্

প্রসিডিওর, এক্স্‌পোর্ট্‌ প্রসিডিওর, লোডিং আনলোডিং, রেলওয়ে নিয়মের কচ্‌কচি, বার্থিং আর সব শেষে কোল্‌-ডকের কয়লার ট্রিমিং—। সমস্ত ট্রিম্‌ড্‌ হ'য়ে এলো আস্তে আস্তে। এই সমস্ত হার্ড্‌ল্‌ পেরিয়ে তিন মাস পরে, একদিন রেসের শেষে দড়ি ছোঁয়ার মতো, পোষ্টিং নিয়ে ব'সে গেলাম এক-নম্বর পশ্চিম-ডকে—। এ্যাসিটান্ট্‌ সুপারিন্টেডেন্ট ওয়েষ্ট্‌ সাইড্‌ ডক্‌ নম্বর ওয়ান্‌—। মেইন্‌ ডক্‌। শুধু গালভরা নয়, গাল-গলা-পেট-ভরা-নাম—। মনে মনে ক'রে বসলাম আর বসে বসে মনে হ'লো যে, এই সমস্ত তুচ্ছ কাজের জন্যেই কী জন্ম গ্রহণ করেছি? আর কী জায়গা ছিলো না বাবা!

পার্কসার্কাস গার্লস্কুলের মিসেস্‌ দত্ত ঠিকই বলেছিলেন মেয়েদের জাহাজ দেখাতে নিয়ে এসে।

—আশ্চর্য! শিল্পী হয়ে কী করে এই সমস্ত কমার্শিয়াল ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট কচ্ছেন?

আর ব'লেছিলো—শিপ্‌ম্যান। ঐ একই কথা।—Wasting time।

আজ মনে হচ্ছে, ঐ সব কথায় কাণ দিয়ে আগে থেকে সাবধান হ'লে আজ অন্যভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের ব্যাপারে এই 'বড় দেরি হয়ে গেছে' মনোভাব গড়ে উঠতে পেতো না হয়তো—। অথচ প্রথমেই মনে হ'য়েছিলো, এ-কাজের জন্যে এতো লেখাপড়া জানা লোক চাওয়ারই বা সার্থকতা কোথায়? যে কোনো সাধারণ বুদ্ধির অল্প শিক্ষিত লোকের দ্বারাই তো এ কাজের সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব! তবে কাঠিন্য যেটা আছে সেটা শিফটিং ডিউটির আর একটা বিরাট লৌহ গোলোকের মতো দায়িত্বের গুরুভারের। সে কোথায় নেই? উনিশ আর বিশ—।

ওয়েষ্ট সাইড্‌—।

মেইন-ডকের ওপরে সার্কুলার গার্ডেনরীচ্ রোডে ছুটো ব্রিজ পড়ে ডকের জল পেরিয়ে যেতে। দুদিকে দুটো। দুহাত বাড়িয়ে যেন পশ্চিম-প্রেয়সীর গলা জড়িয়ে ধ'রেছে পূব-পুরুষ। একনম্বর আর দু' নম্বর ব্রিজ্। এই ব্রিজের দুপারে ডক। ইষ্ট আর ওয়েষ্ট,—and they always meet.

ওয়েষ্ট-সাইড্টার আকার আবার অনেকটা অর্দ্ধচন্দ্রের মতো। সহজে বোঝা যায় না। ইষ্ট্সাইড্ থেকে জাহাজ না থাকা-অবস্থায় দেখলে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। ইষ্টসাইড্ থেকে শুধু ওয়েষ্টসাইডের অর্দ্ধচন্দ্রই দেখিনি। পোর্ট কমিশনারস্ প্রকৃত অর্দ্ধচন্দ্র আমাকে ঐ খানেই দিয়েছেন। অদৃশ্য অর্দ্ধচন্দ্রের ধাক্কা। চাকরির গোলমাল ঐ খানেই শুরু। সে যাক্। ব্রিজ দুটো জলশক্তি-চালিত। এক একটা সিংহদ্বার। দেখলে ইংলণ্ডের সিভালরী-যুগের দুর্গের পরিখার ওপরের প্রয়োজনে ব্যবহার্য ব্রিজের কথা মনে প'ড়ে যায়। প্রয়োজন হ'লে এ ব্রিজও খুলে যায় জাহাজকে পথ ক'রে দিতে। এক নম্বর দিয়ে গঙ্গা থেকে ডকে ঢোকে, আর দু-নম্বর দিয়ে এক নম্বর-ডক থেকে দু-নম্বর-ডক আর কোল-ডকে যায় জাহাজ।

এ-প্রয়োজন প্রত্যহ অসংখ্যবার হয়। তাছাড়া ভারি ভারি মন্থর-গতি বোটগুলো মাল খালাস বোঝাই ক'রে যাতায়াতের সময়ও ব্রিজ খোলে। একটা ক'রে রেলের সিগন্যালের মতোও আছে। সিগন্যালের হাত ভার হয়ে নেমে পড়াই ব্রিজখোলার সংকেত।—রোখো যানবাহন! দাঁড়াও পথিকবর!! তা সে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, যেখানেই জন্ম হোকনা তোমার! পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা হ'লেই বা কী—?

পূব-মুখী আর পশ্চিম-মুখী-পথচারী খোলা ব্রিজের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে যাবে হাজারে হাজারে। শক-হূনদল, পাঠান-মোগল প্রকৃতই লীন হ'য়ে যাবে যেন। বিরাট এক জনতার তাল। মাথা আর মাথা।

কালো কালো পাকা তালের মতো! মুসলমান মাঝি-মাল্লাদের তেল-জবজবে-মাথা রোদে চিক্ চিক্ ক'রে উঠবে। ফুল ফুটে উঠবে মাথার। তারপর একসময় ব্রিজ-সারেঙের দয়ায় আর অঙ্গুলি হেলনে ব্রিজ বন্ধ হবে, খুলবে পথ। তিলাইয়া বাঁধ থেকে ছাড়া জল ফুঁসিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো জনস্রোত ছিটকে গড়িয়ে পড়বে, কাতারে কাতারে। জনবন্যা আসবে বিপরীত দিক থেকে, কিছুক্ষণের জন্যে গাড়ি চলা বন্ধ ক'রে—।

প্রথম দিনেই ডিউটি যেতে পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো ব্রিজ। নবাগত অপরিচিতকে সহজে প্রবেশাধিকার দিতে চায় না নাকি? দাঁড়িয়ে থাকো। দেরী হবে নিশ্চয়ই। পশ্চিম দিকের অফিসগুলোর একটু বিবেচনা আছে এ বিষয়ে। সাত কেন পনর-খুন অর্থ্যাৎ পনর মিনিট দেরীও মাফ।

—দাঁড়িয়ে থাকো!

ওয়েষ্টসাইড্ ডকের সীমানা-দেয়ালের পেছনে লাল রঙের বিরাট প্রাসাদ। ডুমাইন এভ্যেন্যু স্টাফ্ কোয়ার্টার্স্। আরও পেছনে দৃষ্টির সূতো ছেড়ে দিলে চোখ প্যাঁচে প'ড়ে যাবে। লাল টুকটুকে বিরাটকায় মন্দির? সমাধিসৌধ? অন্তত তাজমহলের রূপান্তর? হলো না! বি, এন, রেলওয়ের প্রধান অফিস। অবাক্।

দেখা আছে লক্ষ্ণৌ রেল ষ্টেশনটাই কেমন দুর্গের ছাঁদের, কিন্তু অফিস মন্দিরের মতো হয় জানতো কে, শুনেছেই বা কে? দেখা তো দিল্লীর মতো, বহু দূরের কথা।

—দাঁড়িয়ে থাকো!

না, চলো! জন-সমুদ্রে তুফান লেগেছে। এগিয়ে চলেছে জনস্রোত, গা ভাসাতে না পারলেই ধাক্কা। খোলা, ব্রিজ জোড়া লেগেছে। আমাকে বাঁচিয়েছে অল্প সময় নিয়ে, প্রথমদিন দেরীতে যাওয়ার অপমানের হাত থেকে।

ওয়েষ্টসাইডে ছ' নম্বর আর আট নম্বর বার্থের মাঝামাঝি গুদাম আর রাস্তার পেছনে ওয়েষ্টসাইড্-অফিস, মেঘের পরে মেঘ জমেছের মতো, ঘরের পরে ঘর, সার সার, সামরিক ব্যারাককেও লজ্জায় লাল করে দেয়া সার। আবার রঙের ওপর রঙও। সবুজ দরজা জানলা আর মাথায় রাণীগঞ্জ টালির লাল-টোপর।

বিমিশ্র, বিচিত্র শব্দের কারখানা—। শব্দ সৃষ্টি হয় এখানে, না-জানা, না-শোনা—রকম বেরকমের! কোথায় কোন্ গুদামের পাথুরে মেঝের ওপর ফাঁপা লোহার পাইপ শব্দ ক'রে ফেলে জড়ো করা হচ্ছে। প্রতি দশ সেকেণ্ড অন্তর তার ঢঙ-ঢঙে শব্দ! এদিকে বারো নম্বর কী-লাইনে মালগাড়ি থেকে লোহার রেল্ খালাস করার ঝন্-ঝনাৎ—।

জলশক্তি চালিত-ক্রেনের সাপের মতো হিস্ হিস্ করা, আর জাহাজের ডেরিকের গলা ঘড়-ঘড়-কণ্ঠে স্বুর মিলিয়ে ঐকতান সৃষ্টি। ব্রিজের ওপর গাড়ি ঘোড়া, বারো নম্বর বাসের ভেঁপু, এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার চেষ্টা করছে সমান তালে।

ওয়েষ্ট-সাইড্ চার নম্বর ডক-গেটের আরো পশ্চিমে, ইয়ার্ডে কতকগুলো উর্দ্ধশ্বাস ক্ষুদে পি, সি, এঞ্জিনের হ্যাঁচ্চো করে নাক ঝাড়া। ওরা ষ্টিম ছাড়ছে নাকের মতো নিচের কোন নল দিয়ে। এঞ্জিনের ধোয়া-ধুয়ির কি যেন ব্যাপার চলে ওখানে। আরো পেছনে ডক্ বাউণ্ডারী-ওয়ালের ওপাশে ড্যামাইন এভেন্যুতে সাউথ্ ডিভিসন পোর্টপুলিস-অফিসের মাথায় ওয়ারলেস্-ট্রান্সমিটারের লম্বা শিরদাঁড়া, ঠায় দাঁড়িয়ে মৃদু বাতাসেও ভূমিকম্পের বাড়ির মতো, থর থর, থর থর, কাঁপে আর কাঁপে। ওর এ কী ম্যালেরিয়া? না কথা শোনার জন্যে কাণখাড়া? কী কথা শোনে ও যে লজ্জায় বা অপমানে কেঁপে কেঁপে, কেঁপে কেঁপে ওঠে?

গেটে ঢুকতে বাঁ-দিকে কালো-পাহাড় কোল-ডক। ডাঁই করা

কয়লার ঢিবিকে সাঁওতালী মেয়েদের তেল চুকচুকে উঁচু খোঁপার মতো লাগে—। লাল ওয়াগনগুলোকে দূর থেকে ওদের খোঁপায় গোঁজা পলাশ ফুলের সঙ্গে তুলনা করা যাবে? যাক না! ক্ষতি কী?

সার সার কুলি-কামিনকে কয়লার ঝুড়ি মাথায় নিয়ে কাঠের তক্তাপাতা রাস্তার ওপর দিয়ে জাহাজের খোলের মধ্যে কয়লা ফেলে আসতে দেখা যায়। কাস্নিমূর্তি—। মধ্যাহ্ন-রৌদ্রেও ঝিমঝিমে ঘোলাটে আকাশ-ইজেলে আঁকা সিল্যুটের ছবির মতো দেখায়। জ্যান্ত চলচ্চিত্র।

এতো দেখার কথা নয় এখন। সময় কোথায়? তবু চলেছি চোখ দিয়ে স্পর্শ ক'রে ক'রে। কতো দেখলাম। কতো সম্পদ চোখের—মনের। সবচেয়ে সত্য—সেই মৃত্যুঞ্জয় চরিত্র সম্পদ। লেখাজোখা নেই। সমুদ্রতীরে ছোট ছেলেমেয়েদের সব ঝিনুক কুড়িয়ে কোঁচড় বোঝাই করার মতো—গন্য নগণ্য সব কিছুই ভ'রেছি আমার সাজিতে। এ যে ফুল-সম্ভার। এই দিয়েই সাহিত্য সরস্বতীর পুষ্পাঞ্জলি দেয়া যাবে জীবনভ'র—।

অফিসে অভ্যর্থনা করলেন মিঃ দত্ত।

—আসুন মিঃ ঘোষাল, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম!

ঠিক দুটো। আফ্‌টারনুন ডিউটিতে প্রথম আমার কাজ শুরু স্বাধীন-ভাবে। বিকেলের কাজটা সাধারণত হালকা। চারটে থেকে সাতটা প্রায় কোন কাজ না থাকার শূন্যতা। মেজাজ থাকলে বাইরের বারান্দায় চেয়ার টেনে এজরা পাউণ্ডের কবিতা প'ড়ে এ সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করো। সন্ধ্যে সাতটায় আবার কাজ আরম্ভ। সকালের-পাল্লাটাই কঠিনতম। ভোর ছটায় এসে, সাতটা থেকে নটার মধ্যে হোমরা চোমরা কর্তাদের পার করতে হয় একের পর এক—। তার আগেই সমস্ত সেকশনের পজিসন অর্থাৎ অবস্থার হিসেব মুখস্ত ক'রে ফেলতে হবে পাঠশালার

ছাত্রদের মতো দুলে দুলে—। মুখস্ত করার শাস্তি এ জীবনে এখনো গেলো না—। যে কোনো খবর কাগজ না দেখে বলতে পারলেই পাশ, ভালো কর্মী! স্মার্ট, এফিসিয়েণ্ট!

আর সবার ওপর আছেন এ্যটম্-বোম্! বাঘা ট্রাফিক-ম্যানেজার মিঃ, মৈত্র। সমস্ত পোর্ট তাঁর নখদর্পণে। একটু ভুল করার উপায় নেই, ক্ষমা নেই ভ্রান্তির—। ক্ষমতা নেই কাগজ দেখে পজিসন দেয়ার—। যা-তাই ব'লে বসবেন তা-হলে। বাঘের চেয়েও ভয় সকলের—! ওঁর লালগাড়ি কোথাও দেখা গেলে টেলিফোনের তারে তারে চারদিকে খবর চলে যায়।—পালে বাঘ প'ড়েছে!—হুঁসিয়ার!!

বড় বড় অফিসার, সুপারিণ্টেডেণ্টরা অপদস্থ হবার ভয়ে পালিয়ে, এড়িয়ে বেড়ান—। এমন কি মিঃ ইয়াকুচিকেও দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াগনের তলায় লুকিয়ে পড়তে দেখা গেছে!

আর ওঁর তো প্রশ্ন নয়—তির্যক বল্লম এক একখানা। ঠিক যে জিনিসটির গুরুত্ব না দিয়ে অবহেলা করা হ'য়েছে, খবর রাখার প্রয়োজন মনে হয়নি, তার ওপরই হৃৎকম্পন-প্রশ্ন—। ভদ্রলোক কী কপালের রেখা দেখে থট্‌রিড করতে পারেন? বিস্ময়কর! দুর্বল বিন্দুতে ঠিক আঘাত করবে ওঁর জিজ্ঞাসার বুলেট্। উড়িয়ে, ফাঁসিয়ে বিপর্যস্ত ক'রে ফেলবে প্রতিপক্ষকে—।

বিশাল চেহারা। সব সময় মুখে ধূমকেতুর মতো এক ইয়া চুরুট জ্বলছে। চুরুটের জন্য মুখটা ঈষৎ হাঁ হয়ে থাকে। হাঁ ক'রে থেকেও হাঁ-করা-লোক তো ননই—বরং বিপরীত—। কার্যকলাপে অন্য সকলকে হাঁ করিয়ে ছাড়ার সুনাম ওঁর। কতো গল্প ওঁর সম্বন্ধে। এখানকার হীরো। মুখে মুখে গল্প। কথায় কথায় ওঁর প্রসঙ্গ উত্থাপন। কোথায় কাকে কী প্রশ্ন করলেন; বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরে কেমন খুশি হলেন; ভালো কাজে কেমন উৎসাহ-অভিনন্দন জানালেন।

মিঃ দত্ত দু'চার কথায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডেনমার্কের প্রিন্সের মতো, তাঁর কথায় হাজির। মনে প'ড়ে গেলো প্রাক্-নিয়োগ সাক্ষাতের সময় প্রশ্নের কথা। উনিই প্রশ্ন ক'রেছিলেন—একটা জাহাজ থেকে বিশফুট লম্বা একখানা সিঁড়ি তিন ফুট উঁচু এক ভাসমান পণ্টুনের ওপর বিলম্বিত হয়ে আছে। হঠাৎ বান এসে জল ছ' ফুট উঁচু হ'য়ে গেল। সিঁড়িটার কতোটা ভাসমান থাকবে? এসব লোক ঠকান প্রশ্ন কী আর চলে? তড়িৎ উত্তরে উনি খুশিই হলেন মনে হ'লো। এসব ক্ষেত্রে খুশি হয় না মানুষ। সঠিক উত্তর জোরের সঙ্গে করার বিপদই বেশি। প্রশ্নকর্তার রোখ চেপে যায় ওতে। জেদ চেপে যায় প্রতি-পক্ষকে বিপর্যস্ত করার বিমল আনন্দলাভের জন্যে।

ঠিক উত্তর দিলে যেন উত্তরকারীর অপমান। আর, একজনকে পরীক্ষায় ঠকাবো মনে করলে সফল হওয়া যাবেনা এমন নজীর মানুষের জগতে হয় না, হ'তে পারে না!' সম্ভব যদি কোথাও হয় তো রূপকথার রাজত্বে—আর গল্পে—। কিন্তু ইনি তেমন নয় ব'লেই মনে হ'লো! কিংবা হয়ত মনে ধরেছে আমাকে। একটু হেসে আর দুটো প্রশ্ন করেছিলেন।

—সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত পোর্টের নাম করুন?

উত্তর দেবার আগে হেসে ফেলেছিলাম—। তবুও তৃতীয় প্রশ্ন।

—গোয়ার বন্দরের নাম কী? এবং চতুর্থ ও পঞ্চম—

—ভারতের আমদানী দ্রব্যের তালিকা—। নেপালের রপ্তানী সম্বন্ধে কিছু জানি কিনা—।

ব্যস চাকরি হ'য়ে গেলো। আবার সেই চাকরিই আজ হ'য়ে গেলো। মানে শেষ। সেখানেও ব্যস্!

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন বা।

—আপনি কী প্রবেশন-পিরিয়ডে এ্যাটম্ বোমের হাতে পড়েছেন

কোন দিন ? মিঃ, দত্ত হঠাৎ প্রশ্ন করলেন,—আপনাকে ফাঁক-ফিকির জানিয়ে দেয়ার জন্যই বলছি,—কিছু মনে করবেন না ?

—হ্যাঁ, একদিন কিং জর্জেস ডকের চার্জ নিয়ে কাজ করতে হয়েছিলো। জানতে পেরে কিনা জানি না, ঠিক এসে হাজির। প্রথমেই আপনাদের সুবিখ্যাত পজিসন্ চেয়ে বসলেন। কাগজটা একটু আড়চোখে দেখে বলতে যেতেই উঠলেন চটে—।

—ওতো যে কোন সাধারণ শেড্ ক্লার্কও বলতে পারে অমন ক'রে! তোমাদের মতো সো-কল্ড্ য়ুনিভার্সিটি জুয়েলদের আনা হয়েছে কেন তা'হলে? ডক সাজাবার জন্য নয় নিশ্চয়ই! Not for the decorations of the Docks!

—তারপর ? মিঃ দত্ত কপালটাকে কুঁচকে রেখায় রেখায় দুর্বোধ্য জ্যামিতিক-প্রব্লেম ক'রে তুললেন একেবারে।

—তারপর আর কি, নতুন ব'লেই বোধহয়, শেষে কয়েকটা উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। পরদিন থেকে আমি হুঁসিয়ার! এতোদিন তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উড়িয়ে দেয়া ব্যাপারটাকে আমাকেও করতে হ'লো। সকালে এসেই অন্য সবার মতো দুলে দুলে প্রায় সুর করে, পজিসন মুখস্ত করা প্রথম কাজ—। হয় কি ছাই! ঐ নীরস জিনিস! প্রাণের দায়ে।

—নতুন বলেই রক্ষে! পুরোন'র ক্ষমা পাওয়া সোজা নয়। মিঃ দত্তর উৎসাহ-প্রদীপের সল্‌তে উস্‌কে দেয়া হ'লো যেন,—এই তো কিছুদিন আগে মিঃ টি, এস, বেলিারি নামে এক অপদার্থ ট্রাফিক সুপারিন্টেডেন্ট্ ছিলেন। সিনিয়রিটির জোরে পদপ্রাপ্তি। পড়াশোনা, বিদ্যেবুদ্ধি, কাজকর্ম সবেতেই কর্পোরেশনের ক্রনিক্-বাজেটের মতোই ঘাটতি। সে যুগের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বলেই চাকরি। তারওপর আবার রুগ্ন, রুগ্ন! সঙ্গে এক রবার স্পঞ্জের বালিশ আনতেন রোজ, চেয়ারের ওপর পরিপাটি ক'রে পেতে আরাম ক'রে

বসার জন্যে। রাতের ডিউটির জন্য অফিসের পেছনের গুদাম ঘরে থাকতো লুকোনো ইজি-চেয়ার। একবার রাউণ্ড্ দিয়ে এসে কেরানীদের ঘরটা খুলিয়ে ইজিচেয়ায় পাতিয়ে শরীর এলিয়ে দিতেন ফ্যান চালিয়ে। রাতের পিওন বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিতো—। তার ওপর কড়া নির্দেশ—কেউ এলে বা টেলিফোন করলে এক জবাব—সাব রাউণ্ড্মে হ্যায়! এই অভ্যেস, নিত্য-নৈমিত্তিক—।

তিনিই একবার ডেপুটির খালি পদের জন্যে প্রার্থী হ'লেন সিনিয়রিটির কোয়ালিফিকেসনস্'এ, চাইলেন মিঃ মৈত্রের সুপারিশ আর অনুগ্রহ—। কিন্তু পদ তো পেলেনই না, উল্টে দেখতে হ'লো ওঁর জুনিয়ার, যিনি তাঁবে কাজ করেছেন—তিনিই পদাভিষিক্ত হ'য়ে বসেছেন—।

উনি খোদ কর্তার কাছে আর্জি পেশ করতে ছাড়লেন না। কেন এমন অনিয়ম হ'লো চাইলেন জানতে—।

—আমি রেকমেণ্ড্ করতে পারিনি। মিঃ মৈত্র জবাব দিলেন ছোট্ট ক'রে।

—কেন স্যার আমার অপরাধ?

—তুমি যোগ্যতার অনেক বেশি পাচ্ছ! চিয়ারিও! স্পষ্ট জবাব। একবার হ'লো কী একটা ব্যাপারে মিঃ মৈত্র ওঁকে খুঁজলেন একদিন। কোথাও পাত্তা পাওয়া গেল না ওঁর। ওয়েষ্ট সাইডে রাউণ্ড্ দিচ্ছেন শোনা গেলো শুধু—। মিঃ মৈত্র অন্য এক অফিসারের গাড়িখানা নিয়ে ওয়েষ্ট্ সাইড্ অফিসের থেকে একটু দূরে ঐ ইয়ার্ড্ অফিসের সামনে গাড়ি রেখে, চুপচাপ অফিসে এসে বসে রইলেন চুরুট না ধরিয়ে—। মিঃ বেলারি ছ'নম্বর গুদামের ঐ কোণ থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে নিশ্চিন্ত হ'লেন—না ফাঁড়া কেটে গেছে। অফিসের সামনে লাল গাড়ি কেন, কোন গাড়িই নেই। বাঁচোয়া!

মনের আনন্দে শিস দিতে দিতে তিনি স্মার্ট্লি অফিসে ঢুকলেন, একেবারে বাঘের গর্তে—।

সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাচ্ছিলেন ইন্স্টিংট্' এর বলে।

—That's right Bellery, you need not take further trouble! I know your worth ; when retiring—?

—বেলারি তখন কাঁপছেন। সাপের মুখে পড়ে খরগোস যেমন ক'রে, কাঁপে—। আমতা আমতা, আর স্যার, স্যার ছাড়া গত্যন্তর কী তখন! কোথায় গত্যন্তর?

এখানকার ভাষায় চালু ছেলে তপেন দত্ত। এঁরা বলেন চালুচ্যাপ। সুগঠিত পেশীবহুল চমৎকার দেহশ্রী। স্মার্ট্। কথাবার্তা চালচলন, অঙ্গ-ভঙ্গী সবেতেই মার্জিত রুচি, আভিজাত্যের দ্যুতি। দেখলে বাঙ্গালী ব'লে মনে করা শক্ত। খাস ইউরোপীয় না হ'লেও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব'লে অনায়াসেই চালিয়ে দেয়া যায়। ওর মা নাকি কাশ্মীরি—। পরে তপেনের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি। দোষও নাকি প্রচুর। **Too many affairs** ! ওই দোষই প্রধান। ওর কতকগুলো উক্তি ফেরে লোকের মুখে মুখে। উঁচুনীচু অফিসার, কেরাণী সকলেরই মুখরোচক আদর্শ-উক্তি—।

কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পাত্র নয় দত্ত। খট্ খট্ জুতোর শব্দ তুলে সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে গিয়ে, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ওর বাহন নর্টন মোটর-বাইকখানায় কিক্ করতে শুরু ক'রে দিলো চোখের নিমেষে—।

একবার—দুবার—তিনবার—। ফুঁসে উঠল তার ভেতরের জন্তুটা—। গর্তের সাপ গর্জে উঠল খোঁচা খেয়ে। গিয়ার আর এাক্সিলারেটরের কী এক অদৃশ্য রাশ টেনে, ছেড়ে, ডান পা আর দু'হাতের ঘোরাফেরায় তাকে গতি দিলো তপেন দত্ত। ঘোড়ার পেটে ঘোড়াসীর গুঁতো দেয়ার মতোই গিয়ারে ঠোক্কর। ঘোড়ার মতোই

লাফিয়ে ছিটকে পড়ল গাড়ি। দত্তর কেম্‌ব্রিকের হাফসার্টের পিঠ বেলুনের মতো ফুলে উঠে হ্যাঞ্চ্‌ ব্যাক্‌ অফ্‌ নতরদাম্‌কে মনে করিয়ে দিলো। বেশ বোঝা গেলো স্পীডোমিটারের কাঁটা একেবারে তিরিশ ছুঁলো—। একেবারে—

এবার একা। পাশের অফিসঘর থেকে বাবুদের কথাবার্তার আওয়াজ শুধু—। ঘণ্টা বাজালেই বেয়ারার এসে দাঁড়ায় অবশ্যই। কিন্তু থাক। কেন ঘণ্টা? সামনের ছ'নম্বর বার্থের সব কটা ক্রেণে আয়রণ-ওর উঠছে টব বোঝাই—। পৃথিবীর কোন্‌ কারখানায় কী রূপ নিতে চলেছে ওরা জানি না। চাইও না জানতে—। নিজেকে বাঁচানোর তাগিদের টব বোঝাই ক'রে এই পোর্ট-কারখানায় এনে ফেললাম নাতো চাকুরে রূপ নিতে?

কোনো প্রয়োজনীয় কাজ না করা হ'লে অন্য মনেও বুকের মধ্যে কেমন একটা রীণ্‌ রীণ্‌ করে। ঠিক সেই রকম ক'রে উঠল আবার—। কী যেন হারাচ্ছি হারাচ্ছি ভাব। একটা অস্বস্তির খোঁচা—মাঝ-গঙ্গার 'বয়ার' আলোর মতো জ্বলতে নিবতে থাকলো অন্তরে অন্তরে—।

সকাল-দুপুর-রাত—।

তাহ'লে এই তিনটি হ'লো আমার সময়গ্রন্থী? ওদের ভাষায় বলে মর্ণিং, আফ্‌টারনুন আর নাইট শিফ্‌ট্‌। ছটা, দুটো আর রাত নটা—। আমাদের বিকেলের সঙ্গে আফ্‌টারনুনের তফাৎ আছে। বেলা দুটো আমাদের কখনও বিকেল নয় দুপুর—। আর আমাদের বিকেল পাঁচটা তো ওদের ইভ্‌নিঙ—। তাই সকাল—বিকেল রাত না বলে বলেছি সকাল দুপুর রাত। এর মধ্যে আফ্‌টারনুন ডিউটিটা ভালো বলতে আপত্তি ছিলো না যদি না মধুর সন্ধ্যে

উপভোগ করার অভ্যেসটা মজ্জাগত হ'য়ে যেতো। সকাল আর রাতপাল্লা একাধিক কারণে দুর্বিষহ।

বলবে, তাহলে সেই দেড়টাকা রোজের একটাকা অচল আর আটআনা বাজেয়াপ্ত হওয়ার গল্পের মতো ভালো রইল কোনটা? কোনটা? সত্যিই কেউ ভালো নয়। সুকুমার রায়ের 'কিন্তু সবার চাইতে ভালো'ও ভালো নয়-কেন না ঐ পাঁউরুটির জন্যেই চাকরি—।

তপেন দত্ত তো চলে গেলো—। এবার কী করা—। নয়মমত একটা রাউণ্ড্ দিয়ে সেকসনের ঠিক এখনকার অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল হওয়া উচিত হয়তো—। তবু একটু গড়িমাসি—।

—স্যার!

স্পেশাল অর্ডার বইটায় দিনের কাজকর্মের প্রোগ্রামের ওপর চোখ বোলাচ্ছিলাম। মুখ তুলে থমকে গেলাম। কতকগুলো পিওন বই স্কুলের ছেলেদের মতো বুকে চেপে ধরে, নীল বুশসার্ট পরা ঝকঝকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। ব্যাক্‌ব্রাশ করা চুল আর আনুষঙ্গিক পোশাকে আমার চেয়েও উজ্জ্বল বলা চলে, সৌখীনও—।

—কী চাই বলুন?

আমাকে আপনি ব'লে লজ্জা দেবেন না স্যার! আমি আট-নম্বর গুদামের পিওন, এখানে বলে মাইনেওলা…। অবিনাশ দাস আমার নাম। একটা নিবেদন আছে স্যার!

—বল।

—আমাকে স্যার গ্যাঙ্‌এ বদলী ক'রে দিন—!

বলে কি লোকটা? গ্যাংএ যাওয়া মানেই তো ক্রেন্ ঠেলা, গুদাম ঝাড়ু দেয়া। কী-লাইন আর গুদাম ধোয়া, খুঁটিনাটি আরো কতো কাজ—রীতিমতো আটঘণ্টা দৈহিক পরিশ্রম—। ওর

মতো পরিচ্ছন্ন ছেলে কেমন ক'রে করবে ?

—কেন, তুমি গ্যাংএ যেতে চাইছ কেন ?

—অনেক কারণ স্যার! প্রথমত গ্যাংএ ওভারটাইম পাওয়া যায়। সংসার চালাতে হয় স্যার! যদি হু'পয়সা বেশি আসে! চেষ্টা করতে হবেতো। আর উন্নতি ঐখানেই। গুদামের খালাসীদের কোনো আশাই নেই—। এক পরীক্ষায় পাশ ক'রে মার্কম্যান হওয়া, সে অগাধজল—। তাছাড়া আর একটা কারণ আছে স্যার। যদি অভয় দেন তো বলি—!

—নির্ভয়ে বলো!

—গ্যাংএর লোকেরা সব পশ্চিমা। ওদের ধারণা বাঙ্গালীরা গ্যাংএ কাজ করতেই পারেনা—! শনিচর সারেঙ তো আমাদের মুখের ওপরই বিদ্রূপ করে; বলে—চিংড়ি-ভাত খেয়ে ক্রেন ঠেলা যায় না। কাজে হাত দিলেই খুঁত ধরবে; হেয়ো করার জন্যে মুকিয়ে আছে; আর সুযোগ পেলেই চুকলি খেয়ে ক্ষতি করবে! আমাকে বদলী ক'রে দিন স্যার, আমি দেখিয়ে দিতে চাই আমাদের অসাধ্য কিছু নেই—।

অবিনাশের চোখে আগুন।

—ঝোঁকের মাথায় বাজি ধরে লাগার মতো, বদলী হবে ? শেষে খাটুনি সহ্য করতে না পেরে যদি অসুখে পড় ?

—প্রাণ যায় সেও ভালো স্যার, মানটা আগে! অবিনাশ জোরের সঙ্গে ঘাড় তুলিয়ে বলল—।

বিস্ময় আর লজ্জা যুগপৎ আক্রমণ করল আমায়।

বা রে ছেলে—!

অবিনাশ যেন উৎসাহ পেয়ে গেলো, থামলো না।

—আমাকে মাষ্টারমশাই বলতেন স্যার,—যে যুগ আসছে তাতে শারীরিক পরিশ্রম না ক'রে যে বাঁচার আশা করবে যুগই তাকে

জঞ্জালের মতো দূরে সরিয়ে দেবে। অন্ন জুটবে না তার। উনি ঠিক বলতেন স্যার। গায়ে গতরে না খাটাই আমাদের এই দুর্গতির একটা কারণ। বেকার বসে থাকবো, তবু দৈহিক শ্রম করব না ; তাতে নাকি মান যাবে। দেখুন সারা ডকে একজনও বাঙ্গালী সারেঙ নেই !

ওর নিছক বাঙ্গালীয়ানায় আমার সংস্কার বর্জিত, জাতিধর্ম, বর্ণ-শ্রেণী বিলোপ প্রবণ-মন আহত হলেও, মনের কোথায় যেন আলো জ্বলে উঠল। ঐটুকু সময়েই ভাবিয়ে তুললো অনেক কিছুই। ওতো ভাবে দেখছি ! আমার চেয়ে কম ভাবে না অন্ততঃ—।

—তা তোমার চাকরি কদ্দিনের— ?

অবিনাশ একটা তারিখ বলল তৎক্ষণাৎ—। চমকে উঠতে হ'লো এবার। আশ্চর্য তো ! আমার নিয়োগের দিনটা বলছে ও—। অবাক হবো না ? এরি মধ্যে ও উন্নতি-ভবিষ্যৎ এবং অন্যান্য অনেক কিছুই ভেবেছে আর ভাবছেও। বা রে ছেলে ! বললাম—দেখো, আমিতো এখানে সবে চার্জ নিয়েছি। এখানকার অবস্থা বিশেষ কিছুই জানিনা ! মর্ণিং ডিউটিতে আসি, তখন বুঝেসুঝে বদলী করে দেবো তোমায় —।

—ধন্যবাদ স্যার — !

নমস্কার করে চলে গেলো অবিনাশ। পেছন থেকে ওর সুগঠিত শরীর দেখতে দেখতে খালি গায়ে ওর পেশীবহুল সুদৃশ্য বুক পিঠের কল্পনা ক'রে নিলাম একটু—।

ও ভেবেছে তো ! জিজ্ঞেস করা হলো না লেখাপড়া কতো দূর করেছে। কিন্তু ভেবেছে। ভারতে যেমন দ্রুত শিল্পায়ণ-কার্য চলেছে তাতে হাতে নাতে কাজ আর কারিগরী বিদ্যারই কদর হবে বেশি, পুঁথিগত বিদ্যার নয়। আর এই ব্যাপারে

কোনো প্রদেশ-বিশেষ তার ভূয়ো আত্মসম্মান নিয়ে বসে থাকে তো শাস্তি পাবে: —নিম্নমান জীবনযাত্রা আর দারিদ্রের শাস্তি। অন্নহীনতা, অস্বাস্থ্য আর গৃহহীনতার শাস্তি, বেকারী আর বিপুল সংসার সমস্যার শাস্তি। এ পেতেই হবে। আংকিক নিয়মে এর আগমন। অবশ্যম্ভাবী! দেশে বাড়বে প্রতারণা আর লাম্পট্য, মিথ্যা আর কদাচার। কমবে সততা, ন্যায়নিষ্ঠা আর কর্ত্তব্যবোধ—এ হতেই হবে—! অবিনাশ ঠিক ভেবেছে।

আসমুদ্র হিমাচল, উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম, কাজে কর্মে বহুমুখী পরিকল্পনার রূপায়ণ আর বাস্তবায়ণে টলমল করিয়ে দিতে হবে। কাজের উত্তেজনা আর জ্বরভাব থাকবে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে—। তবেই না!

বাধ্য হয়ে লক্ষ্য করতে হয়েছে যে পশ্চিমা প্রতি দিনমজুরের পেছনে অন্তত এক কানিও জমি থাকে। তাতে কিছু না হোক বছরের প্রয়োজনীয় চাল বা গমের কিছুটা সংগ্রহ হ'তে পারে চেষ্টা করলে। ওদের তার কসুর নেই। ওরা শ্রমিক-চাষী—. চাহিদা অল্প। চাকরির টাকা তা সে যতোই কেন খুদ্রকুঁড়ো হোক, বাঁচে কিছু। বাঁচায় ওরা। সেইটেই আবার জমি আর বয়েলের পেছনে ঢালে—। কিছু সঞ্চয়ও। অর্থবিদের চোখে এতে শিল্পের ক্ষতি হ'লেও, ওদের লাভ। ওরা চার মাস কৃষক আট মাস শ্রমিক। বাংলার কৃষকরা শুধু ফসল ফলায় আর দুই ফসলের মধ্যবর্ত্তী সময় তাস আর হুঁকো চালায় সাধারণত। ভুল, ভুল করে এরা। বোকামী করে। দেশের দশের ক্ষতি। কে বোঝায়? অবিনাশ বুঝেছে। কতো জন অবিনাশ আছে দেশে? কতো জন? মোট কতো জন?—

টেলিফোন ককিয়ে উঠল। ককিয়ে যাওয়া-শিশুকে তুলে নেয়ার মতোই তুলে নিলাম। মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে

করলাম আদরঃ কানে কান চেপে ধরলাম—। —টেলিফোন মাইক্রোফোনের মতোই এমন এক অবহেলাপ্রবণ দায়িত্বজ্ঞানহীন জীব। কানে কথা তোলে না ওরা। সমস্ত কিছুই এ কান দিয়ে শুনে সঙ্গে সঙ্গে ও কান দিয়ে বার করে দেয়—। —

--Yes !

—133 ? অপর পার থেকে তারের সড়ক ধরে কার কণ্ঠস্বর হেঁটে এলো---।

- Yes, Asst Supdt. speaking !

—গুড্ আফ্টারনুন স্যার ! মিঃ লিউইস্ আছেন ?

- -নাতো ! কে আপনি ?

-আমি একনম্বর শেডের ফরওয়ার্ডিং ক্লার্ক ! দেখুন না, কি মুস্কিলে ফেললেন বড় সায়েব--! আমার সাইকেল খানা সেই যে নিয়ে গেছেন আর পাত্তা নেই--! কাল হয়তো বলবেন পার্কসার্কাস থেকে গিয়ে নিয়ে আসতে ! এখন বাড়িও যেতে পাচ্ছি না ! কি যে করি--- — —।

হাসতে হ'লো আমাকে--।

--জেনে শুনে দেন কেন সাইকেল ?

—কী করব, উনি যে জানেন সাইকেল আনি। দোব না তো বলা যায় না !

—আচ্ছা, ইতিমধ্যে এলে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব !

—ধন্যবাদ স্যার ! ছেড়ে দিচ্ছি— !

—আচ্ছা— আচ্ছা— ! —

টেলিফোন-শিশুকে শান্ত করলাম তার চাহিদা মিটিয়ে। যথাস্থানে ঘুমন্ত ছেলের মতোই শুইয়ে দিলাম অতি সন্তর্পণে—।

এক এক জনের মুখখানা মনে পড়লেই হাসি পায়। আর প্রত্যেকেরই এমন এক এক জন থাকে না এমন নয়। মিঃ লিউইস্

আমার সেই এক এক জনের প্রধানতম—। মনে পড়লেই, দেখলেই হাসি পায়। সামনে কিন্তু চাপি। কিংবা ওর কথাবার্তার সঙ্গে হাসিকে খাইয়ে মিশিয়ে দিই, বুঝতে দিই না—। ভদ্রলোককে এ ক'মাস যতোই দেখেছি ততই আশ্চর্য আর কৌতূহলী হয়েছি—। কোনোদিন হয়তো কিং জর্জেস ডকের কারুর নতুন সাইকেল খানা দশ মিনিটের কড়ারে চেয়ে নিলেন আর দু'ঘণ্টা পরে ক্যালক্যাটা জেটী থেকে ফোন ক'রে তাকে জানালেন যে সে যেন এক নম্বর খিদিরপুর ডকের তিন নম্বর গেটওয়ার্ডারের কাছ থেকে সাইকেল খানা নিয়ে যায়। তিনি হঠাৎ তাঁর বন্ধুর গাড়িতে জেটীতে চলে এসেছেন—। এবং হয়তো ব্যাপারটা আরো জটিল ও গাল্পিক উপাদানপূর্ণ হ'লো দৈবাৎ সেই সাইকেল-ওলা ভদ্রলোকের বাড়ি দুর্ভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে মেটিয়া-বুরুজে হয়ে—।

মিসেস্ লিউইস কিন্তু ঠিক বিপরীত—।

নিখুঁত হিসেবী, ব্যক্তিত্ব সম্পন্না। এদিকে ভালো সাঁতার কাটেন, গান করেন ভদ্রমহিলা। চমৎকার চেহারা। ইদানিং একটু মোটা সোটা হয়ে গেছেন এই যা। স্বামীকে ভালোবাসেন, সেবা শুশ্রূষা, ভক্তিশ্রদ্ধাও করেন প্রচুর, কিন্তু বিশ্বাস করেন না কখনই—। কড়া শাসন করেন বরঞ্চ—। মাইনের প্রতিটি পয়সা হিসেব করে নিজের হাতে নেন্। দৈনিক হাত খরচার হালকা বরাদ্দ, সাপ্তাহিক রেসের—। রাতের ডিউটিতে মিসেস্ বারে বারেই টেলিফোন ক'রে খোঁজ খবর করেন। চরিত্রে বিশ্বাস নেই—। উনি যে ভালো ক'রে জানেন লিউইসকে—। লিউইস আরো চতুর, এতেও ঠকান মিসেস্‌কে—।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জে বলা আছে, ব্যবস্থা আছে, কোথায় থাকেন না থাকেন; খবর দিয়ে সাবধান করে দেয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জের

মেয়েরা। আর এক্সচেঞ্জেই তো বেশির ভাগ থাকেন রাত্রিতে—। হয়তো ওখানেই আছেন, এক্সচেঞ্জের মেয়েদের কেউ মিসেস্ লিউইসের কণ্ঠস্বর বুঝে, কনেক্‌সন দেবার ছল ক'রে হেড্‌ফোন-টাই লাগিয়ে দিলো লিউইসের কানে—। আর লিউইস যেন অফিস থেকে ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে কথা বললেন—খুব ব্যস্ত মাইডিয়ার! এই শীতে তুমি কোথায় আর আমি কোথায়! চাকরি এমনি! বলোতো রিজাইন করি—ভালো লাগে না রাতে তোমাকে ছেড়ে থাকতে—!

মিসেস্ হাসলেন। অতয় কাজ নেই। লক্ষ্মী হ'য়ে থাকলেই বাঁচি—। লিউইসও হাসলেন; কারণ ঠিক সেই সময় তাঁর ডান হাতটা টেলিফোন গার্ল মিস্ এলিয়টের কোমরে ময়াল-জড়ানো—। বললেন স্ত্রীকে—ডারলিঙ্ তোমাকে কাছে পেলে এখন বুকে ক'রে রাখি—! রাখলেন মিস্ এলিয়টকে—।

—আর এমনি ক'রে চুমু খাই—! আশ্চর্য, শব্দ তুলে মিস্ এলিয়টকেই চুমু খেলেন। মিসেস্ খুশিতে উথলে উঠলেন অপর পার থেকে পাঠানো চুম্বন পেয়েছেন মনে ক'রে—। লিউইস হয়তো তখন হাসিতে ফেটে পড়তে যাওয়া মিস্ এলিয়টের মুখ চেপে ধরেছেন প্রাণপণ শক্তিতে—।

একদিন হ'লো কি উনি রাত দশটার সময় ডিউটি শেষ হ'য়ে যাওয়া এক টেলিফোন অপারেটরকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে দিকবিদিক জ্ঞান হারালেন—। বারোটার পরে হ'লো খেয়াল—। অফিসের ডিউটি চুলোয় যাক—মিসেস্এর ডিউটির টনক—। সেইখান থেকেই মিসেস্‌কে সোজা ফোন—হ্যালো, আমাকে ডেকেছিলে ডারলিঙ্?

—ডেকেছিলে মানে? খুঁজে খুঁজে হয়রান! কোত্থেকে ফোন করছ শুনি?

—কেন অফিস থেকে—!

—মিথ্যে কথা! এইমাত্র আমি শেষবার অফিসকে ফোন ক'রে ফোন নামিয়ে রাখছি! সত্যি বলো, কোত্থেকে করছ?

—কী বিপদ, রাউণ্ড থেকে ফিরেই শুনলাম তুমি ফোন করেছিলে এইমাত্র। চেয়ারে বসার আগেই টেলিফোন তুলে নিয়ে তোমায় ডাকছি! তুমি কি বিশ্বাস করছ না ডিয়ারেষ্ট? ততক্ষণে লিউইস নতুন টেলিফোন অপারেটর মিস্ জর্জকে বুকে চেপে ধরেছেন—যেন মিসেস্কেই—এই ভাবে বলছেন, মুখে ক্ষীণ হাসি—।

মিসেস্ লিউইসের মুখে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল। কোথায় চলে গেলো রাগ আর উদ্বেগ—।

—আমি তো ট্যাক্সি ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম, তোমাকে খুঁজতে বেরোবার জন্য—!

—তুমি খুঁজবে কি আমিই তোমাকে ফোন করার সুযোগ খুঁজছি তখন থেকে। নেহাৎ বাইরে ঘুরতে হচ্ছিলো তাই—!

—'m sorry darling! Cheerio!

মিসেস্ লিউইস আনন্দে ডগমগ করতে করতে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুতে গেলেন, আর শুয়ে শুয়ে লিউইসকে ভাবতে ভাবতে আবিষ্ট হ'য়ে চমকে চমকে উঠলেন দৃঢ় অলীক-আলিঙ্গনে, আর চুমোয় চুমোয় উঠলেন শিউরে শিউরে। কাল সকালে লিউইস এলেই একটা warm kiss দেবেন। এমন সন্দেহ করার জন্যে এপোলজি চাইবেন openly. —মিসেস্ লিউইস ঘুমিয়ে পড়লেন—।

এ ঘটনা মিঃ লিউইস নিজেই তাঁর এক অন্তরঙ্গকে বলেছিলেন কোনো এক টলমলায়মান মুহূর্তে—। ——

—মিঃ ঘোষাল!

আমিও আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলাম নাকি মিসেসের মতো লিউইসের কথায়? তড়িতাহতের মতো চমক খেয়ে চেয়ে দেখি সামনেই সশরীরে মিঃ লিউইস অতি কৌতূহলী দৃষ্টির প্রলেপ বুলিয়ে চলেছেন আমার ওপর—। মাটির সঙ্গে নব্বই ডিগ্রি কোণ করা-সরল রেখা-শরীর—।

—Yes Boss?

—How is your section?

—Quite alright sir!

—Please send this cycle to Manmatha of No. I K. P. D.!

—Okay Boss!

ডকের কথাভাষা ক'মাসেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত আমার। বেশ বুঝতে পারলাম আমার সাইকেল চড়তে না জানা কোনো পিওনকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ফেরৎ দিয়ে আবার হেঁটে হেঁটে ফিরে আসার শাস্তি ভোগ করতে হবে, মিঃ লিউইসের এক-পিঠ সাইকেল চ'ড়ে আসার আরামের বিনিময়ে—। হলোও তাই—। রাম পিয়ারীকে বলতেই সে যেন মুখ কেমন কেমন করল আর কি যেন বিড় বিড় করতে করতে হুকুম তামিল করল অনভ্যস্ত হাতে আর বেকায়দা পদক্ষেপে—।

ওই বিড়বিড়িনিতে বড় সায়েবের বাপান্ত তো ছিলোই, আমারও যে কিছু ছিলো না বলি কেমন ক'রে? লিউইস সায়েব কিন্তু ততক্ষণে পাশের কাষ্টম্‌স অফিসের টেবিলে পা তুলে দিয়ে ভালো চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছেন। তাঁর অত্যধিক-জোর আর মাত্রা দেয়া দেয়া কথা আর ছাদ ফাটানো হাসি ভেসে আসছে পাশের-পাশের ঘর থেকে—।

রাউণ্ডে বেরোলাম—।

আমার প্রথম স্বাধীন রাউণ্ড—।

পুলিশী অভিধানে একে নাকি বলে রোঁদে বেরোনো—! আসলে এ—দিনে রোদে বেরোনো আর ঠাণ্ডায় বেরোনো রাতে—

বুঝলে মশাই—?

এক একটা চুম্বক-মুহূর্ত জীবনেতিহাসের পাতায় যায় আটকে তার তুচ্ছতা আর ক্ষুদ্রতার ব্যবধান কাটিয়ে। কামড় সাধারণত মরণ কামড়; এর বেলায় কিন্তু সেই মুহূর্তের বাঁচন কামড় ইতিহাসের পিঠে—। মানুষের জীবনে এ'রকম মুহূর্ত খুব বেশি না থাকলেও নেহাৎ কমও নয়। আগেই বলেছি, আমার এমন এক মুহূর্ত প্রথম ক্রিকেট খেলায় প্রথম রাণ—।

ক্রিকেট খেলায় প্রথম 'রাণ করার পর চিরকালের মতো নোঙর করেছিলাম। সেই নোঙর কিন্তু আমায় ছাড়ল না, ছাড়ল না—! আজ সৃষ্টি, মানে কাজ সৃষ্টি করতে গেলেই নোঙর—অর্থাৎ জাহাজ নোঙর করানোই চাকরি—। নোঙর না থাকলে আমারও থাকার প্রয়োজন নেই—। জাহাজ না ভেড়ালে কাকে নিয়ে কাজ হবে? রাউণ্ডে বেরিয়ে এই কথা গুলোর সঙ্গে ছেলে বেলার স্মৃতি, চামচের আলোড়নে চায়ের পেয়ালায় তলিয়ে যাওয়া চিনির ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে ওঠার মতো আমার সমস্ত সত্ত্বা আর অনুভূতিকে মিষ্টি ক'রে দিতে লাগল যেন—। পুরোনো মিষ্টি স্মৃতির পুনরাস্বাদন—।

শ্রান্ত ক্লান্ত অপরাহ্ণ—। কাজে ঢিলেমি। ডকের কী-লাইন ধ'রে হাঁটা—। আগে বাঁ দিকটা অর্থাৎ ছয়, চার আর তু'নম্বরটার তদ্বির করতে হবে—। তারপর ওদিক—আট দশ —বারো নম্বর গুদাম—।

দারুণ গ্রীষ্ম-দুপুরে প'ড়ে থাকা কারুর গায়ের ঘামাচি মারার মতো দু-নম্বরের সাঙ্গোলা, জাহাজের গায়ের রঙ তুলে ফেলা হচ্ছে বাটালি-ছেনি ঠুকে ঠুকে—।

ঠক-ঠক— খট-খট— সুসম তালে আওয়াজ দূরে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরছে যেন—। চারজন লোকের বিভিন্ন তালে ঠোকার এক রকম বিমিশ্র সুর সঙ্গতি—।

পুরোনো রঙ চটিয়ে ফেলা জাহাজ দেখলে লোম কেটে নেয়া-ভেড়ার কথা মনে এসে যায় হঠাৎ, কী জানি কেন।

জাহাজের ওপর থেকে একটা সরু তক্তার দুপাশে দড়ি দিয়ে দোলনার মতো তক্তাটাকে জাহাজের গায়ে ঝুলিয়ে তাতে দাঁড়িয়ে রং চটাতে হবে—হবে লাগাতে। ঐ তক্তারই এক ধারে আবার রঙের টিন ঝুলবে। তাই না হয় নিজের দেহটাকে আর একটা দড়ি দিয়ে বাঁধো—! তাও নয়। কি বিপদজনক—!

রামচাঁদের কথা মনে পড়ে গেলো ছ্যাঁৎ করে। ঐখান থেকে পড়েছিলো সে। চার নম্বরে সে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এই কিছু দিন আগে, আমার প্রবেশন পিরিয়ডে—। তার যৌথ তদন্তের ফাইলটা এখনও বোধ করি বড় অফিস ছোট অফিস ঘোরা ঘুরি ক'রে বেড়ায় further remarks এর জন্যে—।

বেচারা রামচাঁদ—।

মাথায় বাঁশের গুলটু আর পেছনে পালক লাগানো তীরের মতো সোজা মাথা নিচু ক'রে পড়েছিলো সে ডকের পাথর বাধানো কার্ণিসে—। সেখান থেকে বোধ করি তার প্রাণহীন দেহটাই গড়িয়ে এক পাক খেয়ে জাহাজ আর ডকের মাঝ-খানের ফাঁক দিয়ে জলে তলিয়ে গিয়েছিলো একতাল সীসের মতো—। জলের ওপর শুধু রক্তের বুদ্‌বুদ্‌ উঠেছিলো কয়েক মিনিট ধ'রে, সমানে—।

এই জায়গাটা—

ঠিক!

চার নম্বর খিদিরপুর ডকের 'কী'-লাইনে চমকে থমকে দাঁড়ালাম। না, কোনো চিহ্ন নেই! এর ওপর দিয়ে তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কতো শত কাজ হয়ে গিয়েছে রকম বে-রকমের;— কাজের ন্যাতা ধুয়ে-মুছে নতুন ক'রে দিয়েছে জায়গাটা। পুরোণকে মুছে দেয়ার নতুনত্ব। বোঝার উপায় নেই। অথচ এখানটায় চোখ পড়লেই ছ্যাঁৎ করে ওঠে মনের মধ্যে, ভেসে ওঠে রামচাঁদের বীভৎস ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত মুখখানার সঙ্গে ওর সুখ-দুঃখের সাংসারিক ঘটনা আর জীবন সংগ্রামের কথা, দুঃখ-দুর্দ্দশা আর অশান্তির কথা, ভক্তিপ্রণতা ব্রীড়াবনতা প্রেম-মমতাময়ী স্ত্রীর কথা, স্নেহময়ী মায়ের কথা।

ঠিক এমনি এক স্তব্ধ দুপুরে আমাকে শুনিয়ে গিয়েছিল রামচাঁদ। বিমুগ্ধ একনিষ্ঠ শিল্পী শ্রোতা পেয়ে উজাড় ক'রে দিয়ে গিয়েছিল মনের পাত্র, আমার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আধারে—মনের ওপর তলায়।

বাধ্য হ'য়েই দেশ ছেড়েছিল ছে'চল্লিশে

খুলনার লকপুর গ্রাম থেকে কোলকাতা ডকের লকগেটের এলাকা ঠিক সোজা রাস্তা নয়। সহজও নয়। কিন্তু কী করবে রামচাঁদ? ঐ গায়ে-গতরে খেটে বাঁচার তাগিদ। বাঙ্গালী নিম্ন-বিত্তদের টিকে থাকার সংগ্রাম—। তাইতো অরণ্য ছেড়ে নগর, মুক্তি থেকে বন্ধনের জটিল বন্ধনীতে।

বারে বারেই সহরের বিনিময়ে, ইট-কাঠ-লোহার ঝুটা-সভ্যতা বন্ধক দিয়ে অরণ্য চেয়েছে সে। পায় নি। পায় না কেউ। নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়ার গল্পের মতো বাঁচার সংগ্রামে, দাসত্বের নিগড়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে অক্টোপাস বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেল রামচাঁদ।

প্রথম চোদ্দ নম্বর কারখানায় ঠিকে কাজ—। সূর্য-শ্রম; উদয় অস্ত। এ কোথায় এলো সে? এলো কোথায়? কেন এলো? কেন? কেন—?

ধুলো-ভুসো-ধোঁয়া—

দিন-রাত কালো রঙ-লাগানো তুলির মতো কারখানায় চিমনীর মাথায় এক টুকরো কালো ধোঁয়ার তুলি লেগে থাকে। লেগেই আছে! আর সারা দিন সেটা আকাশ-ইজেলে কী এক ভয়াবহ শয়তানি ছবি এঁকে চলেছে অবিরাম- অবিশ্রাম; অসংবদ্ধ, অসম্পূর্ণ।

নিষ্কলঙ্ক আকাশকে পার্থিব সভ্যতার কলঙ্কে কলঙ্কিত করার চেষ্টা? জলে শ্লেটের লেখা মুছে যাওয়ার মতো হাওয়ার কী এক যাদুতে প্রতিক্ষণেই মুছে মুছে যাচ্ছে সেই বিরূপ-বিপুল কালির ছোঁয়াচ। এই চলেছে·

ওদিকে ডকের জলাধারে রাজহাঁসের মত ধীর মন্থর গতিতে তর তর করে জল কেটে-কেটে বিশাল বিশাল জাহাজের যাওয়া আসা। সঙ্গে রাজহাঁসের বাচ্চাদের মতোই সামনে-পেছনে দু'খানা ট্যাগলঞ্চ জাহাজের হাত ধরে, ক্ষিদে পেলে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের তাদের মাকে রান্নাঘরের দিকে টেনে-টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে সদাসর্বদা।

ব্যবসা-বাণিজ্য কাজকর্মের তীব্র জ্বর ক'লকাতার আবহাওয়ায়। এখানের হাওয়ায় নাকি টাকা-ছড়ানো। নিতে জানলেই হ'লো। নিতে জানলেই নেয়া যায় না কিন্তু। রামচাঁদ বুঝেছে হাড়ে-হাড়ে। কী করলে উপার্জন হয় জানে সে, কিন্তু সেইটে করতে পারার সুযোগ, সুবিধে সুপারিশ কিছু নেই তার—কিচ্ছু না। তবু, ধ'রে প'ড়ে থাকার জন্যেই নগণ্য পারিশ্রমিকে কারখানার ঠিকে কাজ নিয়েছে। আশা, শক্ত হাতে ঝাঁটা ধরতে পারলেই তলোয়ার ধরা যাবে এক দিন। মন কিন্তু বাঁধা বাড়ির সঙ্গে।

চিঠিপত্রেরই যোগসূত্র নয় শুধু। আরো কিছু। বনলতা। পূর্ণিমার চাঁদের মতো সিঁদূর টিপ কপালে। লালপাড় মোটা শাড়ী। মিষ্টি-মিষ্টি মুখ, নম্র বিনয়ী বেঁটে-খাঁটো, গাঁট্টা-গোঁট্টা গোলগাল। মা'র পেছু পেছু ঘুরঘুর করছে সব সময়—বেশি সময়ই অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছে পশ্চিম নীল কার্পেটী আকাশের দিকে চেয়ে। কোনখানটা কলকাতা ? কেমন শহর ?—কোথায় —কত দূরে ? —কী করছে সে—?

আর এখানে আর এক আকাশ। যতো দূরে দৃষ্টি দাও মানুষের ভবিষ্যতের মতো ধোঁয়া ধোঁয়া,—আবছা আবছা।

সুদূর দিগন্ত দিয়ে গড়া বিপুল এক নীলাভ বেলুনকে কে যেন ধোঁয়া দিয়ে ওপর দিকে মহাশূন্যে তুলে দিতে চায়। সে যেন অর্থ-সমাজ-রাজনীতি-বণিজ্যিক উচ্চারোহণ,—আভিজাত্য দম্ভ আর উচ্চাশার আকাশাতীত অন্যাকাশ চারণ। বিরাট পাগলামী।—

দুঃখ এই যে, কোলকাতার এই আভিজাত্যের দম্ভ তার সকল আশ্রিতকে নিয়ে নয়। এ যেন বিরাট এক একান্নবর্তী পরিবারে উপার্জনভেদে ভিন্নাচরণের ভাঙনের ইঙ্গিত। শ্রেণী আর বিত্ত-ভেদে মানমর্যাদা, সুখসুবিধের পার্থক্য। সম্পদশালীদের দুঃস্থ আত্মীয়ের মতোই নিম্নমধ্যবিত্তরা, তারও নীচে শ্রমিকশ্রেণী। প্রতিকার প্রতিবিধানহীন অবস্থা।

রামচাঁদ স্থায়ী আর সুবিধের চাকরী পাবে কোথেকে ? তার যে বংশমর্যাদা, শিক্ষা আর সুপারিশের জোর নেই। পেছনে কী রুই কাতলা খুঁটি আছে তার ? তবে ? দেড় টাকা রোজের ঠিকে-কাজ ছাড়া গতি কি ? কতো ক্ষুদ্র আশা ! একটা চলনসই স্থায়ী চাকরি—একশো টাকার মতো। বেশী তো চায় না ! মাকে আর স্ত্রীকে নিয়ে আসবে। একটা ঘর

কেটে দু'খানা করতে জানে সে। তাতেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সন্তুষ্টির সোনা ঝিক-মিক করবে তার মুখে-চোখে। তাও হয় না। এতো ক্ষুদ্র ইচ্ছাপূরণেও পর্বত-বাধা? অবাক পৃথিবী!

তবু সে আয়েসী নয়। জানে শক্ত মুঠিতে হাল ধরতে হয়। যতোই কৃত্রিম জগৎ আর প্লাষ্টিক সমাজ হোক না, অকৃত্রিম একনিষ্ঠতার মূল্য আছে। নিজের দশটা আঙ্গুলের ওপর আস্থা পুরোপুরি। কিন্তু কোথায় বিশ্বাসের মূল্য? মাঝে মাঝে, এলিয়ে-পড়া মুহূর্তে ভাবে সে। সে-ও তো কায়িক পরি-শ্রমের পূজারী। তবে ধাক্কা কেন প্রতি পদে পদে? কেন ধাক্কা?

চোদ্দ নম্বর কারখানার লোহা-গালাই কাজ নাকি তার 'কম্ম' নয়। বড়মিস্ত্রি বিশ্বেশ্বর রবিদাস বিধিমতে ঐ কথাই বোঝাতে চেষ্টা করেছে। হিম্মত নেই বাঙ্গালীর। বিমারে পড়ে যাবে। তার ওপর যদি একটু খুঁত পাওয়া গেল তো রক্ষে নেই, -তিলকে তাল!—ঘর যাও! ইয়ে তুমহারা তাগদসে নেহি হোগা! অন্য কাউকে এমন করে তো বলে না, এমন খুঁতে। ওরা ভাবে এতো দিন ওদের এক চেটিয়া কাজে বাঙ্গালীরা অনেক উন্নত-মস্তিষ্ক নিয়ে ওদের নস্যাৎ করে দিতে এসেছে। তাই ভাবে বোধ হয়, ও গেলে আর এক জন মুল্‌কীকে অনায়াসেই আনা যাবে, ফোরম্যানকে বুঝিয়ে। হয়তো ঠিকই, ওরা ছাড়বে কেন নিজের কোণ? জীবন-সংগ্রামে লড়বার পেশার যে কোণ লাগে প'ড়েছে ওদের, ছাড়বে কেন তা?

অফিসকা কাম দেখো ভাইয়া! পিওন-চাপরাশীকা কাম ঠিক হোগা; মালুম?

দুর্মূল্য উপদেশ।—

ওখানকার শক্ত মাটিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা গেল কই! জোয়ারের আবর্জনার মতো তাকে প্রতি ঘাট থেকে জল ঢেইয়ে ঢেইয়ে হটিয়ে দেয় সকলে আ-ঘাটার দিকে। উপায়?

মরিয়া হয়ে কয়লা-ডকে চাকরি নিল সে। ঠিকে। দু'টাকা চার আনা রোজ। শেষে শুধু অধ্যবসায়ের জোরেই বলতে হবে, হলো স্যুটখালাসী। সব জায়গায় এক কথা। এ বাঙ্গালীর 'কম্ম' নয়। ওদেরি বা দোষ কি? বাঙ্গালীরাই ঐ উপদেশ দিয়ে বসে।

তুমি এ পারবে না।

কেউ আবার ধমক দেয়।

—কুলি-ধাঙড় নাকি তুমি? ভদ্র চেহারা! এ পাপের ভোগ কেন? এ যে জাতের অপমান!

এ-সবের বিরুদ্ধে বুকের রক্ত দিতেও প্রস্তুত রামচাঁদ। জীবিকা নির্বাহে আবার অসম্মান! নিজের জীবিকা সংগ্রহ করতে পারাটাই এক বিরাট সম্মান,—অসৎ উপায় ছাড়া, সে যেমন করেই হোক। সারা দিনের শেষে কয়লা-মাখা অবস্থায় স্নান সারতে সারতে ভাবে সে—কুলি-ধাঙড়! উপদেশ তো খুব। দিক না কেউ ভদ্র কাজ। সে মুরোদ নেই। জাতের ঠুনকো মান-অপমানের নিকুচি করেছে। খেতে না পেয়ে ভিক্ষে করা, শুকিয়ে শুকিয়ে রোগে ধ'রে, জাত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা খুব সম্মানের, না? যতো সব বাকসর্বস্ব অকেজোর দল! না, কোনো কথা নয়, ঐ কাজই করবে সে। স্যুটখালাসী। তাই ভালো।

ওয়াগন থেকে ঢালা কয়লা এক লোহার ফ্রেম-পথে প্রায় জলের ধারে চলে আসে। সেই ফ্রেমটাকেই 'স্যুট' বলে। তার এ দিকের শেষে একটা লোহার ডালা। সেইটের দেখাশোনা করার কাজ। ডালাটা খুলে দিলেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে কয়লা। সেখান থেকে ঝুড়িতে বা ক্রেণে-লাগানো টবে বোঝাই

হয়ে সোজা জাহাজে উঠবে। ডালা খোলা বন্ধ, তার রক্ষণা-বেক্ষণের ভার তার ওপর। কালি-ঝুলি লাগে; বিকেলে চেনা যায় না তাকে। তা হোক।

হোক বললেই আর হয় কই?

এক দিনের ছোট্ট একটা ঘটনায় রামচাঁদের হয়-টা নয় হ'য়ে গেল হঠাৎ। যতো নষ্টের গোড়া ঐ বউ!

চাকরিতে প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে মাকে আর স্ত্রীকে নিয়ে এলো ও ভূ-কৈলাস রোডের বস্তিতে ঘর ঠিক ক'রে।

কী খুশি বউটা! আহা, গ্রামের বাইরে কখনও পা দেয়নি!

রামচাঁদের আসন্ন স্থায়ী সঙ্গ যতো না আনন্দ দিল, তার চেয়ে অনেক অনেক আনন্দ দিল বাইরে বেরুনোয়। চোখ-মুখে চাপতে ব্যর্থ চেষ্টা করা খুশি টস্-টস্ করে উপছে উঠল যেন। রামচাঁদ মাকে ফাঁকি দিয়ে দিয়ে বার বার বউটার আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা দেখতে দেখতে এলো সারা পথ।

কতো প্রশ্ন, কতো কৌতূহল, কী অবাক হ'য়ে যাওয়া। বিব্রত করল রামচাঁদকেই। এমন সব প্রশ্ন করতে লাগল, যার উত্তর রামচাঁদের ভাঁড়ারে নেই। অথচ জানি না ব'লে খাটোও হওয়া যায় না। বউটার যে অগাধ ভক্তি-বিশ্বাস ওর ওপর। আজ-বাজে বুঝিয়ে, এড়িয়ে-মেড়িয়ে রেহাই পেলো কোনক্রমে।

কলকাতা দেখে তাজ্জব।

এখানে থাকবে ওরা? কী সৌভাগ্য! এতো বড় শহরের বাসিন্দা? এ যে ভাবাও যায়নি! আনন্দে, গর্বে, স্বামিসোহাগে ফুলে ফুলে উঠেছিল বনলতা। সে রাতের মত রাত আর আসেনি রামচাঁদের জীবনে। ফুলশয্যার রাতে অপরিচয়ের লজ্জা, আর মেয়েদের স্বাভাবিক অসুবিধে ছিল। আজ আর তা তো নেই? এখন চিনেছে স্বামীকে। নিজের অধিকারের এলাকা

নিয়েছে বুঝে। কতোটা এগোতে পারে জানে। বন্যার মতো আদরে সোহাগে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল রামচাঁদকে। শেষের দিকে বিব্রত, ভীত পরিশ্রান্তই হয়েছিল রামচাঁদ,— অতখানি প্রাণশক্তির কাছে নিজেকে নিঃস্বই মনে হয়েছিল যেন— !

পরের দিন যথারীতি কাজ। কে জানতো সেদিনের রাতে ঐ সমস্ত উবে যাবে? বিকেলে তাড়াতাড়ি কাজ থেকে ফিরে বাসার দরজায় কড়া নেড়ে একটু অপেক্ষা করতে হয়েছিল ওকে।

মা গো ও-ও !—

দরজা খুলেই চীৎকার ক'রে পড়ে গিয়েছিল বনলতা। একেবারে অচৈতন্য।

আরে, আমি—আমি !

আর আমি! ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। রামচাঁদ তো আর ভেবে দেখছে না, তাকে কী রকম দেখতে হয়েছে? কয়লা-মাখা সর্বাঙ্গের ওপর শাদা দাঁতের হাসি আর অস্বাভাবিক মনে হওয়া-শাদা শাদা চোখ। এ রূপ তো বনলতার পরিচিত নয়! নিদারুণ প্রথম আঘাত বনলতার। মৃত্যু হয়নি এই যথেষ্ট।

জলটল দিয়ে জ্ঞান ফিরল বনলতার। ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল রামচাঁদ,—বোঝালো—সাহস দিল। বনলতা শুধু উদাস বিষণ্ণ দৃষ্টিতে জানলার বাইরে চেয়ে থাকলো তো চেয়েই থাকলো।

রাত্রে শুধু জিজ্ঞেস করল—তুমি কী কাজ কর?

সমস্ত বলল রামচাঁদ। একটা টানা নিঃশ্বেস নিল বউ।

এই চাকরি তুমি কেন নিলে গো? ও-কি ভদ্রলোকের কাজ? আমি যে,—আমি যে কতো বড় ক'রে ভেবে বসে আছি। দেশের কতো লোককে বলেছি অফিসের বাবু তুমি! একটু ফুঁপিয়ে উঠল বনলতা।

আরো বড় নিঃশ্বেস নিল রামচাঁদ। এ ব্যাপারে নির্মম বাঙ্গালী সংসার। সহানুভূতি তারিফের বালাই নেই স্ত্রীর কাছেও। শ্রদ্ধা পাবে না শ্রমিক-স্বামী, বরং উপবাস চাইবে স্ত্রী তথাকথিক সম্মান নিয়ে। আশ্চর্য! অফিসের বাবু না হলে জাত হিসেবে বাঙ্গালীর অপমান, ভিখিরী হলেও যা হবে না। অবাক।

অনেক বোঝালো রামচাঁদ। না পেলে কী করবে? তাদের তো আর উপোস করিয়ে রাখতে পারে না। তুনিয়াটা পাল্টে যাচ্ছে। লোক বাড়ছে---বাড়ছে প্রতিযোগিতা। শুধু পাখার তলার কাজ মুষ্টিমেয়ের জন্যে। সেখানেও শিক্ষার প্রতিযোগিতা। সহজ নয়। হাতেকলমে গায়ে-গতরে কাজের তুনিয়া এটা। সাধারণ মিস্ত্রি-জীবনে বাবুজীবনের চেয়ে বেশি উপার্জ্জন; এখন এই নিয়ম। বোঝো!

কী বুঝল বনলতা সেইটাই বোঝা গেল না। শুধু নিঃশ্বেস ফেলল আর কথা একেবারে বন্ধ ক'রে দিল সে। যা বলল তা ঐ বিষয়েই নয়। শেষে রামচাঁদই মত পাল্টালো। বনলতার মুখে মিষ্টি হাসির ফুল ফোটাতে, চোখে আলো জ্বালাতে বুকে বাতাস বওয়াতে, কয়লার কাজ সে ত্যাগ করবে ঠিক করল চূড়ান্তভাবেই।

অনেক ধরা-করা—কাঠখড়—হাত কচলানো। কিছু হয় না। ভাগ্যিস আফিসের সতীশ বাবু ছিলেন। ইউনিয়ন কর্মী। কতো তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি আর আলাপ-সালাপ। সকলেই মান্য করে, ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা উজাড় ক'রে দেয়। আর কতো সাধারণ চালচলন। অত বড় ঘরের ছেলে বোঝে কে? একদিন হুট্ ক'রে বিকেলে এসে ভাঙ্গা পাথরের গেলাসে বনলতার তৈরী চা তারিফ ক'রে খেয়ে গেলেন। কী আনন্দ বনলতার! কেউ তো এমন ক'রে বলেনি এ কথা! রান্নার প্রশংসার মতো আনন্দ

খুব অল্পই পায় মেয়েরা। পাশের ঘর থেকে শুনে ঠোঁটে হাসির প্রলেপ বুলিয়ে চলে এসেছে বনলতা। শাশুড়ির দৃষ্টি এড়ায় নি—।

—হাস কেন বৌমা ?

ঠোঁটের হাসির তুলির ওপর অন্য এক তুলির পোঁছ। লজ্জায় প'ড়ে গেছে সে।

—আজ চা নাকি খুব ভালো হয়েছে !

—হবে না কেন ? যেমন যেমন বলি করলেই হবে। আমি আজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি বলেই না- -

প্রশংসার ভাগীদার,— পুত্রবধূ শাশুড়ির স্বাভাবিক মানসিক দ্বন্দ্ব—শাশ্বত স্নায়ুযুদ্ধ—।

সেই সতীশ বাবুকে সমস্ত নিবেদন করে বসল রামচাঁদ।

—আমার কাজটা পাল্টে দিন বাবু! শেষে কাতর অনুনয়, বউ বড় দিক করছে ! এই আপনি এলেন তাই ভালো চা করল : আমাকে ঐ ব্যাপারের পর থেকে কোনো দিন চা ক'রে দেয়নি।

হা-হা ক'রে হাসলেন সতীশ বাবু।

—এমন কথা ? তাহ'লে তো ব্যবস্থা একটা করতেই হয় ! অন্তত ভাল চায়ের মুখ চেয়েও !

কয়েক দিন মাত্র। করিৎকর্মা লোক সতীশ বাবু। তবু যেন মুখ ভার। কিছু হলো না বোধ হয়। রামচাঁদের জিজ্ঞেস করতে— না, শুনতে ভয়। তবু যতোক্ষণ আশায় আশায় থাকা যায়। খাবার ছুটির শেষের দিকে অফিসের আশে-পাশে সতীশ বাবুর সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করল কয়েক বার ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে।

জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই হতাশ হতে হবে। লটারির ড্রইং-লিস্টে নিজের টিকিটের নম্ ডি প্লুম খোঁজার সময়ের মতো দুরু-দুরু বুক। শেষে সতীশ বাবুই ডাক দিলেন। সেই মুখ বেঁকানো। হয়নি

নিশ্চয়ই তবু জিজ্ঞেস—একেবারে ভেঙ্গে যাওয়ার অবস্থায়।

হয়েছে একটা—তবে পারবে কি? সতীশ বাবুর বেশ বিলম্বিত লয়ের বাক্য।

খুব পারব বাবু! না শুনেই বলে বসল রামচাঁদ।

খুব বিপজ্জনক কাজ—

এর থেকে খারাপ কাজ কি হতে পারে? রামচাঁদ তো খুঁজে পায় না।

কি এমন কাজ বাবু যে এর থেকে বিপজ্জনক? এ যে ঘরে বাইরে বিপদ বাধিয়েছি। আমার পরিবারের মন ভাঙাটা যদি দেখতেন---

জাহাজের রঙ করার একটা কাজ যোগাড় হ'তে পারে। সাহেবকে বলেছি। সে রাজী! চিপিং পেন্টিং দেখেছ তো? জাহাজের গায়ে ঝুলে ঝুলে রঙ চটাতে হবে, আবার লাগাতে হবে, তিন টাকা রোজ। দেখো ঐ সঙ্গে যদি পরিবারের মনের কালো রঙটা চটিয়ে লাল-গোলাপী রঙ ধরাতে পারো। হাসলেন সতীশ বাবু।

খুব পারব। রঙ করা অভ্যেস আছে আমার। উৎসাহ-মুখর হয়ে উঠল রামচাঁদ।

এটা তবু একটু ভদ্র কাজ। বাঙ্গালীয়ানার ছোঁয়াচ লাগানো, মা-স্ত্রীর মনের মত হয়তো নয়। তবু বাঙ্গালীর কাজ। রঙ করা। জাতশিল্পী ওরা। এই কাজের মধ্যে দিয়ে অন্তত কিছুটা না-মেটা খিদের উপশম হবে। উপযুক্ত জাতিগত জীবিকাও। ওর পূর্ব পুরুষেরা প্রতিমা গড়ত, করত অঙ্গরাগ। কী রঙের খেল দেখিয়ে দিত তারা। কতো রঙ-বেরঙের ঠাকুর,—পুতুল। ছেলেবেলা রামচাঁদ তার কাকাকে গ্রামের বারোয়ারী তলায় দুর্গা-প্রতিমা গড়তে দেখেছে। কার্তিকের গোঁফের সূক্ষ্ম

টান দিয়ে তুলি হাতে তন্ময় হয়ে বসে থাকতে দেখেছে কাকাকে। নিজের সৃষ্টিতে নিজে মুগ্ধ। আজ এই 'ক' বছরের মধ্যেই অতি-জ্যামিতিক নিয়মেই যেন দিন চলেছে পাল্টে। লাফ দিয়ে দিয়ে তার পরিবর্তন। নদীর ব'য়ে যাওয়া জলস্রোতের নতুন নতুন তীরভূমি দেখার মত দিন চলেছে এগিয়ে—কী এক সর্বজ্ঞানবিজ্ঞান সমন্বয়ের-সিন্ধুতে মিশতে কে জানে?—

আজ আগের দেবতাদের পাশে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়েছে আর এক দেবতা—যন্ত্রদেবতা। প্রতিদিন উচ্চ থেকে উচ্চতর হচ্ছে তার বিজয়োদ্ধত শির। এ যুগের প্রকৃত ভাত-কাপড়ের দেবতা কল-কারখানা, ইঞ্জিন-জাহাজ। তাই জাহাজে রঙ দিয়ে তেত্রিশ কোটি দেবতার ওপর আর এক বাড়তি দেবতার রঙ করছি মনে ক'রে আত্মপ্রসাদ পাবে রামচাঁদ। কাজ নেবে সে। এ ভালোই হলো, পরোক্ষে জাত-কর্মই পেলে সে।

আমি করব বাবু! আপনি ঠিক ক'রে দেন হুজুর!

সতীশ বাবুর পা ছুঁলো সে আবেগ উত্তেজনায়।

হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন সতীশ বাবু।

কর কি? বলছি তো হবে! সোমবার থেকে লেগে যাবে। চল আমার সঙ্গে।

কাজ ঠিক হয়ে গেল সেই রাত্রেই।

সোমবারে নতুন অফিসে নাম লেখানো সাত সকালে বড় সাহেবের চিঠি নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কাজে। একটা ছোটদলের সঙ্গে কয়েকটা টুকরো-টাকরা যন্ত্রপাতি রঙের টিন, দড়ি, তক্তা, ছেনি, বাটালি জাতীয় জিনিসপত্র নিয়ে যাত্রা হলো শুরু। মন্দ নয় তো! যেন আর এক নতুন অধ্যায়। কারখানার ভূমিকা আর কয়লা-ডকের প্রথম পরিচ্ছেদের পর কর্মজীবন -উপন্যাসের পরবর্তী পরিচ্ছেদ—পরিচ্ছদও।

বেশ উৎসাহ বোধ হলো রামচাঁদের। অনেক-অনেক হালকা কাজ। কী ব্যস্ত ডক। এ জাহাজটা না হয় অপেক্ষমানা! কিন্তু ন' নম্বর থেকে এক নম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক বার্থের জাহাজ বেদম কাজ ক'রে চলেছে মরিয়া হ'য়ে।

ঝন্-ঝন্, কড়্-কড়্, গুড়্-গুড়্—ঢুম-ঢুম। কতো কতো শব্দ! জলশক্তি চালিত ক্রেণ চলেছে হুস্ হুস্ সর সর ঝন ঝন সুরে গান গেয়ে গেয়ে। পাখিরা যেমন তাদের বাচ্ছাদের খাওয়ায় ঠোঁটে ক'রে ব'য়ে আনা খাবার, তেমনি ডকের 'কী-সাইড' থেকে রপ্তানী দ্রব্য মুখে ক'রে তুলে নিয়ে জাহাজের খোলের মধ্যে কতো সন্তর্পণে নামিয়ে দিচ্ছে ক্রেণগুলো শুঁড় নামিয়ে নামিয়ে জিরাফের মতো, সারসের মতো।

জাহাজটা যেন বিরাট এক নীড়। তার মধ্যে অসংখ্য বাচ্ছা পাখি যেন লালাভ মুখ হাঁ করে খাবারের জন্যে কিচ-কিচ করছে আর মা-পাখি-ক্রেণ যুগিয়ে চলেছে তো চলেছেই। তুলে আনা আর যুগিয়ে যাওয়া। সত্যিই। জাহাজের ফলকার ভেতরের কর্মরত পোর্টাররা একটু দেরী হলেই তাড়া লাগায় মালের জন্যে, ব্যঙ্গ করে ক্রেণ ড্রাইভারকে—শো গিয়া ক্যা?

ওপর থেকে দেশলাইয়ের বাক্সর মতো ক্রেণম্যানের চৌকো খুপরি থেকে পালটা জবাব আসে—রাতকো শুতা থোড়াই!

রামচাঁদ অবাক। এই রকম অবাক হয়েছিলো কোল ডকে যন্ত্রে কয়লা বোঝাই দেখে—মেকানাইজড্ বার্থে। আপনি বোঝাই হয় কয়লা—কনভেয়ার বেল্ট না কি যেন বলে তাকে। ঘুরতে ঘুরতে টন টন কয়লা উগরে দেয় জাহাজের মধ্যে; জলপ্রপাতের অবিরাম জল গড়িয়ে পড়ার মতো কয়লা-প্রপাত। যন্ত্রকে কি না করাচ্ছে মানুষ! সার্কাসের পোষা হাতীর মতো হুকুম তামিল করিয়ে নিচ্ছে। রামচাঁদের হঠাৎ

মনে হ'লো জাহাজগুলো যেন এক একটা বকরাক্ষসের মতো জলদৈত্য। এসে দাঁড়িয়েছে। কোলকাতা শহরকে তার ক্ষুধা মতো খাবার যোগাতে হবে নিয়মিত। যতোক্ষণ না উদর পূর্তি হয়, নিস্তার নেই—যোগাতেই হবে।

—তা বাপধনের চোখের রঙ কি জাহাজে ধরবে বাপ?

কানের কাছে বিদ্রূপাত্মক স্নেহের সুরে চমক ভাঙ্গলো রামচাঁদের। অপ্রস্তুত।

এবার কাজ-কর্মে হাত দাও! দেখা তো অনেক হলো।

একটা হাতে-পায়ের নীল-নীল জট পাকানো পাকানো শির বারকরা বুড়ো ওকে হুঁসিয়ারী দিলো—। রামচাঁদ চেয়ে দেখলো ওকে। গলার মাংস ঝোলা, গল-কম্বলের মতো কোঁচকানো, থলথলে। মাথায় ফিরফিরে অস্বাস্থ্যকর রুক্ষচুল। বঙ্কু মিস্ত্রি। ওর নাম শুনেছে এই মাত্র। কথাবার্তায় ওস্তাদ। হ্যাঁ, এই যে আরম্ভ করি। রামচাঁদ ওর চিন্তাভাবনাকে মনের এক পাশে জড়ো ক'রে রাখলো।

—তোমাকে কাজ করতে ব'লে বিরক্ত কি সাধে করলুম ভাই! পেয়াদা করালো। আমার ওপর ভার পড়েছে তোমাকে এক ঘণ্টায় কেলোয়াৎ ক'রে দিতে হবে। না হ'লে সর্দার এসে সর্দারী করবেন। তার ওপর সুপারভাইজার বাবু এলে তো রক্ষে নেই? কাজের যোগাড় যন্ত্র করতে করতে আবার বলল— তোমার মতো রঙীন চোখের চাউনি বুলিয়ে যদি জাহাজে রঙ করা যেতো রে ভাই! তাহলে এই ত্রিশ বছরে হাড়-মাস এক হয়ে যেতো না বোধ হয়।

—আপনি ত্রিশ বছর এই কাজ করছেন বঙ্কুদা?

রামচাঁদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল বঙ্কুকে। যেন এক

ঐতিহাসিক আবিষ্কার পরীক্ষা করছে কাল নির্ণয়ের জন্যে। পঞ্চাশ বছরের কাল-ঝড় সহ্য করা এক বিপর্যাস্ত দেহ-দুর্গ।

তা করতে হয়েছে বৈকি। মনের সমস্ত রসকস্ রঙ ক'রে বুলিয়ে বুলিয়ে দিয়েছি হাজার হাজার জাহাজে। নিজে নিঃস্ব হয়ে গেছি আজ। তবু এইটুকু আনন্দ রে ভাই যে, আমার বুরুশের পোঁছ সারা পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে, সমুদ্রে সমুদ্রে আলো জ্বেলে দিয়েছে। নীল সমুদ্রের ওপর আমার রঙ-করা জাহাজ পদ্মের মতো ফুটে উঠছে। এ'তেই আত্মপ্রসাদ।

রামচাঁদ এক মুহূর্তে বন্ধুর অন্তরটা দেখতে পেলো। লেখা-পড়া জানা লোক। কবি। সুযোগ পেলে মহাভারতের কাশী-রামের মত কবিতা ফলাতে পারতো। বাজে খরচ হয়ে গেল হয়তো।

---নে ভাই নে, জলদি কর! তাড়ার চাবুক লাগালো বন্ধুদা। সকলে তক্তা-দড়িতে দোলনা ঝুলিয়ে ফেললো বেশ কয়েকটা জাহাজের গা বেয়ে। কাজ আরম্ভ হয়ে গেল যেন কি এক অদৃশ্য সুইচের চাপে।

ঠক্ঠক্---ঠকাঠক, ঠকাঠক।

ঝরণার মতো দিন গড়িয়ে পড়ল এক সময় সন্ধ্যের অন্ধকার অন্ধকার খাদে। সারা দিনের কাজ আর তার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরপুর হয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল রামচাঁদ হন হন ক'রে। কাল থেকে আবার খুশি আছে বৌ। চাকরি পাল্টেছে যেন ওর নিজেরই। মানের আর সম্মানের কাজ। সমস্ত রাত আজ ও উজাড় ক'রে তুলে ধরবে মুখের কাছে সুস্বাদু পাণীয়ের মতো---।

রামচাঁদের সারা শরীরের শিহরণের ঢেউ ব'য়ে গেল কাল্পনিক আগাম রাত্রি যাপনে। তবু একাজও কি ঠিক মেনে নিতে

পেরেছে বনলতা? না। যেন আপোষ ক'রে নিয়েছে কোন ক্রমে। মন সায় দেয়নি পুরোপুরি। মন্দের ভালো ভাব।

কী ভীড় রাস্তায়! এই সময়টা আর সকালে এমনিই হয়। ডক-গেট থেকে ট্রামডিপো ছাড়িয়ে বাবুবাজারের সীমা পর্যন্ত অদ্ভুত। অসংখ্য পানের দোকান আর সস্তা নোংরা মুসলমানী হোটেল। রেস্তোঁরাও আছে তেমনি। কী নোংরা! কী নোংরা! রাস্তার ধারে ধারে সব সময়েই কাদা-কাদা। বিকেলের রাস্তা ধোয়া জল আর পানের পিকে বিচিত্র রঙ-বেরঙ। বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, খালি প্যাকেট—ছেঁড়া কাগজ, ছাই, ডাষ্টবিনে নোংরা। আর ভুকৈলাস রোড? কহতব্য নয়—কহতব্য নয়! সস্তা নোংরা খাবারের দোকান; অপরিষ্কার—পচা-ধ্বসা বাড়ি-ঘর, দোকান পাট—মানুষ-জন। দমবন্ধ করা-পরিবেশ।

একটু সুবিধে হ'লে এ পাড়ায় থাকছে কে? ব'য়ে গেছে থাকতে! বৌটা ঠিকই বলেছিলো প্রথম দিন।—মোগো! এর নাম নাকি শহর। কাজ নেই আমার এমন শহরে। এঁদো-পড়া গেরামও ভালো। ঢের ভালো! আর কী রকম ক'রে ঘাড় নেড়েছিলো বউ—যা ওই পারে শুধু। আর হাত। যেটা সব মেয়েরাই একই ভাবে নাড়ে—কোন কিছুকে ধিক্কার দেবার সময়। নিখুঁত। রামচাঁদ ভালো ক'রে লক্ষ্য করেছে যে।

বাসা।

কড়া নেড়ে দাঁড়াতে হয় না রামচাঁদকে। তৈরী আছে বউ—উন্মুখ হ'য়ে। বাড়িতে ঘড়ি না থাকলে কি হয়! আকাশের আলো আর লোক-জনের বাড়ি ফেরা দেখে ঠিক সময় ঠাওর করে। রোয়াকের রোদ দেখে ঠিক ব'লে দেবে কখন দেড়টা বেজেছে, তা ডকের সাইরেন-বাঁশি শুনুক আর না-ই শুনুক।

কড়াক্ ক'রে একটি বার কড়া নাড়ার ওয়াস্তা। বৌয়ের হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পেলো রামচাঁদ। দরজাটা হাট হ'য়ে খুলে গেল শব্দ ক'রে। সে-শব্দকে ছাপিয়ে উঠল আর এক শব্দ, বৌয়ের আবার সেই রকম আর্তনাদ—মাগো-ও-ও! তার পর আরো গুরুতর শব্দ—গুরুভার দেহ-পতনের। বউ আবার অচৈতন্য। দৌড়ে গিয়ে ধরার অবকাশ পেলো না রামচাঁদ। ছোটার গতিবেগ সামলাতে না পেরে মাড়িয়ে ফেললো ওর নরম দেহটাকে।

—কী হ'লো বৌমা? ও মা কী হ'লো! মা ছুটে এলেন।

—কী হ'য়েছে, কিছুই তো বুঝছি না! আবার কেন এমন হ'লো?

মা সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। কী রকম ক'রে চাইলেন যেন। আঁতকে শিউরে উঠলেন।

—এ কী চেহারা করেছ রামু?

সব পরিষ্কার। সেদিন বউ জ্ঞান হারিয়েছিলো ওর কালি-মাখা মুখ দেখে। আজ ওর শ্বেতি-শ্বেতি ছোপ-শাদা রঙ-মাখা মুখ দেখে আরো ভয় পেয়েছে। বুঝতে পারে নি রামচাঁদ। মনেই ছিল না যে সর্বাঙ্গে শাদা রঙে নতুন অঙ্গরাগ হয়েছে ওর। এতো দিন তবু কালো রঙে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলো বউ। আজ এই প্রায়ান্ধকারে হঠাৎ এমন উল্টো রঙে ফলও উল্টোই হ'লো। বিচিত্র অভিজ্ঞতা!

জল-টল দেয়া তদ্বির-তদারকে স্নান-টান মাথায় উঠলো। জ্ঞান ফেরা বউ প্রথম সনিঃশ্বেস হালকা 'মা' শব্দ উচ্চারণ করল একটা টান দিয়ে। জমে-থাকা নিঃশ্বেস বেরিয়ে গেল ঐ শব্দের অনুসরণে।

—তুই আগে স'রে যা বাবা সামনে থেকে—মা সাবধান করলেন। কী সব্বনেশে চাকরি বাবা তোর! জলজ্যান্ত মানুষটা কাটা গাছের মতো আছড়ে পড়ে!

সেদিন রাতেও বৌকে বোঝাতে পারেনি ও। আদর ক'রে কাছে পারেনি টানতে। সেই যে ওপাশ ফিরলো!—আর কী ফোঁপানী!

যে বউ টিনের এক সরু দেয়ালের পাশে ও ঘরে শুয়ে থাকা-শাশুড়ি শুনতে পাবে ব'লে ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বলতেও সংকোচ করতো,—যাকে আদর-টাদরও নিঃশব্দেই করতে হ'তো পাশের ঘরের জন্যে—সেই বউ আজ কেঁদে ককিয়ে উঠলো!—কোনো কথা শুনবে না।

—কেন, কেন? আমার কপালেই এমন কাজ যুটলো ভগবান! ঐ কথাই!—

পরদিন মনটা মেঘ-মেঘ। ইচ্ছে নেই কাজে। শুধু পরিত্রাণের, এ বিদকুটে কাজ থেকে রেহাইয়ের চিন্তা,—সুখের চিন্তা,—বউয়ের মুখে হাসি ফোটাবার সুখ।

এক এক সময় দ্বিতীয় মনে, অবচেতনে, নিজের ক্ষতি জেনেও কোনো কিছু অশুভও একান্ত ভাবে চেয়ে সর্বনাশ ডেকে আনে মানুষ। অশুভ চাওয়া কী এক যোগাযোগে ঠিক মিলে যায়! বাক্‌সিদ্ধের মতো অল্পবিস্তর চিন্তাসিদ্ধ প্রায় প্রত্যেক মানুষই, বিশেষ করে অশুভের বেলায়। রামচাঁদের পরিত্রাণও মিললো। কিন্তু বড়ো বীভৎস, বড় মর্মন্তুদ পরিত্রাণ।

আওয়াজ—আর আওয়াজ!

বিচিত্র-বিমিশ্র-বিভিন্ন। খ্যাঁচ-খ্যাঁচ—ঘ্যাঁস-ঘ্যাঁস শব্দে বিরাট বিরাট টিনের চামচে ক'রে 'ম্যাঙ্গানীজ ওর' তোলা হচ্ছে সামনের জাহাজের জন্যে লোহার টবে। সেই টব ক্রেণের

আঙটায় লাগিয়ে তুলে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে জাহাজের খোলে—একেবারে সেই 'লোয়ার হোল্ডে'। হুড়ুস-শব্দ সেখানে নির্দিষ্ট বিরতির পর। কথাবার্তা।—ক্রেণ চলার হুস্‌-হুস্‌, ঝন-ঝন শব্দ। ডেরিকের গলা ঘড়ঘড়ানি। আর ঝেঁপে আসা বৃষ্টির মতো সমস্তকে ছাপিয়ে আশ-পাশে বান ডাকানো রঙ চটানোর শব্দ—ঠক্‌ ঠক্‌—ঠকা ঠক্‌—ঠক্‌-ঠক্‌—ঘট্‌ ঘট্‌। তাল রেখে রেখে—লয় মেনে শব্দের প্রলয় ঘটানো।

—কী বাপ? মন কয়লা ক'রে এসেছ কেন তাই শুনি! আমার বৌমা কী কথা বলেনি? মুখে গেরণ লাগিয়ে অন্ধকার ক'রে দিয়েছে, না বাপের বাড়ি দেখিয়েছে?

বঙ্কু! এর মধ্যেও রসিকতা হয়। হাসি, মস্করা, আনন্দ। মানুষ সব পারে!

—চুপ ক'রে থাকলে তো চলবে না ভাই! থাকতে দোব কেন? আমার যে কাজের ক্ষতি তাতে। সময় নষ্টও! যতোক্ষণ চুপ ক'রে থাকবে মন বসবে না! তা'ছাড়া আজ সবেমাত্র তোমার স্বাধীন কাজ শুরু। চটপট না করলে যে রিপোর্ট খারাপ যাবে।

রামচাঁদ সমস্ত শরীরের জোর দিয়ে দিয়ে রঙ চটাতে থাকে, নিজে চটে তার চেয়েও বেশি।

কী হয়েছে রামু? আমায়ও বলবে না ভাই?

এবার পরাজয়!—

কী আর হবে বঙ্কুদা', বউ এ কাজ পছন্দ করছে না। কাল রঙমাখা মূর্তি দেখে ভিরমি গেলো। তার পর সারা রাত সে কী কান্না।

ও অমন হয়। আমার বউ করেনি? এ কাজ কোনো মেয়েছেলে পছন্দ করতে পারে? না করাই উচিত। তবে কী

জানো! স'য়ে যায়—স—ব সয়ে যায়! বৌমারও যাবে লেগে থাকো।

বেশিক্ষণ লেগে থাকে নি রামচাঁদ—

খাবার ছুটিতে শুধু একবার আমার ওখানে এসেছিলো সুপারিশের জন্যে। আমি নাকি রাজা লোক আর মাটির মানুষ। আমার কাছেই দুঃখ নিবেদন ক'রে এসেছিলো ঘ্যান-ঘ্যানিয়ে। আশ্বাস দিয়ে ছিলাম—আশাও। সে আশ্বাস পূরণ হওয়ার জন্যে যতোক্ষণ প্রাণ থাকার প্রয়োজন ছিল তা থাকেনি।—

সর্বনাশ ঘটে গেলো অন্যমনস্কতায়—

দুপুরে একটু তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে দিয়েছিলো,—শীগগির শীগগির ফিরতে হবে একেবারে স্নান সেরে। কিন্তু হাতের সঙ্গে তাল রাখেনি মন। অতি শারীরিক উৎসাহে রঙ চটাতে গিয়ে দড়ি থেকে তক্তাটা একপেশে হয়ে ঝুলে গেল হঠাৎ। টাল সামলাতে পারলো না ও। আর বেটাল হওয়া শরীরের সমস্ত বোঝাটায় উল্টে গেল তক্তাখানা। সজোরে ষাট ফুট ওপর থেকে, স্প্রিং বোর্ড থেকে জলে ডাইভ দেবার মতো কয়েক পাক খেয়ে মাথা নিচু করে পড়ল রামচাঁদ পাথর বাঁধানো বার্থে। বার্থ যেখানে শেষ হয়ে খাড়া জলে নেমে গেছে সেই কিনারে ওর মাথাটা লাগল। দোমালা নারকোল ফাটার মতো শব্দ। ফিন্‌কি রক্ত। প্রত্যক্ষদর্শীরা হতভম্ব! ওর শরীরের ভারে কিনারা থেকে আর এক পাক খেয়ে জলে গিয়ে পড়ল জাহাজ আর বার্থের সঙ্কীর্ণ ব্যবধানে। তলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে সীসের মতো। রক্তে লাল হয়ে গেল জল। অজস্র বুদ্‌বুদ্‌ উঠল কিছুক্ষণ—তাজা রক্তের বুদ্‌বুদ্‌! আর কিছু না।—

হৈ-চৈ উঠল। হাঁ-হাঁ করে দৌড়ে এলো লোক-লস্কর।

এ্যাক্সিডেন্ট!!—

আগুন-খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল তড়িৎ গতিতে। দৌড়ে এলো সবাই হাতের কাজ ফেলে। ওদের সুপারভাইজার, ডকের এ, এস, প্রবেশনার আমিও।

জলের তলায় লাস।—স্কিন ডাইভারদের হিমসিম ডুব সাঁতারে হদিশ মিললো লাসের। দেহ উঠল। বনলতার কণ্ঠের মুক্তো—মুক্তপ্রাণ!—

কী দৃশ্য!!!—

রক্ত দগ-দগ করছে, সারা মুখ-চোখে। জমে জমে গেছে। থেঁতলে বীভৎস কদাকার হয়েছে মুখ। জলে ডোবায় আর রক্তপাতে ফ্যাকাসে সিঁটুনো দেহ।

মৃদু আর্তনাদের সুরে জনগুঞ্জন শোনা গেল।

আহা রে!!-

ইস্‌স্‌!!!

—Oh Christ!!!

লেবার সুপারভাইজার অতিকায় উড সায়েবও আঁতকে উঠলেন। আর এই সমস্ত শব্দতরঙ্গকে ছাপিয়ে আকাশ-ফাটানো এক চীৎকার এগিয়ে এলো বামাকণ্ঠের। দু'হাতে পাগলের মতো ভীড় ঠেলে ঠেলে অন্দরমহলের অসূর্যম্পশ্যা বনলতা কান্নায় ভেঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল রামচাঁদের বুকের ওপর। মুখের ওপর মুখ ঘষতে ঘষতে কী যেন বলতে বলতে হাঁ হাঁ করে ডুকরে ডুকরে সমস্ত দেহের দমকে দমকে যন্ত্রণা ছড়িয়ে দিলো আকাশ বাতাসে—জনতার দৃষ্টি আর মনের ওপর। কে যেন খবর দিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। আর লজ্জাবনতা বনলতা—গ্রাম্য বাঙ্গালীর শাশ্বত সংস্কার ছুটে বেরিয়ে এসেছে সমস্ত কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে।—

—এ কি করলে গো-ও-ও-ও?—এ রঙ চাইনি আমি!!!—

এই সেই বনলতা!—
ঘরের চড়ুই, পায়রা, টিকটিকির ড্যাবডেবে চাউনির জন্যে যে দুপুরে রামচাঁদকে কাছে ঘেঁষতে দিতো না!—

ওকে সহজে ছাড়ানো যায়নি মৃতদেহটা থেকে। হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলো সবাই।—পরে ডাক্তারী রিপোর্টে জানা গিয়েছিলো, বনলতার ডানহাতের কনুয়ের হাড় স'রে গিয়েছিলো, জোরে আঁকড়ে থাকা অবস্থায় ছাড়িয়ে আনায়। এতো জোর কোথা থেকে পেয়েছিলো তা ওই জানে না!

এই জায়গাটা।—ঠিক! চার নম্বর খিদিরপুর ডকের কী-লাইনে আর এক চমকে থমক ভাঙ্গলো আমার। না, কোনো চিহ্নই নেই। কতো শত কাজের খ্যাতা ধুয়ে-মুছে নতুন ক'রে দিয়েছে জায়গাটা!—

—কী স্যার, দাঁড়িয়ে আছেন যে?—

চার নম্বরের শেড্‌ফোরম্যান ফণি দত্ত আমাকে প্রশ্ন করছেন শুনে সম্বিত ফিরে পেলাম। অনেক—অনেকক্ষণ জায়গাটার ওপর চোখের সমস্ত আলো ফেলে দেখতে চেয়েছিলাম প্রায় মুছে মুছে যাওয়া রক্তের দাগ, কোনো চিহ্ন কিংবা কিছু একটা—।

—এই জায়গাটায় সেই এক্সিডেন্টটা হয়েছিলো, না?

—হ্যাঁ স্যার!

একটা কেমন নিঃশ্বেস নিলেন ফণিবাবু।

—আচ্ছা সেই রামচাঁদের বউ আর তার মায়ের কি হ'লো জানেন কিছু?

—আগে শুনেছিলাম সাতশো টাকার মতো কম্‌পেনসেশন দিয়ে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়েছে। সতীশের মুখে সেদিন একটা ভালো খবর পেলাম—।

—কী রকম?

—সেই বন্ধুকে মনে আছে ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাকে তো দেখিনা আর ?

--দেখবেন কি ক'রে ? ঐ ব্যাপারটার পর সে হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিলো। ভলাণ্টারী রিটায়ারমেণ্ট। নিজের বাইরের ঘরে একখানা মুদিখানার দোকান করেছে এখন। আর রামচাঁদের স্ত্রীকে নিজের মেয়ে ব'লে গ্রহণ করেছে। ওর মাকে দিদি বলে। বন্ধুর তো স্ত্রী মারা গিয়েছিল অনেক দিন। এখন আবার নতুন করে সংসার পেতেছে ও কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে আর তার শাশুড়িকে নিয়ে — —।

ভালো লাগলো শুনে—। বেশ লাগলো—।

মহাপুরুষরা নাকি তাঁদের ব্যক্তিগত চাকরের চোখে আর যাই হোন মহাপুরুষ নন ? বিরাট মানুষের প্রকৃত পরিচয় জানতে গেলে তাঁর অন্দর মহলে যেতে হবে। কতো সত্যি কথাটা ? কতো মানুষ। কতো রকমের—! আমার কিন্তু শ্রদ্ধা নেই—শ্রদ্ধা নেই—। করুণা। রাগ কোরোনা। থাকবে কি করে শ্রদ্ধা ? এই তোমার চোখে আমি হলাম গিয়ে মহাপুরুষ। আর শ্রদ্ধা থাকে-- ? তেমনি। যাকে বলে বিগ্ শট্। বিরাটত্বটাই বাদ। খুব নাম ডাক। প্রতিভার আকর্ষণে গেছি, মিশেছি। দুদিনেই বিতৃষ্ণা। স্বভাব চরিত্র সাধারণ মানুষের মতোই--। দোষই বেশি, গুণ কোথায় ? কী করে হ'লো বড় ? কেমন ক'রে ? সাধারণ মানুষের স্থূলত্ব যদি ওদেরও থাকবে তাহ'লে বিরাট কেমন ক'রে ? ক্ষমতার উত্তাপ, জাহির প্রবণতা, ঈর্ষা, প্রতিশোধস্পৃহা,—

খোসামোদ প্রিয়তা— সমস্তগুলোই একজনের মধ্যে এটা সেটা ক'রে মেলানো মেশানো সব তথা-কথিত Big shot এ।

ব্রতীন সমাদ্দার এমনি এক বিরাট-ক্ষুদ্র মানুষ- -।

ওঁর কথা মনে এলেই ছায়ার মতো আগে একটা শব্দ মনে আসে—।

—আহাম্মক—।

আর মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসি ভেঙ্গে পড়ে, আছড়ে পড়ে চাপা ঠোঁটের স্লুইস্ গেট্ খুলে, যে কোনো গম্ভীর পরিবেশেও—। সূর্য্যালোকে হীরে-ঝক-ঝক-জলের মতোই ঝিলিক দিয়ে ওঠে দন্ত-পংক্তি—। সত্যিই ঝিলিক দিয়ে ওঠে কিনা তুমিই বলতে পারতে সঠিক—। তোমার মুখেই আমার মুখের আইভরি-টাওয়ারের কথা শোনা আর তাই থেকেই নানা ইমেজ -।

- -একটু হাসোনা।

—হঠাৎ ?

হাসলে আরো সুন্দর দেখায় তোমায়। আর দাঁতগুলো ! ও !!—তোমার আমার এসব কথোপকথন কি ভোলবার ? তবে এমন ক'রে ব'লে সত্যিই কেউ আমাকে হাসায় না এখন। তবে মিথ্যে বলব না, শোনার পর বহুদিন লুকিয়ে চুরিয়ে আর্শির সামনে দেখেছি মিলিয়ে- -।

হ্যাঁ, ঐ আহাম্মকে ফিরে আসি—।

ট্রেনিং এর সময় কয়েকদিন এক ডক ম্যানেজারের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছিলো। তাঁর আবার দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কথা বলা অভ্যেস। খিঁচুলে সুন্দর দেখায় ব'লে তিনি তাঁর 'তিনির' খিঁচুনির অনুরোধ সব সময় রক্ষে করছেন কিনা জানিনা কিন্তু ! ডক ম্যানেজার ব্রতীন সমাদ্দার। পশ্চিমা পিওন খালাসীরা উচ্চারণ-প্রমাদ ক'রে বলে—ডগ ম্যানেজার।

বক্তৃতা আর বক্তৃতা। তাঁর কাজই ঐ—।

একদিন পোর্টশ্রমিক য়ুনিয়নএর এক ডেপুটেশন এলো ওঁর কাছে। আসল কথা কোথায় ভেসে গেলো তৃণখণ্ডের মতো ওঁর বক্তৃতার বন্যায়। য়ুনিয়ন নেতারা সব নাম করা বক্তা। কিন্তু ওঁর কাছে? শিশু, শিশু!

কথা হচ্ছিলো কর্মিদের অভাব অভিযোগ, দুঃখ দুর্দশা, দুর্ম্ল্যতার। চোদ্দ দফা দাবী দাওয়ার আলোচনা—। মহার্ঘ-ভাতা বৃদ্ধির মূল দাবী—। ব্যস্। বিষয় পেয়ে গেলেন সমাদ্দার সায়েব।

—আপনারা য়ুনিয়ন করেন, বেশ করেন। কিন্তু নেতা হ'তে গেলে ইকনমিক্স্ বুঝতে হবে—! ইনফ্লেশন নামক স্বর্ণমৃগটীকে চেনেন কি? চেনেন না বা চান না চিনতে! পড়ুন! বেঁটে মোটা, স্ফীতোদর—বিজ্ঞাপনের আগাগোড়া মোটর-টায়ার পরা মানুষের ছবির মতো চেহারা মিঃ সমাদ্দারের। যতোই তুলুন ওঁর ট্রাউজার, জলের মতো নীচু বিনা উঁচু দিকে কখনো যাবেনা—। সুস্থ শরীরের উত্তাপের পারদের মতো ওঁর ট্রাউজার নরম্যাল অর্থাৎ নাভির নীচে থাকবে সব সময়। ঘন ঘন টেনে তোলা সত্ত্বেও বেঁকে দুমড়ে নরম্যালের নীচে আবার চলে যাবে দু'তিন নিঃশ্বেস-প্রশ্বাসে—। ঝকঝকে তকতকে টাক। ঘাড়ের দিকে যেটুকু ঐ মরুভূমির আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে তিনি ছাড়েননি। চেঁছে ছুলে পরিষ্কার, একাকার করে দিয়েছেন—। কথা বলার সময় নানান অঙ্গভঙ্গিতে হাত-নাড়া অভ্যেস। পরিমাপের কথা বোঝাতে হ'লে দুটো হাতের চেটো গোল ক'রে দেখিয়ে দেবেন, কিংবা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আমাদের প্রায় নজরে-পড়া স্বর ধরা আর ছাড়ার মতো কথায় কথায় সব কিছুর ছবি এঁকে দেয়ার প্রচেষ্টা করবেন প্রতিমুহূর্তেই—হাবে ভাবে—।

—তা, আর কী পড়তে বলেন, বোল্ডিং, স্মিথ, মার্শাল, স্যামুয়েলশন, বেইন, লাস্কি, হিক্স, মিল এবং মার্কস্ প'ড়ে ফেলা গেছে যথারীতি—।

য়ুনিয়ন সেক্রেটারী হেসে হেসে, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে, তীব্র-তীক্ষ্ণ ক'রে ব'লে উঠলেন—।

—পড়লে হবে কি? এতো জ্ঞানের অমৃত-সাগরে আপনারা মার্কস্ এর এক ফোঁটা বিষ ঢেলেই যে সর্বনাশটি ক'রে বসে আছেন! মার্কস্ও যে পুরোন হ'য়ে গেছে তা স্বীকারই করতে চান না!

—তা বেশতো মার্কস্ এর পুরোন ব্যাপার ছেড়ে আরও প্রগতিশীল কিছু করুন না! সেক্রেটারী বললেন।

—এই ধরুন ছাঁটাইয়ের কথা, সমাদ্দার সায়েব মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে বললেন,—মনে করুন আমার বাড়িতে মিস্ত্রির দরকার মেরামতী আর রঙচঙের জন্যে। এখন কাজ শেষ হ'লে তারা যদি বেঁকে বসে ছাড়ানো চলবেনা। এক-বার যখন লাগানো হ'য়েছে তখন কাজ থাক আর না থাক ছাঁটাই চলবে না। তা হ'লে তা কেমন হয়? বাড়ি সারানোর নাম তো কেউ মুখেই আনবেনা তা হ'লে! হয় বাড়ি না সারাও না হয় স্থায়ী মিস্ত্রি রাখো—! চমৎকার! পোর্টের বেলায়ও তাই বাড়তি প্রয়োজনে সাময়িকভাবে যে সমস্ত লোক ভর্তি করা হয় প্রয়োজন ফুরুলে তাদের ছাঁটাই করতে হবে অবশ্যই! নিয়োগের সময় বলেই তো নেয়া হয় চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে ছাঁটাই করা যাবে! —

—আপনার নিয়োগ-থিয়োরী শুনে বেশ কিছু নতুন জ্ঞান লাভ করা গেলো! য়ুনিয়ন প্রেসিডেণ্ট ব'লে উঠলেন—নিয়মটা অফিসারের বেলাই শুধু আপনাদের মনোমত হবে না

অফিসারের জায়গা খালি 'না-থাকা-অবস্থায় অনেক বাড়তিকে খাওয়ানোর জায়গার অভাবের সময়ও আবার কেন নতুন ভর্তি হয়, প্রয়োজন হ'লে অপ্রয়োজনীয় পদের সৃষ্টি ক'রে? কই ওদের ছাঁটাই তো শুনিনি কখনো? এতো মাথাভারি শাসন ব্যবস্থা কেন হবে যখন নীচের দিকে shortage of staff? overtime দিয়ে, কাজের পরেও duty-employed রেখে লোককে অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়ে হাড় মাস কালি ক'রে দেবার এ নীতিটি বর্জিত হয় না কেন শুনি? মুখ লাল হ'য়ে ওঠে প্রেসিডেণ্টের!

—দেখুন ঐ over time আর duty-employed রাখা ওটা নেহাতই সাময়িক প্রয়োজন মেটানোর জন্যে। এর জন্যে লোক বাড়ানো চিন্তারই বাইরে—। আর efficiency'র জন্যে প্রয়োজন আছে টপ্-হেভী শাসন ব্যবস্থার।

এরপর এলো দ্বিতীয় দফা; বেতন, মহার্ঘ-ভাতা বৃদ্ধির কথা। এখানেও সেই বক্তৃতা। ইনফ্লেশন। তাছাড়া পোর্টের শ্রমিক কর্মচারীরা well off: well paid! কেরানীদের চাল চলন, পোশাক পরিচ্ছদ দেখলে মনে করার কিছু মাত্র কারণ নেই যে তাদের অভাব আছে। মিঃ সমাদ্দার সবজান্তার মতো আত্মবিশ্বাসের ঘাড় নাড়লেন।

—ক্রেডিট্ সোসাইটিতে ওদের দেনার অঙ্কটা দেখেছেন? সেক্রেটারী বললেন এবার—।

—হ্যাঁ, দেখেছি, দেনা ক'রে যারা পোশাক পরিচ্ছদ করে তারা সহানুভূতির অযোগ্য—। ব্রতীন সমাদ্দারের অমোঘ যুক্তির বজ্রনির্ঘোষ—।

—আপনার মতো জ্ঞানপাপী অবুঝ তো দেখিনি। জানেন সব অথচ ভাণ করেন। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীকে মান রক্ষে করতে

হয় তাদের লোক লৌকিকতা ক'রে, তাকি জানেন না? তাদের demonstrative expenditure আপনার চেয়ে বিশেষ কম নয়—!

—একটু পরিশ্রমী হ'লে অনেক খরচ কমানো যায় বুঝেছেন। আমরা তো তা করব না! গতর নড়াবো না। জাত আয়েসী আর অলস আমরা—। এই তো সেদিন বজ-বজ গেছলাম। দেখি পটল চার আনা সের বিক্রি হচ্ছে। আমাদের বাবুরা একটু খেটে গিয়ে নিয়ে আসবেন ভেবেছেন? তাঁরা খবরই রাখবেন না! তাঁরা লেক্-মার্কেট্ থেকে আট আনা সেরের পটল কিনবেন। একটু ঘোরাঘুরি করলেই—

কথা শেষ হ'তে পারল না। দিগ্বিদিকজ্ঞান হারিয়ে ভগড়ীর মতো জ্বলন্ত কথায় উপচে উঠলেন প্রেসিডেন্টমশাই।

আপনার মতো আহাম্মক অফিসার আমি জীবনে দেখিনি। বজবজ থেকে আধসের একসের পটলের জন্যে দেড়টাকা গাড়িভাড়া খরচ যাক, তবুতো পটল সস্তা পাওয়া গেল! চমৎকার—। আপনার বুইক গাড়ি; আধমণ পটল নেবার সামর্থ্য আর প্রয়োজনও আছে হয়তো! কিন্তু প্রতিদিন, হিসেব ক'রে দেড়টাকা বাজার করার হাজার লোক যে থাকতে পারে তা হয়তো হুজুরে-আজমের জানাই নেই—! এ যেন সেই গরীবদের রুটির অভাব হ'লে কেক্ খাবার উপদেশ—। বজবজ থেকে পটল? তার থেকে বলুন না কেন শান্তিপুরের গঙ্গার ধারের ক্ষেত থেকে পটল তুলে নিয়ে এলে দামই লাগবে না! আহাম্মক কোথাকার—।

মিঃ সমাদ্দারের শরীরের সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমা হ'লো বেশ বুঝতে পারলাম। একজনের রাগে, অন্যের অপমানে—রক্তারক্তি—।

আমি না রাম না গঙ্গা—। চুপচাপ—।

বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার কথা শুনেছি—। হজম শক্তিরও—। মিঃ সমাদ্দারের হজম শক্তির ব্যাপকতা বিস্ময়কর। কী এক আয়ুর্বেদোক্ত উপায়ে জানিনা হাসতে হাসতে, কোনো দুঃসহতম অপমানও হজম করার অলৌকিক শক্তি তাঁর—।

তাই ব'লে নারায়ণ নন্ যে ভৃগুপদচিহ্ন এঁকে নেবেন বুকে,-হাসি মুখে—। ভালোই জানি হাসতে হাসতে ছুরিও চালাবেন তিনি। প্রতিশোধ নিচ্ছেন বুঝতে দেবেন না প্রতিপক্ষকে। বুঝলেও অসহায় ক'রে ছাড়বেন তাকে। দু'পক্ষই সজ্ঞানে দুপক্ষের শত্রুতা করবেন মুখে কিছু না ব'লে—। মৌখিক সৌজন্য আর বিনয়াবনত ভাবের তিলমাত্র অভাব তাঁর অতি বড় শত্রুও দেখতে পাবে না। অদ্ভুত—। হাসতে হাসতে অতি মিষ্টি কথায় হয়তো তিনি এমন লোককে তুষ্ট করবেন যার চাকরি বরখাস্তের কাগজ এখুনি সই করেছেন, করছেন বা করবেন—। বিজয় বর্মনের কথা শুনেছিলাম ষ্টেনোগ্রাফার সন্তোষ ভট্টাচার্যের মুখে—।

ভদ্রলোকের বিশ বছরের পাকা চাকরি। হঠাৎ সমাদ্দার সায়েবের কুনজরে প'ড়ে গেলেন তুচ্ছকারণে । আঠারো ঘা। একটা ড্রাফ্ট্'এর জায়গায়-জায়গায় হাতের লেখা বুঝতে পারেন নি তিনি। সমাদ্দার সায়েবকে জানিয়ে বিরক্ত না ক'রে অন্য অফিসারদের দেখিয়ে, ওঁর অজান্তে সেরে ফেলবেন মনে ক'রেছিলেন। সদভিপ্রায়। অফিসাররা কিন্তু দু-একদিন দেরী ক'রেও সেই দুর্বোধ্য হস্তাক্ষর থেকে সঠিক কিছুর পঙ্কোদ্ধার করতে পারেন নি। শেষে তাই আবার খোদ কর্তার কাছেই যেতে হয়েছিলো, খুব বিনয়ের সঙ্গেই বলেছিলেন তিনি- এই জায়গায় লেখাটা স্যার বুঝতে পাচ্ছিনা!

তাতেই আঁতে ঘা :—অপমান—। হাতের লেখার প্রতি কটাক্ষ ? অগ্নিশর্ম্মা তো ছেলে মানুষ তার চোদ্দপুরুষের মূর্তি ধারণ করলেন তিনি একাধারে।

But why so delay ? why after three days ? এতোদিন কচ্ছিলেন কি ?

হারমোনিয়মের পর্দার মতো চ'ড়ে চলল তার আক্রমনাত্মক প্রশ্ন-বাণের তীব্রতা—।

সবেরই সীমা আছে। ভালো হিসেবী মানুষও দারুণ মন্দ বেহিসেবী কাজ ক'রে ফেলে মাঝে মাঝে। এর জন্য দায়ী পারিপার্শ্বিক মুহূর্ত বোধহয়—। বিজয়বাবু তাঁর বিচার বুদ্ধি হারালেন অসহ্য অপমান বোধে—। বিশ্বস্ত প্রচেষ্টার বিপরীত পুরস্কারে হারালেন তাঁর ধৈর্য। বিশ বছরের মায়ায় মায়ায় জিইয়ে রাখা চাকরীর সর্বনাশ ডেকে আনলেন।

—চেষ্টা তো করতে হবে পড়তে। যা আপনার হাতের লেখা। কোন ভদ্রলোক পড়তে পারেনা ! ব'লে ফেলেই বুঝলেন, সর্বনাশ ক'রেছেন—।

কিন্তু তখন উপায় ? একদিকে আত্মসম্মান আর অন্যদিকে যাকে বলেছেন তাঁর কাছে আত্মসম্মান ঘুচিয়ে ক্ষমা চাইলেও সুরাহা হবার নয়। সাক্ষাত যম। তখন কিছু বললেন না মিঃ সমাদ্দার।

—ঠিক আছে আপনাকে করতে হবে না। বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামে চাপ দিলেন শুধু।

—চিত্তবাবুকো বোলাও—!

সেলাম ঠোকা বেয়াররকে নির্দেশ দিলেন শুধু—।

বিজয় বাবু যেন নিজে চুপসে বেরিয়ে এলেন মনে মনে হায় হায় করতে করতে।

পরদিন সকালেই সমাদ্দার সায়েবের খাস কামরায় ডাক পড়ল ওঁর। —কাল বিকেলে কোথায় ছিলেন? কণ্ঠস্বরে দূর-মেঘগর্জনের গাম্ভীর্য। বুদ্ধিমান বিজয়বাবুর বুঝতে বাকী থাকলো না যে তাঁর বিরুদ্ধে অ-ঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই—। সমস্ত পরিকল্পনা শেষ। ছলে, বলে, কৌশলে তাঁর নিপাত অবশ্যম্ভাবী।

—কেন স্যার, কাল পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে ছিলুম তো!

—আজ থেকে সকালে আর বিকেলে যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করবেন—!

—যে আজ্ঞে স্যার—!

বিজয়বাবুর শুধু তাঁর স্ত্রীর মুখখানা মনে পড়ল বার বার। কিছু জানে না বেচারী—। শুধু প্রশ্ন করেছে—কেন তুমি অত ভাবছ? উদ্বিগ্ন হয়েছো? অফিসে ঝামেলা থাকেই। তাই ব'লে অত মুসড়ে পড়ার মতো কি হ'তে পারে—? কিছু না,—কিছু জানে না সে। কয়েকদিন পর থেকেই ডাক্তারী সার্টিফিকেট দাখিল ক'রে অনুপস্থিত হ'তে আরম্ভ ক'রেছিলেন। কিন্তু সমাদ্দার সায়েবের লম্বা হাতের আওতার বাইরে যেতে পারেন নি তিনি।

মাস দুয়েক পরে কমিশনারস্ এর চিফ্ মেডিকেল অফিসারের কাছে ফিট্ সার্টিফিকেট নিতে গিয়ে অকৃতকার্য হ'লেন—। ওঁকে—কার কল-কাটি নাড়ায় সকলেই জানে—আরো দু'মাস unfit ঘোষণা করা হ'লো। এই ভাবে কিছুদিন চলার পর আরো অপমানের হাত এড়াতে চাকরিতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হ'লেন বিজয়বাবু। য়ুনিয়ন প্রেসিডেণ্টের সমস্ত দাবী-দাওয়ার কিছু অংশ প্রায় আদায়ের মুখে এসেও সমাদ্দার সায়েবের সুচতুর হস্তক্ষেপে বানচাল হ'য়ে গিয়েছিলো জানি।

ছাঁটাইও হ'লো, সুযোগ সুবিধে তো প্রত্যাখ্যাত হ'লোই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্তমান সুযোগ সুবিধের সংকোচন হ'য়েছিলো ব'লেও শুনেছি—। —

এ হেন, তথাকথিত মহামানব যেদিন আমার ওপর নেক-নজর দিলেন সেটা প্রকৃত আমার neck'এর ওপর নজর কিনা সে বিষয়ে যতোই কেন সোজা ভালো মানুষ হই—সন্দেহাকুল হ'তে হলো কিন্তু—! কারোর ভালো করেন নি তিনি। কারোর না—।

অফিসের বেয়ারাদের বাড়ির ফুল বাগানে আর বাজার সরকারীতে নিয়োগ করেন। নিজের কাজে গাড়িতে ক'রে নিয়ে গিয়ে কাজ মিটলে এমন এক জাগায় নামিয়ে ছুটি দেবেন, ট্রাম বাস ভাড়া বাবদ একটি কপর্দকও না দিয়ে, যে যেখান থেকে হেঁটে তার বাড়ি পৌছতে লাগে দেড় ঘণ্টা।

এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে—।

যুদ্ধের সময় বেয়ারারদের কার্ডে চিনি ড্র করিয়েছেন নিজের জন্যে ওদেরই পয়সায়। পরে পয়সা দেবার কথা থাকলেও ক্ষুদ্র তুচ্ছ জিনিস মনে রাখার প্রয়োজন মনে না হওয়ায় বেচারারা সামান্য ছ'আনা, আট আনা ফেরত পাওয়া থেকেও বঞ্চিত হয়েছে বার বার। এই ভাবে আনায় আনায় টাকা হ'য়েছে আর টাকায় টাকায়—কোথায় গেছে তার খেয়াল উনি কোনো দিনই করেন নি। বড়দের ভুলটা শুধুই ভুল, ক্ষুদ্র ব্যাপার মনে না থাকটাই যে স্বাভাবিক ওঁদের। কতো বৃহৎ চিন্তা ওঁদের সমুদ্র-সফেন মস্তিষ্কের। সেখানে তুচ্ছ আনা পাইয়ের স্থান আশা করাটাই অপরাধ। অপরাধই তো! না?

কোথায় যেন দেখা, শনি গ্রহের হাসি হাসি মুখের ছবিটা আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল ওঁকে দেখেই :—প্রথম প্রকাশ তব হেরি মম গগনে—।

জাহাজ বার্থ, করাচ্ছিলাম বার নম্বর বার্থে। এস্, এস্, হুগ সিলভারমুন, আমদানী জাহাজ—। প্রায় পাঁচ হাজার টন, যন্ত্রপাতি, ঔষধ পত্র, প্রসাধন দ্রব্য উগরে দিতে এসেছে কোলকাতায়।

কৃত্রিম জলাধার খিদিরপুর ডক্—। জগতের যতো অসুবিধেজনক বন্দর আছে এ তার অন্যতম। পাঁচহাজারীর চেয়ে বড় জাহাজ গলে না। গঙ্গায় পলি পড়ছে সর্বদা। অগভীর হচ্ছে গঙ্গা—। প্রতিদিন পলি কেটে তোলার জন্যে তিনটে ড্রেজার অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে চলে চব্বিশ ঘণ্টা। দিন তিন হাজার টাকার মতো খরচ পলি তোলায়। পলি সহজে জলের সঙ্গে মিশে যায় না বলেই আরো অসুবিধে। দীর্ঘ প্রসারী পরিকল্পনাই নাকি অসাধ্য সাধন করতে পারে। গঙ্গার হেড্-ওয়াটার অব্যাহত অক্ষয় রাখার জন্যে চাই ফরাক্কা পরিকল্পনা; সহজে জাহাজ আসার জন্যে চাই ম্যাঞ্চেষ্টার ক্যানালের অনুকরণে ডায়মণ্ডহারবার ক্যানেল। সে অনেক, —অনেক দূর—।

আপাতত দেশ সর্বদা প্রস্তুত থাকুক চড়ায় আটকানো জাহাজের এস্, ও, এস্ এর জন্যে। বুঝুক জাহাজ, কোলকাতায় প্রবেশাধিকার সহজ নয়। জোয়ারের ছাড়পত্র চাই প্রতিবারেই —। সময় নষ্ট! আমদানী রপ্তানী দ্রব্যের পড়তার হের ফের, মুল্যের তারতম্য? তাতে কি?

ডায়মণ্ডহারবারের স্যাণ্ড-হেড্ পর্যন্ত জাহাজ স্বাধীন ভাবে ভেসে আসতে পারবে নির্বিবাদে।

যেই স্যাণ্ড্-হেডের বাঘে ছুঁলো—! অমনি আঠারো ঘা। হাজার রকমের চার্জ দাও! ছুটো পাইলট্ অর্থ্যাৎ Tug Launch, জাহাজদের, শিশুকে হতে ধ'রে নিয়ে আসার মতো পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে সেই বার্থ্ পর্যন্ত—। তার চার্জ এবং চার্জ আর চার্জ। বার্থিংএর, ক্রেণ, ডেরিক আলোর চার্জ, River due; এটা সেটা।

জাহাজের এজেন্ট ব্যতিব্যস্ত—। এতো ক'রে জাহাজ ভর্তি লোক পুষেও থাকে লাভ, জলের ওপর কোটি কোটি টাকার জাহাজ আর পণ্যদ্রব্য ভাসিয়ে দিয়েও। ধন্য বাণিজ্য! খিদিরপুর ডকে আবার আরো হাঙ্গামা, লক্ গেটের ডালা খুলে গঙ্গা থেকে জলাধার ডকে জাহাজ প্রবেশ করাতে হবে, একটা বা ছুটো সুইং ব্রিজের সংকীর্ণ হার্ডল্ পেরিয়ে। বিরাট এক obstacle, endurance race !

পশ্চিম-ডকে বার্থের সীমা অতি পরিমিত, প্যাঁচালো আর জটিল। খুব হিসেব ক'রে জাহাজ ভেড়াতে হয়; নির্ভুল, নিখুঁত হিসেব—। এক জাহাজ বার্থ করার পর অন্য জাহাজ নেবার সময় স্থানাভাবে আগে নেয়া জাহাজকে নড়িয়ে, এগিয়ে পেছিয়ে জায়গা ক'রে নেয়াটা অকর্মন্যতার পরিচায়ক, অতএব সাধু সাবধান!

বারো নম্বরে জাহাজ নেয়া আরো অসুবিধেজনক। আমাদের সহকর্মী মিঃ তপেন দত্তর তৈরী তথাকথিত ডোকো ইংরিজিতে—danger father অর্থ্যাৎ বিপদজনক। জনকের অর্থ পিতা করা হ'য়েছে বলাই বাহুল্য—।

বাঁকা-শিঙ-চাঁদের মতো বার্থের চেহারা, তাই 'space' এর হিসেবে সম্ভাব্য গণ্ডগোল প্রায়ই সত্যে পরিণত হ'য়ে অসম্ভাব্য অপমানকর পরিস্থিতি উদ্ভূত ক .র ছাড়ে

জাহাজের দৈর্ঘ্যের হিসেব চুল-চেরা ক'রে নিতে হয় দুদিকে আট ফুট জায়গা খালি রেখে—। এ জাহাজ খানার ওভার-অল-লেন্‌থ্‌ আবার চারশো চল্লিশ ফুট, কাজেই হুঁসিয়ার! দশ নম্বরের দিক থেকে কোন পর্যন্ত জাহাজ নেয়া যাবে ঠিক ক'রে বার্থের ওপর খড়ি দাগাঙ্কিত করা হ'লো যথারীতি। ক্যাপ্টেনরা আবার অনেক সময় গণ্ডগোল বাধায়; কথা বোঝেনা। বার্থিং মাষ্টার আমাদের লোক তাই রক্ষে।

—কতো ফুট এগোবে জাহাজ?

চোঙা মুখে বার্থিং-মাষ্টার চীৎকার ক'রে উঠলেন—। বিশ ফুট জায়গা তখনো খালি। বললাম দশ ফুট! জানি দশ ফিটে থামলেও নিজের ভারে জাহাজ আরো খানিকটা এগিয়ে যাবেই, কিছু হাতে রাখা। ইতিমধ্যে বার্থিং সেকসনের ডিঙি জাহাজের দু'দিক থেকে দুটো কাছি চেয়ে নিয়ে বার্থের বলার্ডে লাগিয়ে দিয়েছে।

ঠিক তাই হ'লো— পনর ফিটে গিয়ে অনড় হ'লো জাহাজ, তখনো পাঁচ ফিট খালি— বাস ওপরের ক্যাপ্‌স্‌টান ঘুরল, বলার্ডে মুরি-লাইন বাধা টান টান ক'রে, জাহাজ বন্দী—।

স্বস্তির নিঃশ্বেস—।

—Safely berthed?

পেছন থেকে প্রশ্ন-আশ্চর্য মেশানো কথাটা শুনেই উচ্চ-গ্রামে বাঁধা জিব দিয়ে স্বতই বেরিয়ে এলো—and a birth of a success too! পরমুহূর্তেই মনে হ'লো—খুব যেন চেনা চেনা বাঁকা বাঁকা ইংরিজি। চমকে পেছনে তাকিয়েই যন্ত্রের মতো হাতটা কপালে এসে ঠেকলো,—

—Good afternoon sir!

মিঃ সমাদ্দার স্বয়ং। হাসি হাসি মুখ। কোথায় যেন দেখা শনিগ্রহের মুখের মতো—। এ হাসির 'প্রথম প্রকাশ হেরি মম গগনে'—।

বারো নম্বর এক্সটেনসনের পাশে তাঁর বিশাল কালো বুইকখানা নিঃশব্দে দাঁড় করিয়ে আরো নিঃশব্দে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পাইনি—। এইতো কিছুক্ষণ পূর্বে লিউইস সায়েবকে না পেয়ে আমাকেই সরাসরি টেলিফোনে মুভমেণ্ট দিয়েছিলেন— s|s Hoegh Silvermoon from Main Dock buoy to 12 K. P. D. at 1700 hrs on date— .

প্রতি নমস্কার ছলে একটু ঘাড় বেঁকিয়ে বললেন—লিউইসকে পেলাম না। ভাবলাম একেবারে নতুন আপনি, তায় বারো নম্বরে বার্থিং। নিজেই চ'লে এলাম, তুর্ভাবনা। নাঃ আপনি ঠিক বার্থ করিয়েছেন! মনে মনে বললাম একটু আগে, অর্থ্যাৎ বার্থ করাবার আগে এলে হ'তো না স্যার!

বললাম কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা—

—Th3nk you sir!

—ক্রেণ প্লেস ক'রে নিন এবার! সব ব্যবস্থা করা আছে তো?

—পাঁচজন ক্রেণ ড্রাইভার বুক করেছি পি, সি একাউণ্টে। আর তুটো গ্যাংকেও রেখেছি ওভার টাইম্!

—That's right!

তাঁর পেছনে পেছনে গাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে। এগোতে লাগলাম পায়ে পায়ে—।

—Theatre Akademy তো আপনাদের না? হঠাৎ একি প্রশ্ন? সৃষ্টি ছাড়া—কাজ কর্ম, পোর্ট জগতের বাইরের কথা যে!

—হ্যাঁ স্যার, আপনি জানলেন কি ক'রে ?

—গত রবিবার New Empire-এ আপনাদের show দেখতে গিয়েছিলাম যে! এর আগেও Shakespeare festival-এও গিয়েছিলাম এক বন্ধুর সঙ্গে—। আপনার হ্যামলেট্ দেখে অবাক হ'য়েছি! গুণী লোক আপনি। আর পরশুও 'সোনালী দিন-এ আপনি উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেছেন। আমার সর্বাঙ্গে, কূপে কূপে রোমাঞ্চ, মুখে বিনয় হাস্য।

—আমার মেয়েকে চেনেন ? স্বপ্না সমাদ্দার গতবার যে I. A, তে ফার্ষ্ট হ'য়েছে ? অভিনয়, গান আর অঙ্কন শিল্পেও প্রথম শ্রেণীর—।

—হ্যাঁ স্যার অভিনয় দেখেছি তাঁর। বোধ হয় শান্তি-নিকেতনে আপনার সঙ্গে দেখেছি পৌষ-উৎসবে—।

—ঠিক ঠিক! তাই ভাবতাম আপনাকে এতো চেনা চেনা লাগতো কেন ? কোথায় দেখেছি—। আপনি শান্তিনিকেতনে যান নিয়মিত—?

—হ্যাঁ স্যার! ছেলেবেলায় কিছুদিন পড়েছিলাম ওখানে। তার ওপর কাকা ওখানকার অধ্যাপক। ওখানে টেনে নিয়ে যায় আমাকে।

—কী নাম আপনার কাকার ?

নাম বলতেই চিনতে পারলেন—তাই বলুন, খুব চিনি!

কথা বলতে বলতে গাড়ির সামনে এসে পড়েছিলাম আগেই। উঠতে আর চান না গাড়িতে। ওঠেন কি ক'রে, আসল কথাই যে হয়নি।

—আপনাদের একাডেমিটা বেশ অভিজাত। আর সুনামী-সুপ্রতিষ্ঠিতও। তাই ভাবছিলাম—সমুকে যদি ওখানে পাঠাই—। তাহ'লে জাহাজ বার্থ্ করা, নতুন লোক সমস্তই ধোঁয়া ?

আসলে—। বললাম,—খুব, খুব স্যার! আনন্দের সঙ্গে নেয়া হবে। আমি সম্পাদক হিসেবে যতোটুকু করা সম্ভব, করবো—। অমন যাঁর প্রতিভা তাঁর সম্বন্ধে যে প্রশ্ন ওঠে তা হচ্ছে কবে আসছেন উনি?

—কারণ,—নিজের চিন্তাতেই যেন বিভোর, আমার কথা শুনতেই পাননি ভাব,—নাচটা ওর ঠিক হয়নি এখনো। আপনাদের বন্ধু নৃত্যশিল্পী প্রদ্যোৎনারায়ণকে যদি একটু স্পেশ্যাল কেয়ার নিতে বলেন—

—স্পেশ্যাল মানে? এক্সট্রা স্পেশ্যাল! মনে মনে বললাম।

—আসলে বললাম অন্য কথা।

—সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেব স্যার! শনিবার সন্ধ্যায় ওঁকে নিয়ে—না না, আমিই যাচ্ছি আপনার বাড়ি, প্রদ্যোৎনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে—।

তাহ'লে তো খুবই ভালো হয়!—well we will wait for you at the tea table—!

গাড়িতে উঠলেন—।

স্পেশ্যাল ডিলুক্স্ বুইক্ না বুঝতে দিয়ে ছেড়ে দিলো নিঃশব্দে—।

কালো হাঁস পাখা মেলে দিলো যেন—। হাওয়া খেয়ে আর কেটে কেটে এগিয়ে চলল গাড়িখানা চোরের মতো, শব্দ না তুলে, পা টিপে টিপে, অনায়াসে-অবলীলাক্রমে—। এ শহরে হাঁস পাখা মেলে, সাঁই সাঁই শব্দ তার শোনা যায় না কিন্তু—।

তবুও মরতে হবে এও সত্য জানি—

বইক্-হাঁসের সাঁই সাঁই পাখার শব্দ না শুনলেও, স্বপ্না সমাদ্দারের ময়ূর-পেখম ছাপা শাড়ির কড়া ইস্ত্রির আঁচলের পাখা মেলে দেয়ার খস্ খস্ শব্দ শুনে যে অনুরাগাশ্রিত কোনো অনুভূতি জাগেনি, আর সেই অনুভূতির কথা অতি সযত্নে তোমার মনোপীড়ন বোধে তোমার কাছে গোপন রাখার চেষ্টায়, এই আখ্যায়িকাটাই বাদ দেয়ার পরিকল্পনা করিনি, এমন হলফ করতে পাচ্ছি কই? সত্যিই ঠিক করেছিলাম, বলবনা সে কথা।

—কেন?

তোমাদের জানিনা? নির্লিপ্ত নিরাসক্ত হ'য়েও, অন্য কোন মেয়ের সৌন্দর্যানুরাগী হ'য়ে বিশদ বর্ণনা দিলে রক্ষে আছে! মরতে হবে তোমার বিরূপতার ফাঁসির হুকুমে—। কিছুতেই সে ভাব আনতে পারবো না, যা নাকি আমার appreciation-টাই দেখাতে পারে শুধু—।

তাই বলছিলাম—যতোই কেন চেষ্টা করিনা দূর থেকে নিরাসক্ত নির্লিপ্ত হ'য়ে স্বপ্না আখ্যায়িকার সত্য বর্ণনা ক'রে বাঁচতে—

—তবুও মরতে হবে এও সত্য জানি—।

সমাদ্দার সায়েবের আলিপুরের বর্ধমান রোডের সুন্দর বাড়িটার অধিকাংশটাই বাড়ি নয়, বাগান—। বাড়ি কোথায়? উত্তাল হ'য়ে ওঠা বাগানের সমুদ্রের মধ্যে থেকে বাড়ির দ্বীপটি আবিষ্কার করতে হয় অনেক সাঁতরে—।

নৃত্যশিল্পী প্রদ্যোৎনারায়ণকে নিয়ে শনিবার সন্ধ্যেয় আমাদের ঐ দ্বীপ খুঁজে নিতে হ'লো ডুবে-যাওয়া জাহাজের ভাসা নাবিকের মতো—।

—চমৎকার

—চমৎকার

বাড়িটা সম্বন্ধে আমাদের সমবেত আশ্চর্যধ্বনি একটুও বাড়াবাড়ি নয়—। বাগানের মধ্যেই বাড়ি নয় শুধু, বাড়ির মধ্যেও বাগান আবার। বারান্দায়, ঘরের কোণে কোণে, দেয়ালে দেয়ালে, ফুলের—সুন্দর ঝকমকে বিচিত্র দাঁত বার ক'রে গাছের পর গাছের সেকি হাসির ধুম। সমাদ্দার সায়েব বাইরে এতো কর্কশ আর ভেতরে এতো নরম? না এর পেছনে তাঁর বাড়ির কারো আরো নরম হাতের মিষ্টি মিষ্টি স্পর্শের ছোঁয়া লেগে—? দুইই—। এ সমস্ত কথা পরে জেনেছিলাম—। আর আশ্চর্য হয়েছিলাম এই ভেবে যে মানুষের মধ্যে যে পূর্ববর্ণিত জেকিল আর হাইড-বৃত্তি রয়েছে তার চরম প্রকাশ সমাদ্দার সায়েবের মধ্যে যেমনটি দেখেছি তেমনটি আর কোথাও কখনোও নজরে পড়েনি—।

অনেক দূর পর্যন্ত বাগান-বাগান-গাড়ি-বারান্দা পার হ'য়ে এলানো এলানো লম্বা লম্বা কয়েকটা সরু সরু সিঁড়ি আর বারান্দা বেয়ে ওঁর বাড়ির নিস্তব্ধ নিস্তব্ধ, একটু বা থমথমে অন্ধকার অন্ধকার ড্রইং রুমে প্রবেশ করলাম—। কী গুরু গম্ভীর!

অনেক সময় কেনো বিশেষ ঘরের বিশেষ গাম্ভীর্য আর যেন ব্যক্তিত্ব ধরনের কি এক জিনিসের কথা ভেবেছি ছেলেবেলা থেকেই—। এক একটা ঘর আছে, হঠাৎ ঢোকা যায় না। কেমন যেন থমকে দাঁড়াতে হয়; ভয় ভয়, কিংবা কেমন একটা সংকোচ সংকোচ ভাব আসে দেহলী পার হ'তে—। ছেলেবেলায় বাবার ঘরখানাকে ভীষণভাবে ঐরকম লাগতো। সেটা ঘরখানার কৃতিত্ব না ঘরের মালিকের ব্যাক্তিত্বের প্রতিফলনের মানসিক প্রতিক্রিয়া, কিংবা নিজের হীনমন্যতা, তা বিচারের অপেক্ষা রাখেই—। এক্ষেত্রেও বোধ হয় তাই। হাজার হোক চাকরির কর্তা তো বটে তা যতোই কেন সে চাকরির প্রতি মায়া

মমতার অভাব থাক না। সাদা ঝলমলে পোশাক আর পাগড়ির মতো পরা মসৃণ দাড়ি কামানো আর্দালী পূর্ব নির্দেশমতোই বোধ হয় আমাদের ঘরের আসবাব আর ছবির দিকে মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকা অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভেতরে খবর দিয়ে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে যিনি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন অপরূপ ভঙ্গিমায়, তিনি মিঃ সমাদ্দারের বহু বিবৃত কন্যা সর্বজন পরিচিত, অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী, স্বপ্না সমাদ্দার —।

একেই বলে প্রাচ্য—।

তোমার চোখের প্রশংসা চিরকাল করব। তবে হ্যাঁ, একেই বলে প্রাচ্যদেশীয় চোখ আর দেহ-রেখা—।

—শ্যামলা শ্যামলা, স্বপ্নে দেখার মতোই আলতো পায়ে নরম নরম স্বপ্না সমাদ্দার প্রদ্যোৎ আর আমাকে অবাক ক'রে দিয়ে এসে দাঁড়ালো —।

—বসুন, আমরা আপনাদের যে কোন মুহূর্তে আশা করছিলাম। বাবা এতোক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ক'রে এই মাত্র স্নানঘরে গেলেন। ওকি বসুন!

—আমরা কি দেরি করেছি? নাতো—।

—না, না, দেরি মোটেই করেন নি। আসলে বাবাই অতি উৎসাহে আজ আগে থেকেই বসেছিলেন একটু—। শেষে আমার বাঁকা ইংগিতেই বোধ হয়, লজ্জা পেয়ে স্নানঘরে গেলেন। এখন আমার ভয় হচ্ছে, হয়তো বেশ দেরি করেই বেরোবেন আমার ইংগিতের জবাব দিতে।

—স্বপ্না হাসলো, 'হীরের প্রদীপ জ্বেলে'। কি মিষ্টি, কী মিষ্টি। আমাদের পরিচয় দিতে হ'লো না।

—আপনি মিঃ ঘোষাল। সেদিন অভিনয় করতে দেখেছি।

সুন্দর হয়েছে আপনার অভিনয়। প্রদ্যোতের দিকে চোখ তুলে বলল,—আর আপনাকে দেখেছি নৃত্য-পরিচালক হিসেবে।

আমাদের দু'জনের পরিচয় নিজেই ব'লে গেলো স্বপ্না—। চঞ্চলা-বিদ্যুৎ। এক জায়গায় চুপ ক'রে থাকে না। একবার সোফায় বসে তো পরক্ষণেই ছিটকে পেছনে স'রে গিয়ে পিঠ দেয়ার জায়গাটার ওপর কনুই রেখে কথা বলে। একটু বা বারান্দার গাছের ফুলগুলোর ওপর গাল বুলিয়ে আদর ক'রে এলো।

সত্যি বলতে কি আমি ওর কথা শুনছিলাম না। চলমান সৌন্দর্যের আলোয় রঙীন হ'য়ে যাওয়া চোখে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম। এরোড্রোমের চড়কি-নিশানী-আলোর মতো আমার চোখ ঘুরে ঘুরে চলছিলো, একটু বা লুকিয়ে চুরিয়ে —চুম্বকের শক্তি-সীমানার মধ্যে আসা-লোহার মতো।

সত্যিই কিছুই শুনছিলাম না আমি।

চৈত্রমাসের গন্ধ গন্ধ আমের-মুকুলের মধু ঝরার মতো মনের প্রীতি-মধু ঝরে এক একজনকেই দেখলেই। স্বপ্না সেই একজন। দু'একটা সাধারণ প্রশ্নোত্তর।

ওর মিষ্টি মুখ আর সুরেলা কণ্ঠস্বরের মদে চুর হ'য়ে গেছি যখন, তখন আবির্ভাব হ'লো সমাদ্দার সায়েবের।

আরে। একেবারে অন্য মানুষ। ধুতি পাঞ্জাবি, স্যাণ্ডাল। আমরা কোনো কোনো লোককে বিশেষ কোনো পোশাক ছাড়া দেখা অভ্যেস না থাকায়, অন্য কোনো পোশাকে কল্পনাই করতে পারি না, হয়তো চাইওনা করতে। হঠাৎ তাই অন্যরূপ দেখলে ধাক্কা লাগে। লাগেই। ধাক্কা দু'রকমের আছে। রাস্তায় একজন কাঠখোট্টা ধাক্কা দিলো, সে একরকম; আবার পেছন থেকে

অন্যমনস্ক দেখে, চমকে দেবার জন্যে তুমি একটা তুলো-নরম ধাক্কা দিলে। তফাত নেই ?

কাউকে অন্য পোশাকে সুন্দর দেখায়, তাঁর গ্রেস বাড়ায়, আবার কাউকে ক্যাবলা, খেলো দেখায়। দু'ক্ষেত্রেই ধাক্কা—। সমাদ্দার সায়েবের বেলায় কিন্তু ভালো ধাক্কা। ভদ্রলোককে যে এতো ভালো লাগতে পারে তা অফিসের পোশাকে আর অহেতুক গাম্ভীর্যে ভেবে দেখার অবসর তিনিই দেননি এতোদিন—। অভ্যাস মতো, প্রায় এটেনশনে দাঁড়িয়ে ব'লেই ফেলেছিলাম— Good evening Sir ! আগে থেকে সুপরিকল্পিত অভ্যর্থনা ক'রে উনি আমাকে করতে দিলেন না তা। আমার মুখ, চোখ, উঠে দাঁড়ানো দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে কথার জেট বিমান ছেড়ে দিলেন সুবিন্যস্ত, সুন্দর ক'রে—। —প্রথমেই ব'লে রাখি এখানে ও জগত মন থেকে মুছে ফেলতে হবে মিঃ ঘোষাল। আমি অফিস থেকে যখন বেরোই তখন মুখ হাতই ধুইনা, Really I wash my hands off ! এখানে ফরম্যাল হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে আজ প্রথম দিন ব'লে যেটুকু হওয়া দরকার সেটুকু। বিশেষ ক'রে শ্রীপ্রদ্যোৎনারায়ণ রয়েছেন যখন—। উনি নিজেই পরিচয় ক'রে নিলেন প্রদ্যোৎনারায়ণের সঙ্গে। একেবারে পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক কাজের কথায় চলে এলেন এরপর—।

—সমু কথাকলি আর ভারতনাট্যমের ব্যাপারে বেশ কিছুটা পিছিয়ে আছে, মণিপুরীটাও—। অভিনয় অবশ্য করে অনেক জায়গায়, সাধারণ নাচটাচ চালিয়েও নেয়। তবে পার-ফেক্‌শনে আনার জন্যেই আপনাদের আমার বিশেষ অনুরোধ—। —আপনি অত ক'রে ব'লে লজ্জা দেবেন না আমাদের। আমরা সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেবো। আজ থেকেই উনি আমাদের সভ্যা হ'লেন। কাল থেকেই যাবেন ওখানে। আর, আর আপনাকে

আমাদের সম্মানীয় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পেলে নিজেদের ধন্য মনে করব আমরা। শেষের দিকের কথাগুলো ফাগুন সন্ধ্যের হাওয়ার মতোই মোলায়েম মিষ্টি হ'য়ে এলো। কেন জানি না, বোধ হয় চাকরির জন্যেই অতিরিক্ত বিনয়াবনত ব'লে মনে হ'লো আমার সেই সময়কার মুখচ্ছবিটা। মানসিক আয়নায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম—।

উনি রাজি হ'লেন ঘাড় নেড়ে। মিষ্টি ক'রে হাসলো স্বপ্না, মুখ ঝলসানো হাসি—।

এরপর এলো চা আর টা। বাহান্ন ইঞ্চি ধুতির মতো তার এমন উপছে-পড়া বহর হ'তে পারে আগে ভাবিনি। স্বপ্না হালকা হালকা অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গিতে আমাদের ডাকাত-দৃষ্টির সামনে চা তৈরী ক'রে চললো। আসর জমো-জমো হবার পূর্ব মুহূর্তে আসল মানুষ এলেন। একখানা গাড়ি এসে থামলো গাড়ি বারান্দায়। যেন কতো চেনা চেনা, দেখা দেখা এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলা নেমে এলেন লঘু পায়ে—। উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো সমাদ্দার সায়েব আর স্বপ্নার মুখ। অভ্যর্থনা জানানো হ'লো কলকণ্ঠে—।

আসুন মিসেস্ ভাদুড়ি! আপনাকেই, একমাত্র আপনাকেই ভীষণভাবে মিস করছিলাম আমরা!

মিসেস্‌কে মিস্ করছিলেন শুনে খুশি হওয়া উচিত কি আমার?

হাসিটা পর্যন্ত না দেখলে বোধ হয় মানুষের সৌন্দর্য বিচারের রায় দেয়া যায় না। মিসেস ভাদুড়ির হাসি দেখে আমাদের তাই মনে হলো—। ছেলে বেলায় ঈষৎ লিক্ হ'য়ে যাওয়া রবারের বলের কোনো একটা জায়গায় চাপ দিলেই সেই যে টোল খেয়ে যেতো তা আর সহজে নিটোল হ'তে চাইতো না। কথা বা হাসির শুরুতেই মিসেস ভাদুড়ির গালেও সেই লিক্

হওয়া-বলের দীর্ঘস্থায়ী টোল পড়ে। তাছাড়া এক উচ্চ গ্রামের আভিজাত্য তার চলনে বলনে, ভাবে—ভঙ্গিতে—। অপূর্ব—! পরিচয় করিয়ে দিলেন সমাদ্দার সায়েব।

ইনি মিসেস সুপ্রভা ভাদুড়ি, একজন অসাধারণ শিল্পী। একাধারে সঙ্গীত, নৃত্য আর অঙ্কনে তুর্লভ দক্ষতা। এঁর কাছে সুমুর ঋণের সীমা পরিসীমা নেই—। এই কিছুদিন আগে পার্ক ষ্ট্রীটে এঁর ছবির প্রদর্শনী হ'য়ে গেলো; জানেন বোধ হয়—।

মনে পড়ল আমার—।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখেছি—। আপনার ছবিতে ফরাসী প্রভাব দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম। শিক্ষা দীক্ষা ঐখানেই বোধহয়।

—ধরেছেন ঠিক! কিছুদিন প্যারীতে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার—।

—এঁদের পরিচয়—

মিঃ সমাদ্দার আর বলতে পেলেন না।

—ওদের জানি আমি। উনি আমাদের নাড়িনক্ষত্র ব'লে বললেন,—আপনাদের শো একটাও মিস্ করি না আমি—। কত-বার ভেবেছি আলাপ পরিচয় ক'রে আসি; কিন্তু ঠিক যোগা-যোগটা ঘ'টে ওঠেনি। মিসেস ভাদুড়ির কথা না শুনলে বোঝা যায় না বাংলা ভাষা কতো সুন্দর আর কতো মিষ্টি—।

এবার চিনতে পারলাম। প্রায়ই প্রথম সারিতে ব'সে আমাদের শো দেখতে দেখেছি ওঁকে—। জমজমাট হয়ে উঠল আমাদের আসর। থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির তুর্বোধ্য নিয়মে কিনা জানি না, সময়কে সময় মনে করার অবসর না দিয়ে অজান্তে রাত গভীর হ'য়ে গেলো সঙ্গসুখ মোহ-গ্রস্ত আমাদের ফাঁকি দিয়ে—। ঘড়ির কাঁটা বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে এগারো শব্দের বাক্যে তিরস্কার করতে আমাদের চমক ভাঙ্গলো। আরো দেরি করলে

কাঁটা-খাঁড়া দিয়ে আমাদের বারোটা বাজিয়ে দেবে, তাও বুঝিয়ে দিলো বা! উঠতে হয়......। মাঝে কথা হ'য়ে থাকলো অভিনয়-পারদর্শিনী মিসেস ভাতুড়িও একাডেমিতে যোগ দিচ্ছেন। সঙ্গীত ও নৃত্যের কিছু কিছু দায়িত্বও স্বেচ্ছায় নিচ্ছেন তিনি। আর কি চাই--।

ফেরার সময় তাঁর প্রস্তাবে তার গাড়িতে যেতে সম্মতি জানালাম আমরা। প্রদ্যোৎনারায়ণ ওঁর এলাকায় থাকে। আমাকে হাজরার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে চলে যাবেন ওঁরা। —আজকের সন্ধ্যেটা চমৎকার কাটলো আমাদের! ফেরার সময় মিঃ সমাদ্দার বললেন—। সায় সূচক হাসির রূপালী জোছনা ছড়িয়ে দিলো মুখে—। কালো ব্লাউজের ওপর সবুজ-পাড়ের শাদা ব্যাঙ্গালোর সিল্কের শাড়িতে অপরূপ মিসেস ভাতুড়ির সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

একটা বিশেষ গন্ধ দ্রব্যের মত গন্ধ চুর ক'রে রাখলো আমাদের—। যার মোহ আমি কাটিয়ে উঠতে পারলেও প্রদ্যোৎনারায়ণ পারবে কিনা কে জানে। আমার ঐ রকমই একটা আশংকা জাগলো কেমন।

সপ্তাহে একটার বেশি রবিবার না থাকার অসুবিধে শুধু [illegible]থের একার হয়নি, আমাদের সকলেরও--

পরদিনই যথারীতি বিকেলে সমাদ্দার সায়েবরা এলেন, আমাদের একাডেমিতে। সঙ্গে. মিসেস ভাদুড়ি তাঁর ভার বোন রীতা সান্যাল। ওঁরা মেম্বার হ'লেন। আলাপ পরিচয়ের পর

চায়ের টেবলে সধূম আড্ডার সেকি ধুম আমাদের। সমাদ্দার সায়েব বুঝতেই দিলেন না আবার পরদিন অন্যভাবে তাঁকে সেলাম জানাতে হবে ডকে—। আমার লেখা 'দিগ্বিদিক' নাটকখানা অভিনয়ের ব্যবস্থা হ'লো, হ'লো কাষ্টিং। আমার বিপরীতে নায়িকার রোল দেয়া হ'লো স্বপ্নাকে—। ওর সলজ্জ হাসিটা ভোলার নয়— ভোলার নয়—। মিসেস ভাতুড়িও রোল নিলেন একটা। উৎসাহের ফ্লুরোসেন্ট-জ্বলা চোখ ঝলমলিয়ে উঠলো আমাদের—।

মহড়া চলবে শনিবার থেকে। সপ্তাহে তুদিন—শনি-রবি—। পরে বাড়ানো হবে প্রয়োজনের তাগিদে। নাটকখানা পড়া হ'য়ে যাবার পর একাডেমির লাউঞ্জে বিক্ষিপ্ত হয়ে তুজনে বা তিনজনে একটু আধটু গল্প-গুজবের ফাঁকে সুপ্রভা ভাতুড়ির আর একটি পরিচয় পেয়ে অবাক হলাম। উনি একজন প্রকৃত সাহিত্যানুরাগিণী—। নাটক সম্বন্ধে রীতিমতো দখলদারী আলোচনা করলেন।

—আপনি লেখেন না? এক সময় জিজ্ঞেস ক'রে বসলাম কথার ফাঁকে—।

উনি হাসলেন। স্বপ্নাও।

উত্তর দিলেন মিঃ সমাদ্দার:

—ওহো, আপনাকে তো বলাই হয়নি মিঃ ঘোষাল! মিসেস ভাতুড়ি একজন উচুস্তরের সাহিত্যিকা—।

মুগ্ধ হ'লে মানুষ যে সব সময়ই চুপ করবে বা চীৎকার করবে তার কোনো বাঁধা ধরা নিয়ম নেই বোধহয়। কারণ আমি এক্ষেত্রে ধীর গম্ভীর সুচিন্তিত সুপরিমিত জবাব দিলাম।

আপনার সঙ্গে পরে এসব বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল—।

—ও, নিশ্চয়ই ! আসবেন, আসবেন আমাদের বাড়ি মাঝে মাঝে সময় ক'রে, এ সমস্ত ভুলে। ঠিক আসবেন কিন্তু। আমার অখণ্ড সময়! উনি ওঁর ঠিকানা দিলেন। ফেরার পথে আমরা সকলেই বেরোলাম একসঙ্গে দু'খানা গাড়িতে। আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে মিসেস ভাদুড়ি চলে গেলেন প্রদ্যোৎনারায়ণকে নিয়ে। লেবুর আরকের মতো মনটা খুশিতে জরে জরে উঠল।

Good-night ! আবার শনিবার দেখা হচ্ছে !

নামার সময় বলেছিলাম।

শুভরাত্রি !

হাসলেন মিসেস ভাদুড়ি। ওঁর দাঁতের আলোয় ঈষৎ আলোকিত হ'লো গাড়ির অভ্যন্তরটা। গাড়ি ছেড়ে দিলো—।

আবার, আবার শনিবার। সত্যি বলো, রবিবার একটার বেশি না হ'য়ে অসুবিধে কি রবীন্দ্রনাথের মতো আমাদেরও হয়নি ? আর রবিবার আর একটা থাকলে ঘোড়ার চাবুকের মতো, আর একটা শনিবারও কি লেগে থাকতো না ওর পেছনে ? বল ?

ঢেঁকি স্বর্গে যায় কিনা জানিনা, তবে শুনেছি স্বর্গে গেলেও নাকি ধান ভানে। এখন কথা হচ্ছে স্বর্গে ধান হয় কিনা। মর্ত্যের মতো যদি ধানই হবে তা'হলে আর স্বর্গ কি ? কিন্তু ঢেঁকি ভানবেই, তা ধান থাক আর নাই থাক।

আমার বুক থেকে ডকের শুষে-নেয়া বাতাসটাকে মুক্ত ক'রে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে বাইরের বাতাস ভ'রে নিতে মনস্থ করেছিলাম, ভেবেছিলাম ডকের এলাকাকে সেলাম জানিয়ে

সোসাইটির আওতায় গিয়ে হাঁফ ছাড়বো। কিন্তু তা হবার জো কোথায়? কারণ দুটো। একটা ওখানে যা ঘটলো তা তোমার মনোপীড়নের কারণ স্বরূপ হ'য়ে উঠছে; আমার সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হচ্ছ তুমি, বেশ বুঝতে পাচ্ছি—। আর একটা কারণ, নিছক যাদের কথা বলব ব'লে এ লিপি শুরু করেছি, তাদের ছেড়ে গেলে যেন অবিচার করা হবে ব'লে মনে হচ্ছে, তাই

তবে নিরাশ করবো না তোমাকে, দেবো না ফাঁকি, বঞ্চিত করবো না নিজেকেও ! প্রসঙ্গক্রমে যা কিছু এসে যাবে আমার কুঁড়ে ঘরে, জানাবো—সুস্বাগতম—।

তাই বলছিলাম আমাদের ঢেঁকির মতো স্বর্গে গেলেও ঐ ডক—। নোঙর মাস্তুল, ফলকা আর ক্রেন ডেরিকের ধান ভানা আমার মনে প্রকাশের চাল ফুটিয়ে তুলছে শুভ্র ফুলের মতো। রোববারের তো—কলি যুগ শেষ হওয়ার মতো—অনেক দেরি। তার আগের বেদনা মধুর ঘটনা শুনিয়ে নিই, যা ঘটে গেলো শনিবারের মধ্যেই—। চলো যাই যেখানে ধুলো-ভুসো-ধোঁয়া—

যে ধুলো-ভুসো-ধোঁয়া দিয়ে দিনের শুরু—শেষও সেই ধুলো-ভুসো—ধোঁয়াতেই। দিনের শেষ থাকলেও ধুলো-ভুসো ধোঁয়ার শেষ নেই—এমনি আজব কারখানা এই খিদিরপুর ডক্—

শ্মশানের চিতার মতো ধুলো-কালি কলংকিত কাজের চুল্লী অনির্বাণ জ্বলে চলবে—অবিরাম—অবিশ্রাম—দিনরাত—রাতদিন। ঘড়ির ছোটো হাতের সারাপথ ঘোরার সঙ্গে সমানে স্থায়ী ম্যারাথন-পাল্লার দৌড়ে, এর কাজ চলবে তালে তাল দিয়ে দিয়ে—আর চলবে আর একটা ব্যাপার প্রায় অনুরূপভাবেই—

—তিন নম্বর খিদিরপুর ডক-গেটের সামনে নীলরঙা মার্কিন-নাবিকী প্যান্টের ওপর দু'রঙা ছেঁড়া সিল্কের কলারওলা গেঞ্জী গায়ে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডের পাশে এজেন্ট্ জেনারেল জোসেফের দাঁড়িয়ে

থাকা, দাঁড়িয়ে থাকা আর বিড়ি ফোঁকা,—কিংবা কানে গুঁজে রাখা দুই তৃতীয়াংশ পোড়া হনুমান-মুখো সিগারেট খুলে আগুনের পানে তার কালো মুখ লাল করে নিয়ে হাটুসে টান দেয়া—

একাজেও শুধু একা নয়, একটা দল। বেশ যেন কেমন এক ছন্দে চলে ওদের দাঁড়িয়ে থাকা; সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত প্রায় সকলেই দাঁড়াবে ভিড় ক'রে; তারপর ঐ রিদম্। দুজন দাঁড়াবে তো বাকি তিনজন ফিরবে বাসায়। তবে সবচেয়ে বেশি যাকে দেখা যাবে সে—না বললেও বোঝার মত—জোসেফ, —দলের পাণ্ডা—।

সেই জোসেফের ক'দিন হ'লো দেখা নেই। নির্দিষ্টস্থানে তার ভীষণভাবে চোখে লাগার মতো—বেমালুম অনুপস্থিতিটায় অস্বস্তি বাড়লো। অসুখ বিসুখ নাকি? এ অঞ্চলে যে কেউ, যে কোনো কারণেই হোক না, যাতায়াত করেছেন, জাহাজ এঞ্জিনের কালি, ধোঁয়া আর মাল বোঝাই লরীর ধুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে রাস্তা করেছেন ধাক্কায় ধাক্কায়, আর জোসেফের সঙ্গে প্রায় ধাক্কাধাক্কি করে পথ করে নিতে হয়নি—এমন হ'তেই পারেনা—কিছুতেই নয়; কই না, এমন তো হয়নি আজ পর্যন্ত! বাজপাখি-চোখে ঠাওর ক'রে বার করবে জোসেফ, কে সত্যি নাবিক—তীরে নেমেছে ফুর্তি আর মজা লোটার জন্যে, আর কেই বা গৃহগত-প্রাণ এখানকার সায়েব সুবো, সংসারী জীব, ঘরে ফিরছে, সন্ধ্যের কাকের মতো। ঠিক করতে একবিন্দু ভুল হবেনা জোসেফের। কই, আজ পর্যন্ত তো হয়নি।

নাবিক জীবনের সঙ্গে এক অদ্ভুত বিনিসূতোর অদৃশ্য গাঁটছড়া বেঁধে বসে আছে ও। ঠিক বুঝবে কী চাইছে ওরা, কখন কী প্রয়োজন, কখন বিরক্ত আর কখনই বা হালকা-মেঘ-মনে। ঠিক

ধরবে। ছোটো খাটো মডেল শহরের মতো রোজ কতো জাহাজ ভেড়ে ডকে আর উগরে দেয় অসংখ্য লালচে লালচে মানব-জীবাণু, নবাগত নাবিক ; সকালে, বিকেলে, সন্ধ্যেয়—গভীর রাত্রিতেও। মাটিতে পা দিয়েই ওরা খুঁজবে ওদের কাম্য——মদ—মাংস—মেয়ে, আরও অনেক কিছু যা আমরা জানিনা—বুঝিনা।

নোংরা রোগের ডুর্লক্ষণের মতো মার্কামারা গলিঘুঁজি, দোকান-পাট, সস্তা হোটেল রেস্তোরা। আর ততোধিক সস্তা জটিল ক্লেদাক্ত মানুষ দিয়ে ঠাসা ডক্ এলাকা -ওয়াটগঞ্জ পেরিয়ে --মুন্সীগঞ্জ পর্যন্ত—জরজর । ওর মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত-সব খবর জোসেফের হাতে--নাড়ি নক্ষত্র। কোন মেয়ে কী রকম। নামধাম। এমন কী গত দুদিন কোন মেয়ে কার সঙ্গে বসবাস করেছে পর্যন্ত ! দেহ ব্যবসায়িনী নিয়ে ব্যবসা ! জোসেফ ওদের এজেন্ট, দম্ভভরে নিজেকে দাবী করে এজেন্ট জেনারেল ব'লে—। দুপক্ষ থেকেই মোটা কমিশন ওর বেতন। তার ওপর বকশিশ ইত্যাদির ভাতা। ওর কর্মক্ষেত্রের পরিধি কম নয়। বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হ'য়ে চলেছে। থিয়েটার রোড, ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে ওয়েলেসলী অঞ্চল পর্যন্ত নখদর্পণে। হাতের কাছের পণ্যে তুষ্ট না হলে নিয়ে যেতে হয় যে ! চৌরঙ্গী অঞ্চলের অনেক ছেলের সঙ্গে ব্যবসায়গত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। না, কালীঘাট বাগবাজার যেতে হয়না ওকে। যায়না ইচ্ছে করেই। এরই মধ্যে নিজের সীমানা নির্ধারণ ক'রে খুশি আছে। সুশাসিত সুপরিকল্পিত—সুবিন্যস্ত এলাকা ওর।

জোসেফ সম্বন্ধে আমার আগ্রহ-জাগবার কারণ ওর চোখ টেনে নেবার মতো চুম্বক-চেহারা। টুকটুকে, সোনালী চুল আর নীল চোখের একটা সুডোল ছেলেকে ঐখানে, ঐভাবে, ঐ-

পোশাকে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়েছিলাম সত্যিই।

গালে চাবড়া চাবড়া ব্রণ, যার প্রত্যেকটিকে একাদিক্রমে অনবরত খোঁটার ফলে উদ্গিরণ হ'য়ে যাওয়া-আগ্নেয়গিরির চূড়োর মতো দেখায়, বেশ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে—। প্রথমদিন বোধহয় ওরই মধ্যে বেশ ভালো জমকালো পোশাক ছিলো ওর। ধ'রে নিয়েছিলাম সেলর। তারপরের কয়েকদিনই এক ভাবে দেখে দেখে মনে হয়েছিলো নিচুস্তরের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভ্যাগাবণ্ড। শেষে সমস্ত ভুল ধারণা ভেঙ্গে স্বরূপ উদ্ঘাটিত হ'য়ে আগ্রহের পারা মনের মধ্যে লাফিয়ে উঠল ওপরদিকে। অফিসে ঢোকার মুখে একদিন দাঁড়িয়ে পড়লাম তিননম্বর গেটের সামনে—

ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছিলাম অদ্ভুত এক কলোক্যাল ধরনের ইংরিজি ও অনর্গল ব'লে যেতে পারে অসাধারণ পটুতায়। এছাড়া হিন্দী, কিছু কিছু বাংলা আর উর্দু—।

নতুন নাবিক দেখলেই একটা শিস দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, ডাকবে ট্যাক্সির দিকে—। তারপরেই ডিঙ্গি দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলবে—

—গাল্স স্যার? নাইস্ গাল্স! ফিপটিন, সিক্সটিন, টোয়েন্টি এ্যানি এজ্!! প্যারাগন্ অফ বিউটি!!! ইণ্ডিয়ান—ইরানিয়ান এ্যাংলোইণ্ডিয়ান ব্লণ্ড্স্!!! ক্যাম স্যার? ট্যাক্সি??—

ইংরিজি না লাগলে হিন্দী-উর্দু—

বিবি স্যার? বহোৎ খুপসুরৎ!! ফাষ্ট্ক্লাস হিন্দুস্থানী আওরত!!

তাও বিফল হ'লে ঠিক না জানা কয়েকটা ফ্রেঞ্চ শব্দের বাণ ছাড়বে—ডাম্ মুঁসিয়ে? বেলে ডাম্!—বিঁয়া!!—ভাঙ্গা ইংরিজি—ছন্নছাড়া ফ্রেঞ্চ আর অদ্ভূত হিন্দী-উর্দু মেশানো ওর ব্যবসায়িক কথাবার্তা চলবে সহজ—সরল—সাবলীলতায়—।

সায়েব রাজি হ'লে সে কি লাফ! স্প্রীংএর মতো ছিটকে গিয়ে একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে সেলাম ঠুকে দাঁড়াবে। তারপর মেজাজ অনুযায়ী ড্রাইভারের পাশে বসে নিয়ে যাবে-ওর মতে ভালো বা রদ্দি জায়গায়। হঠাৎ দুর্বুদ্ধি চাপলে তেমন তেমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে একদিনেই রোগ ধরার ব্যবস্থা পাকা ক'রে দেবে দুর্ভাগা নাবিকের। ওর হাতেই যেন তাদের ভবিষ্যৎ। কখনো সখনো ওর মধ্যের না-হদিস বিজাতীয় প্রতিহিংসার পশুটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—ভাসিয়ে নিয়ে যায় ওর বিবেক-বুদ্ধিকে ঃ খেলাচ্ছলে সর্বনাশ ক'রে বসে কোন রোদ্র-রঙা চুল আর সমুদ্ররঙের চোখে স্বপ্নমাখা আঠারো বছরের প্রথমবার সাগরপাড়ি দেয়া নাবিকের। ভবিষ্যৎ অন্ধকার ক'রে দেয় এক ঘণ্টায়।

সেই সমস্ত ভয়ংকর মুহূর্তে ও যে কতো কৌতূহলী সরল সুন্দর ছেলের জীবন জরজর ক'রে দিয়েছে ইয়ত্তা নেই তার। শুধু বিদেশী নয়—এদেশীও। ছেলেই নয়, মেয়েদেরও। নতুন এ ব্যবসায়ে আসতে বাধ্য হওয়া কতো নিষ্পাপ মেয়েকে কোনো জাঁদরেল জার্মানের হাতে ছেড়ে দিয়ে এসে আনন্দই পেয়েছে ও। এ সমস্ত কথা পরে জেনেছিলাম। ধাক্কা খেয়েছিলাম ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনেই—আমার প্রশ্নে ওর উত্তর শুনে—

কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বেশ অশ্লীল ভাষায় কথাবার্তা কইছিলো জোসেফ! ওর সামনে আমাকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে খুব যে একটা সঙ্কুচিত-সন্ত্রস্ত ভাব এসেছিলো ওর, কই, তেমন তো মনে হয়নি!—

ডাকলাম। জিজ্ঞেস করলাম নাম।

বেশ জোর দিয়ে অথচ অবহেলাভরে বলল—জোসেফ! বাবার নাম? কোথায় থাকো? কী করেন তোমার বাবা—? তুমি—?

কী হাসি জোসেফের!

আমার কৌতূহলের মেঘলা আকাশ, প্রশ্নের বিদ্যুতে বিদ্যুতে ছাওয়া দেখে সে কী হাসি জোসেফের!! ওর বন্ধুদের দিকে আড় চোখে চেয়ে-চেয়ে -ওদের সহানুভূতি-হাসির ঘুম ভাঙ্গিয়ে সে কী হাসির বহর ওর!!!

বলে কী লোকটা?

এই রকম ভাব। 'ফুঃ' শব্দ উচ্চারণ না ক'রেও কিছু একটাকে অস্বীকার—তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার কেমন একটা তীক্ষ্ণ হাসি আছে না? ঠিক সেই রকম। প্রথমে ওর ভাব দেখে মনে হ'লো সব কিছুর মতো আমাকেও উপেক্ষা করবে জোসেফ; উত্তর দেবেনা। কিন্তু না! আমার ওখানকার অফিশিয়াল ক্ষমতা সম্বন্ধে সজাগ হ'য়ে আর কোমলভাব দেখেই বোধহয় উত্তর দিলো।

—ফ্যাদার? একটু সেই রকম হাসল আবার,—হু দি হেল ইজ্ হি—? আই ডোণ্ট্ নো হিম!! এবার বন্ধুদের কাছে সমর্থনের গোপনীয়তা মাখা একটা চাওনি দিলো শুধু। তারা জানে যে! জোসেফের বাবাকে সত্যিই চেনেনা জোসেফ। জানেনা সে কোনদেশী।

নো পাপা—নো মামা!

পরে জেনেছিলাম মা আছে কিন্তু ওর। খুঁটে খেতে শেখে তাকে ত্যাগ ক'রে এসেছে নিষ্ঠুরভাবেই। এখনো খিদিরপুরের ভূকৈলাশ বস্তির মধ্যে দিয়ে ঘুরলে আজে বাজে, কালো তামাটে রঙা স্ত্রী পুরুষের ভিড় থেকে হঠাৎ রঙের পদ্ম ফুটে উঠতে দেখা যাবে। জীর্ণ টালি-খোলার ঘর থেকে না ভারতীয়, না ইঙ্গ-ভারতীয়, না ইরাণীয় কিংবা প্রকৃত য়ুরোপীয় শাদা ফ্যাকাশে, উপযুক্ত পুষ্টিবিহীন, চোখের কোণে আর দেহের ত্বকে নানান অত্যাচারের নিশানা উড়িয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাবে কয়েকটি স্ত্রী-পুরুষকে। প্রতিদিন বিকেলের দিকে এদেরই মধ্যের ব্যবসায়িক আকর্ষণশূন্য কয়েকজনকে জীর্ণবাসে দল বেঁধে চৌরঙ্গীর দিকে ভিক্ষেয় বেরুতে দেখা যায় না এমন নয়। মজা আছে কিন্তু! সায়েব ছাড়া কারো কাছে কখনো হাত পাতবেনা ওরা কিছুতেই—

ইণ্ডিয়ান? নেভার!!

এরাই বিদেশী নাবিক আর দেশী পাঁচমিশেলী ফিরিঙ্গী মেয়েদের মিলনের ফল।

জোসেফের মা এই ধরনের স্ত্রীলোক। আর বাবা?—who the hell is he?

হাঁ, না-জানা খাঁটি য়ুরোপীয় কেউ! না, জোসেফের মাও খুব চিন্তা ক'রেও বলতে পারেনা ঠিক কোন্ বিদেশী নাবিকটি জোসেফের জন্য দায়ী—।

Damn your father! You are the truth, that's all!—

সে তো বলবেই। একটা রুদ্ধ আক্রোশ, দুর্জয় অভিমানও আছে হয়তো এসব বলার পেছনে। থাকবেই। তাই বোধহয় এই অদ্ভুত পেশা বেছে নিয়েছে। নিজের জাত ভারী করার

পেশা। একটা বিশিষ্ট গোষ্টী গড়ার নেশায় পেয়ে বসেছে ওকে।

কী জাত তোমার? কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করেছে। ড্যাম্‌ড্‌ জাত!

একটু হালকা মনে থাকলে হয়তো ব'লে বসবে—হামি International Blood !! Follow?

আমার প্রথম দিনের আলাপ সোজা রাস্তা পায়নি বেশিদূর এগোবার। কথা বলতে বলতে বারো নম্বর বার্থে ভেড়া TERNATE জাহাজ থেকে তুজন অল্পবয়সী ডাচ্‌ নাবিককে এগিয়ে আসতে দেখে পাল্টে গেছে জোসেফ। মজ্জাগত ইজম্‌ চাপলো মাথায়—

কাম্‌ স্যার! ট্যাক্সি? ,বিউটিফুল গার্ল্‌স্‌! এক্সেলেন্ট্‌ ফুড এ্যাণ্ড্‌ ওয়াইন্‌! ডান্স্‌—কাবারে!! 'বার' ওপন্‌ টিল ওয়ান্‌—এ, এম্‌—!!!

ওর ভাবভঙ্গি ব্যবহারের জাতু পরিবর্তন হল মুহূর্তের মধ্যে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিঃসীম আগ্রহ আর অদম্য কৌতূহল নিয়ে দেখলাম ও তাদের সংকোচের খড়কুটো কথার ঝড়ে উড়িয়ে, রাজি করিয়ে একটা ট্যাক্সিতে তুললো; আর শিস্‌ দিয়ে একটা চোখ হঠাৎ বুজে, বিশেষ ভঙ্গি আর ইংগিতে জানিয়ে দিয়ে গেলো যে 'স্পাইরো' আর 'কক্কাস' গ্রুপের ব্যাসিলি-বিজবিজ কোন কুস্থানে নিয়ে যাচ্ছে ওদের। আর রক্ষে নেই।

এ সমস্ত কথা পরে জেনেছিলাম। কিন্তু না জেনেও সেদিন সারাদিনটা সেই নাবিক তুজনকে মনে পড়েছিলো বারবার। মনটা হয়ে ছিলো ভারী থমথমে। আহা, হয়তো কিছু জানেনা ওরা! এই প্রথম বিদেশে আসা। পরে জোসেফের ইংগিতের অর্থ জেনে আরো কষ্ট হয়েছিলো। কেন

এমন করে ও? শুনেছিলাম ওর মা এখনো ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে জীর্ণ-দেহের পসরা সাজিয়ে, এক জঘন্য বস্তিতে। জোসেফের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই তার। জোসেফই স্বীকার করতে চায়না সম্বন্ধ। হৃদয় আর যাকে সেন্টিমেণ্ট্ বলে তার তিলমাত্র নেই ওর পাথর-বুকে। এসব শুনলে ঘৃণা কৌতূহলের সঙ্গে আকর্ষণও জাগে, অন্তত আমার—

সেই জোসেফকে 'টাওয়ার ক্লকের' মতো নির্দিষ্টস্থানে পরপর তিনদিন দাঁড়িয়ে না থাকতে দেখে উদ্বিগ্ন হবো তাতে আশ্চর্য কী? ডক-সিংহদ্বারে স্থায়ীভাবে নোঙর করা জোসেফকে এই প্রথম নোঙর তুলে নিতে দেখলাম। ডেকে পাঠালাম ওর সঙ্গী-সাঙাতের একজন—কলিমুদ্দিনকে। কৌতূহল। কলিমুদ্দিনও প্রায় জোসেফের মতো, তবে পুরোপুরি এদেশী—। "ওর মতো International নেহি আছে!"

জোসেফের কুশল প্রশ্ন করলাম অস্বাভাবিক অধৈর্যতায়। ম্লান হাসলো কলিমুদ্দিন। ওর মুখে এ হাসি আসে কোথেকে কে জানে!

আর ওখানে দাঁড়াবেনা জোসেফ, কখনো নয়! বলল, ও।

—কাহে? দুসরা কাম্ মিলা কা? দুসরা জায়গা মিলা?

—জী হ্যাঁ—!

—কুছতো বাতাও ইয়ার!!

—বরবাদ হো গিয়া জেসেফ!

ভাবলাম—আর কী উচ্ছন্নে যেতে পারে সে?

—গিয়া কাঁহা?

—গুজর গিয়া!!

নিঃশ্বেস বন্ধ শুধু আমারই হ'লো না, কলিমুদ্দিনেরও। অমন জলজ্যান্ত ছেলেটা! ওর এ বন্দরের কাল শেষ?

—ক্যাইসে— ?

ঐ 'ক্যাইসের' জবাবে কলিমুদ্দিনের উর্দু-হিন্দী-মেশানো যে কাহিনী শুনলাম তা চুম্বকের মতো মনের মণিকোঠায় গেঁথে রইলো শাশ্বত হবার দাবী নিয়ে—।

সারাদিন এখানে নোঙর ক'রে থাকা ছাড়াও আর একটা পোতাশ্রয় ছিলো জোসেফের—জীবনের আর একখণ্ড। বাসার জীবন—ইয়ার দোস্ত্‌দের নিয়ে হৈ হল্লার, আড্ডার জীবন—সকালের আর রাতের জীবন—।

খিদিরপুর পোলের ঠিক দক্ষিণমুখে ডানদিকে নিচু হ'য়ে যে রাস্তাটা কোথায় যে গড়িয়ে গেছে, তার থেকে বাঁদিকে ব'য়ে যাওয়া এক শাখা-রাস্তার শেষের দিকে জোসেফের আস্তানা, কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব সহকর্মিদের নিয়ে মেস বাড়ির মতো। সকালে কাজে বেরুনোর আগে ওয়াটগঞ্জের মোড়ের রেস্তোরাঁয় কিছুক্ষণ গজালি; অশ্লীল আড্ডা—সিনেমার গান, গল্প ;—প্রত্যহ। এখানেও জুড়ি নেই জোসেফের।

অনেক খুনী-বদমাশ-চোর-পকেটমারও ভিড় করে ওখানে। সকলকে জানে জোসেফ। নিজেও কম বদমাশ নয়, তাই টিকে থাকে নায়কের মর্যাদায়।

ঐ মর্যাদা না থাকার সম্ভাবনার একটা কারণ মাথা তুলে উঠতে চঞ্চল হ'য়ে উঠল জোসেফ। এক নায়কত্ব বুঝি চলে যায়।

কদিন ধরেই লক্ষ্য করছে ও, ঐ দলটাই দুর্বার হ'য়ে উঠেছে যেন। ওদের দলে কয়েকটা নতুন লোকের আমদানী হয়েছে

ওয়াটগঞ্জের ভাঙ্গা সিনেমাটার আস-পাশের পচা পচা চা-পানের দোকান থেকে। সব্বাইকে চেনে জোসেফ। ঠিক নটার সময় এসে জমছে ওরা—গুলজার করছে—বেশ উদ্দেশ্যমূলক গুলতানি।

কাজে দেরি ক'রে ছুদিনেই ধরে ফেলেছে উদ্দেশ্য। হালফিল ঠিক সাড়ে নটায় একটি চটকদার সুন্দরী বাঙ্গালীর মেয়ে ঐ পথ ধরে, পোল পেরিয়ে ডানদিকে, রেসকোর্সকে বাঁয়ে রেখে, অশথ-কৃষ্ণচূড়া-শিশু-মেহগনী-দেওদারু গাছের ছায়ার চাদর মুড়ি দেয়া নিঝুম-নির্জন লোয়ার সার্কুলার রোড বেয়ে কোথায় যেন স্কুলে বা কলেজে যায়—উঁচু হিল-জুতো খটখটিয়ে, পথ আলো ক'রে। বেশ স্মার্ট মেয়ে! ব্রাইট্!!

সতর্কও।

কখনো পোলের ওদিকে রাস্তার ডান দিক ধরে না। ওদিকে যাযাবর আন্দাজ উনিশ বছরের এক ভিখিরী মেয়ে ঠিক ঐসময় নগ্নগায়ে হাইড্রান্ট্ খুলে নিঃসংকোচে স্নান করে বলেই।

বেশ—উদ্ধত সপ্রতিভও। প্রথম প্রথম জোসেফও ইয়ার বন্ধুদের কাছে ওকে উদ্দেশ্য ক'রে ইয়ার্কি-মসকরা, আকার-ইংগিত পর্যন্ত যে করেনি এমন নয়। হঠাৎ পাল্টে গেলো সে ঐ দলটার গতিবিধি-হাবভাব ক্ষুধার্ত নেকড়ে দৃষ্টি দেখে।

এ অঞ্চলে ভদ্রলোকের বাস খুব কম। কারা এলো, নতুন বাসিন্দা। খোঁজ নাও। নিলোও। একেবারে বাঘের ঘর। পানবাজারের প্রায় কাছাকাছি মাইকেল দত্ত ষ্ট্রীটের মধ্যে একটা বিরাট বাড়ি-ভাড়া নিয়ে এসেছে ওরা সম্প্রতি। মেয়েটির বাবা একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার।

সুলতা সেনগুপ্তা। মেয়েটির নামও জেনে এসেছে জোসেফ অনেক কষ্টে।

কাজকর্ম মাথায় উঠল জোসেফের। কিসের জন্যে সে নিজেই জানে না, প্রত্যহ দেরি ক'রে ঐ দলটার ওপর অতন্দ্র দৃষ্টি রাখলো। সন্দেহ নিরসন হলো কয়েকদিনেই! দলের একজন দুর্দমনীয়কে শিস্ দিয়ে একদিন মেয়েটিকে ডাকতে দেখলো সে, দেখলে পোল পেরিয়ে সরকারী মালপত্রের গুদাম মতো এলাকাটা পর্যন্ত ইংগিতপূর্ণ কথা বলতে বলতে পিছু নিতে।

সুলতা একবার ভীতা হরিণী-চোখে চেয়ে দেখলো শুধু,—তারপর সেই মুখ নিচু করে চলার গতি—চলা থেকে প্রায় ছোটাতে নিয়ে গিয়ে তুললো—তা বোধ হয় কলেজে গিয়েও হাঁফাতে হাঁফাতে স্বাভাবিকে আনতে পেরেছে কিনা কে জানে?

এই বিপজ্জনক বয়সের অমন সুন্দরী মেয়ে এতো খারাপ অঞ্চল পেরিয়ে একা যায় কেন? জোসেফ কিনারা করতে পারে না। সঙ্গে লোকজন চাকর-বাকর দিলেই হয়। দেয়না কেন? দিনকাল কি পড়েছে জানে না কি ওরা?

পরের দিন বেশ উত্তেজিত কথাবার্তা বলছিলো ওরা খিদির-পুরের মোড়ের কাগজ-পত্র-পত্রিকা ছড়ানো শেডটার ধারে কাছে। একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ গন্ধ ভারী থমথমে ভাব। সময় আশঙ্কায় থমকে দাঁড়ায় না। সময় হ'লো। লাল চওড়া আঁচলের ছাপা শাড়িতে অপরূপ হ'য়ে এগিয়ে এলো সুলতা প্রতিদিনের পথ ধরে উদ্ধত পদক্ষেপে—খট-খট, খট-খট করে। ওকে বুঝতে না দিয়ে বেশ দূরত্ব রেখে ওর পেছু নিলো লোকগুলো।

রাস্তায় ঢেউ তুলে উঁচু হয়ে গিয়েছে আদি গঙ্গার ওপর খিদিরপুরের ব্রিজপথ। আর তার পরেই গড়িয়ে পড়তে পড়তে পাক খেয়ে, একটু যেন পেঁচিয়ে ডাইনে বাঁয়ে বেঁকেছে পথের

শাখা-প্রবাহ। ডানদিকের স্রোতের বাঁদিকে, বিনা মরসুমে থমথমে রেসকোর্সের গ্যালারী আর অফিস, তার ডানদিকে সরকারের জনপদ বিভাগের মালপত্রের ডিপো—ইট-কাঠ, লোহার কড়ি —ছড়, ষ্টিম রোলার, এটাসেটা, এবড়ো-খেবড়ো। আব এদের মাঝে বট-অশথ-কৃষ্ণচূড়া-দেওদারুর ছায়া মাখা মাখা নির্জন লোয়ার সার্কুলার রোড অনিবার্যভাবেই ব'য়ে গিয়েছে সুলতার কলেজের দিকে।

একটু যেন সতর্ক হ'য়ে যাওয়া সুলতা জোরে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে পুল পার হয়েই—। মোড় বেঁকেই একবার দেখে নিয়েছে হয়তো, আর বাড়িয়ে দিয়েছে গতি। ওর পাতলা আদ্দির ব্লাউজটা বিশেষ করে কাঁধের নিচের ভিজে সপসপে ভাবটা অনেক দূর থেকেও নজরে পড়ে।

অনেক, অনেক দূরত্ব রেখে সকলের অলক্ষ্যে হাঁটা জোসেফের নিঃশ্বেসের গতি বেড়ে গেলো পায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে। ব্রিজ পেরিয়ে রাস্তার বাঁকের কাছাকাছি ব্রিজেরই শেষ থামের আড়াল থেকে এ কদিনের আশংকার কালিতে মনের ক্যানভাসে আঁকা ছবির চলচ্চিত্ররূপ স্বচক্ষে দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ার মত অবস্থা হ'লো ওর—!

রাস্তার নির্জনতার গভীর গহনে গিয়ে লোকগুলো হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার ক'রে উঠলো—একদম্ খাড়া হো যাও !!!

একবার অজগরের মুখের হরিণীর মতো চাইল সুলতা, তারপর দৌড়তে চেষ্টা করল প্রাণভয়ে বইখাতা ফেলে ছত্রাকার ক'রে।—ততক্ষণে খুন চেপে গিয়েছে ওদের। ঝাঁপিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঘিরে ধরেছে সবাই উন্মত্তের মতো। একজন জড়িয়ে তুলে ধরেছে সুলতাকে জল থেকে তোলা ছটফট করা তাজা মাছের মতো। ক্ষীণ চিৎকারের সঙ্গে বিপুল ধ্বস্তাধ্বস্তির চেষ্টা করলো সুলতা,

কিন্তু মুখ বন্ধ হ'য়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

ওকে তুলে নিয়ে মালপত্রের ডিপোর পাশে আদি গঙ্গার দিকে নেমে যাওয়া ভুতুড়ে ভুতুড়ে বাগানটার দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল ওরা।

You criminals !! You scoundrels !!!

তীরের মতো ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল জোসেফ যেন আকাশ থেকে, আর এলোপাথাড়ি মুষলধারে ঘুষি বৃষ্টি ক'রে একজনকে করল ধরাশায়ী। স্থুলতাকে ছেড়ে ওকে আক্রমণ করল ওরা, সপ্তরথীর আক্রমণ। এরকম অবস্থায় অত্যধিক উত্তেজনায় মানুষ যা করে তার এমন কিছু বেশি করলো না ঐ অমানুষগুলো। পেছন থেকে একজন একটা প'ড়ে থাকা সিমেণ্টের চাঙ্গড় তুলে নিয়ে, ফলাফল না ভেবে বসিয়ে দিলো জোসেফের মাথায় সোপাটে।

আর্তনাদ ক'রে প'ড়ে গেলো জোসেফ। ওর International রক্ত ছুটলো ফিন্‌কি দিয়ে ফোয়ারার মতো।

ওকে দেখে, আঘাতের গুরুত্ব বুঝে, মুখে ভয়ের শব্দ তুলে এমনকি স্থুলতাকে ভুলে, ওরা বাগান পেরিয়ে দৌড় দিলো খালের গা ঘেঁষে ঘেঁষে।

থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে কয়েক মুহূর্ত দেখলো স্থুলতা, তারপর আর্তচিৎকারে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে খবর দিলো গিয়ে আগেকার প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে। লোকজন, গাড়ি এম্বুলেন্স এসে গেলো সঙ্গে সঙ্গেই।

কিন্তু জোসেফ গেলো না ঐ অভিজাত হাসপাতালে; —যেতে পারলো না—পথেই অতিরিক্ত রক্তপাতের অশ্রুতে ওর প্রাণ বিদায় নিয়ে গেলো দেহের কাছ থেকে। ওর দেহটা পৌঁছলো শুধু।

পুলিশ আর সুলতার বাবা সমস্ত রিপোর্ট নিতে গিয়ে জোসেফের পরিচয় পেয়ে তাজ্জব? এ কেমন করে সম্ভব···

ভালোই হয়েছে সাব্? কলিমুদ্দিন একটু থেমে বলল, আমাদের পক্ষে ভালোই হয়েছে!! ওর জন্যে আমাদের পসার জমছিলো না? সমস্ত সায়েব খদ্দেরকে যাদু ক'রে ছিনিয়ে নিতো ও আমাদের বোকা বানিয়ে। আমাদের রোজগার করাই মুস্কিল ছিলো ও থাকলে। আচ্ছা হয়েছে? বহোৎ আচ্ছা!! কেতনা আদমিকো বরবাদ কবকে এক্ আওরাৎ কি জানমান বাঁচানে গিয়া—বুদ্দু, কাঁহেকো!!

জানালা দিয়ে জোসেফের ফেলে যাওয়া বন্দরের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল কলিমুদ্দিন। আর আমি দেখলাম অন্য এক বিস্ময়কর অস্বাভাবিক দৃশ্য। সারা দুনিয়াকে উপেক্ষা করা—বেপরোয়া, রুক্ষ-হৃদয়, মন হীন, চোপসানো মুখ—কলিমুদ্দিনের গর্ত গর্ত গাল বেয়ে তরল হীরের নদী নেমেছে—

ভিজে ভিজে চোখে অবা—ক হ'য়ে দেখলাম।

দুর্বল, অসতর্ক, বিরক্তিকর মুহূর্তে প্রায়ই মনে হয়েছে—আহা যদি আদার ব্যাপারী হতাম, তাহ'লে আর এমন জাহাজের খবর রাখতে হ'তো না! তাতেও সুখ ছিলো।

শ্মশান বৈরাগ্য আসা-অবসাদে, শহুরে জীবনের কৃত্রিমতা থেকে গ্রাম্য সরল নিরাড়ম্বর জীবনের সুখ, শান্তি, সৌন্দর্যের আকর্ষণের মতোই ক্ষণস্থায়ী সে চাওয়া। কারণ পরক্ষণেই মনে হয়েছে অভিজ্ঞতার জাহাজ হয়েছি যে। আর কিছু না হোক—। তার মূল্য? দেবে কে? দাসত্ব হ'লেও একাজে

যদি না আসতাম তো মন-মৌচাক এমন ক'রে কথা কাহিনী চরিত্রের মধুতে টই টই ক'রে উঠতে পেতো কি? কোথায় পেতাম এমন নতুন পটভূমির মধু? যার জন্য আমার সৃজনী শক্তি-মক্ষিরাণী গুন গুন ক'রে উঠেছে—।

মনে হ'য়েছে আদার ব্যাপারী হইনি ভালোই হয়েছে—।

তাহ'লে কি আর বেড়ো সায়েব আর বিকাশ ঘোষকে দেখতে পেতাম? কোনোদিন জানতাম না ওদের—। ভাদুড়ি, লিউইস্ বেলারী, মৈত্র, সমাদ্দার, ওপেন, রামচাঁদ, সকলে, সব্বাই ভিড় ক'রে এসেছে মানস রঙ্গমঞ্চের পাদ-পীঠের পেছনে অভিনয় শেষে সমবেত শিল্পীর দর্শকদের অভিবাদন করতে দাঁড়ানোর মতো—।

এদেরই মধ্যে পোশাকে, আশাকে একটা স্বাতন্ত্র্যের ট্রেড্ মার্কা নিয়ে বেড়ো সায়েব—। প্রথমদিন তো ভেবে বসেছিলাম পুলিশের লোক—।

সাদা রঙের পোশাকই নয় মাথার টুপিটা পর্যন্ত সাদার ওপর সাদা রঙের প্রলেপে প্রলেপে মোটা আর ভারি হয়ে যাওয়া সোলার টুপি।

সোলার টুপি সম্বন্ধে একটা চমৎকার কথা শুনেছিলাম—। সোলার তৈরী ব'লেই আমরা বলি সোলার টুপি ঃ সায়েবরাও বলে সোলার হ্যাট্। তারা কিন্তু অন্য অর্থে বলে, সূর্য অর্থ্যাৎ Sun এর বিশেষণ ক'রে বলে সোলার হ্যাট্—। বেড়ো সায়েবের সেই সার্জেণ্ট মার্কা টুপি আর সাইকেল চড়া সাদা দেহ-রেখা দূর থেকেও চিনিয়ে দেয়। কাছে এলে প্রথমেই নজরে পড়ে ঝুলে পড়া বুক পকেট। তাতে নানান খুপরি, আর প্রত্যেকটি খুপরিতে এক একটা কলম বা পেন্সিল। পাশ পকেটেও কতোকগুলো রঙিন পেন্সিল—।

দু'নম্বর ডকের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্। ভাঁজের পর ভাঁজ করা বিরাট এক কাগজে, লাল নীল দাগ দেয়া ঘরে ঘরে ওঁর এলাকার সমস্ত পার্টিকুলার্স নিখুঁতভাবে ছবি এঁকে এঁকে ছকা। একেবারে কর্মছত্র। হাউ হাউ করে রুক্ষ কথা বার্তা। চোয়াড়ে চেহারা আর ব্যবহার। অন্তরটা কিন্তু তেমনি অবিশ্বাস্য রকমের নরম তুলতুলে—। মুখে শাপ শাপান্ত, বাপ বাপান্ত এ পর্যন্ত, কাগজে কলমে প্রকৃত ক্ষতি কারো করেন না কখনই—। এসেই সেই জপতপ পার্টিকুলার্স্‌গুলো নিঃসীম নিষ্ঠার সঙ্গে এঁকে নিয়ে তারপর কথা। সমস্ত কিছু ঠিক ঠিক পেলেই খুশি, সুদৃশ্য সিগারেট কেস্ থেকে দ্বিতীয় পাকের [illegible] ভাণ্ডার মিক্সচার থেকে তৈরী ক'রে দেয়া Rationed দশটি সিগারেটের একটি মুখে লাগিয়ে চেয়ারটাকে সামনের দুপায়ে করে ঠেলে এনে কর্কশ কণ্ঠে কথা বলবেন আর হো হো ক'রে গুদামে ছাদে ফাটল ধরা হাসির দমকে দমকে সমস্ত সেকশনে তাঁর আগমন বার্তা ঘোষণা করবেন। গুদামে প্রবেশ করেই প্রথমেই হাঁক ডাক—।

—শেড্ ফোর ম্যান !

মাল কোঁচা দেয়া নিচের দিকটা ধুলোয় ধুলো-কাপড় আর ফিতে বাঁধা জুতো পরা টিপিকাল শেড্ ফোরম্যানকে খুব ব্যস্ততা দেখিয়ে দৌড়ের ভঙ্গিতে নামতে হবে চড়াই সিঁড়ি বেয়ে ওঁকে পার্টিকুলার্স দিতে। উনিও ভালোই জানেন, জানলা দিয়ে দেখতেও পান যে শেড ফোরম্যান ওঁর ডাক শুনে বিরক্তিতে মুখ কেমন কেমন করলেন, তারপর নেপথ্যে উপেক্ষা আর নিম্নপদস্থদের কাছে নিজের দুঃসাহস আর বাহাদুরী দেখানোর জন্যেই অতি ধীরভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চেয়ার থেকে উঠবেন এবং যেন কিছুই হয়নি, নিজের ইচ্ছেতেই

নিজের কাজেই বাইরে যাচ্ছেন এমন ভাব দেখিয়ে বেরিয়ে যাবেন। তারপরই বেড়ো সায়েবের দৃষ্টির আওতায় এসেই তাল পাল্টে যাবে। দ্রুততাল। শরীর ঝুঁকিয়ে, যেন একটু দৌড়ে আর ততোধিক হাঁপিয়ে হাজির হবেন সায়েবের সামনে। তারপর সেলাম। হ্যাঁ; সে একটা দেখার জিনিস বটে! আগা গোড়া সব সায়েবের মতো বেড়ো সায়েবও সমস্ত দেখবেন, বুঝবেন; একটু মৃদু হাসবেন হয়তো বাড়াবাড়ি দেখে। খুশি হবেন। তিনিও যে অমনিই করেন ওপর ওলার কাছে—।

তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন।

—জাহাজ কটা, ক্রেন কটা, ডেরিকের দরখাস্ত করেছে রাত্রের কাজের জন্যে—।

উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে, বলাই বাহুল্য, সায়েবের সেই বিরাট কাগজে ক্রেন ডেরিকের জন্যে বিশেষ রঙের ঘরকাটা জায়গায় উঠে গেলো—।

জাহাজের নাম?

এস্, এস্, সিটি অফ্ ব্রিষ্টল।

—ফাইভ্ ক্রেনস্, ফোর ডেরিকস্, টেন লাইটস্; অল নাইট্।

ওভার সাইডে অর্থ্যাৎ জাহাজের ওদিকে জলের দিক থেকে কিছু মাল খালাস হচ্ছে কিনা জানতে চাইবেন এবার—।

—হ্যাঁ স্যার, দুটো ডেরিক ড্রামস্ অয়েল নামাচ্ছে P. C. Boat-এ—।

—ওয়াগন কতো লোড করা হয়েছে? সেভেন? **Good! Shunting order issued? Good! How many wagon waiting at the Bar Line?**

—fourteen ? Christ! Make haste man! get the wagons placed! ততক্ষণে ওঁর কাগজে উঠে গেছে বার লাইনের ওয়াগনের সংখ্যা।

—Special Cargo আছে? Manifest দেখলাও! লক্‌ফাস্টে রাখা হচ্ছে তো ঠিক ঠিক?

—ঠিক হ্যায়! Be careful বড়া বাবু, wine Landing to-morrow at 9 A M. Know the procedure?

জাহাজ থেকে সোজা ওয়াগনে বোঝাই দিতে হবে মদের পেটি। ঐ নিয়ম।

সমস্ত ব্যবস্থা শেষ। Night order বইয়ে ছুটো একটা আদেশ লিখে দিয়ে চীৎকার ক'রে কথা বলতে বলতে হাটা শুরু ক'রে দেবেন বেড়ো সায়েব পরের গুদামের দিকে—। মিলিয়ে যাবেন। অতিরিক্ত কাজের আওয়াজে তার ভারি গলার মতোই মিলিয়ে যাবেন তিনি।

এক্সপোর্ট শেডে গেলেও ঐ। একটু অন্য ধরনের প্রশ্ন।

—S/S Warora? Five cranes three Derricks, ten lights with long cables. Till finished?

—Yes! overtime applied?

—4 to 7 P. M. O. T.?

—Hide gang booked?

চামড়া বা হাড় বোঝাইয়ের সময় বিশেষ ধরনের চামার শ্রমিক দল কাজ করবে—। তারাই Hide gang.

—How many chests tea in shed? 4000?

—How many wagons placed? 20? ঠিকতো বাবা? Discharge notice issued তো? Call for the

forwarding clerk! ফরওয়ার্ডিং ক্লার্ক অর্থাৎ রেলবাবু এসে দাঁড়ালেন—।

—wagons jammed হ'চ্ছে কেন? Do the খালাস quickly! ওঁর আবার কাজের মধ্যেও ইংরেজী, হিন্দী বাংলা মিশিয়ে কথা ব'লে অধস্তন কর্মচারীদের আনন্দ দেয়া স্বভাব।

আবার বললেন Get the D/N লাগাও immediately! Do you মালুম?

ইয়েস স্যার!

ভরা দুপুরে এইভাবে তেইশ, চব্বিশ করে আটাশ নম্বর শেডে গিয়েও ক্লান্ত হবেন না বেড়ো সায়েব—।

হেভী লিফ্ট ইয়ার্ড, যেখানে দুটনের নিচে ক্রেন্ নেই—সেখানেও হানা দেবেন নিয়ম ক'রে।

এক নম্বর ডকে থাকলে, সমস্ত শেড্ ঘুরে পাঁচ সাতের অফিসে গিয়ে বসার আগে কাটা দরজার কাঁচ কোঁচ শব্দ-তুলে খুলে দাঁড়িয়ে সকলকে সচকিত ক'রে হয়তো হাঁক ছাড়বেন কানাই!

কেরানী কানাই বাবু দৌড়ে আসবেন।

—Make the sheerleg booking বন্দোবস্ত at 7 A. M. to-morrow! ক্যানাডিয়ান ব্রঞ্জিন নামবে! Follow?

তারপর বস।।

দুপুরের দিকে আর কোনো সায়েবই এমন ক'রে খবর নেন না। অফিস থেকেই টেলিফোনে সমস্ত সেক্শনের খবর নিয়ে টেবলে পা তুলে দিয়ে ব'সে থাকেন আর সবাই। তিনটের পর কাজের মধ্যে ফাইল সই করা। তাও yes, No, allow এই রকম কয়েকটা শব্দ লিখবেন কষ্ট ক'রে

কেরানী বাবুদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের নোটের ওপর। কোনোটায় খুব জোর লেখা হ'লো তো—speak! বেড়ো সায়েব কিন্তু তা নন, নিজে কিছু করার তাড়না ওঁর সব সময়েই—। পাল্টা নোট দিয়ে দিলেন হয়তো ফাইলে নতুন কিছু একটা suggest ক'রে। ওসব ক'রেও ছুটি নেই—। প্রত্যেকটি শেডের পার্টিকুলার্স ছ'কে আনা নানা রঙের খোপ-খোপ সেই বিরাট কাগজ খানাকে আবার যত্ন ক'রে একটা বিশেষ ফাইলে রাখতে হবে—for future reference—। দরকার হবেনা জেনেও। কারণ আর যাই হোক ও কাগজের future reference হ'তে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি ;—সত্যি সত্যি—! ওঁর খেয়াল! না satisfaction of vanity? না শুধুই জিজ্ঞাসার চিহ্ন? সেইটেই একটা জিজ্ঞাসা।

এতোবড় পৃথিবীর তো মাত্র দশটা দিক। সেই পৃথিবীর তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষের কিন্তু লক্ষ লক্ষ দিক। এ'তো গেলো বেড়ো সায়েবের একটা আধটা দিকের কথা—। ওঁর অন্যান্য দিকের কিছু কিছু সরস গল্প শুনতে হয় তো বিকাশ ঘোষের কাছে বসতে হবে তাঁর লাঞ্চের পরে—। বেপরোয়া খেয়ে উনি যখন পরম পরিতৃপ্তিতে প্যান্টের পেটের ওপর দিকের তিনটে বোতাম খুলে দিয়ে এলিয়ে ব'সে হাঁপাবেন ঠিক সেই সময়, থট্স্ বি ফাউণ্ড। একথা সেকথা ক'রে প্রসঙ্গটির উত্থাপন। তারপর আপ্‌সে চলবে লম্বা টেপ্-রেকর্ড্। বিকাশ ঘোষ বেড়ো সায়েবের প্রিয় এ্যাসিটাণ্ট্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্।

—এমন স্ত্রীভক্ত-স্বামী হয়না,—হয়নি মশাই!

বিকাশদা নাটকীয় ভাবে গলার জোর দিয়ে প্রাচীন গ্রীক-সিটি-ষ্টেটের বক্তার পাঁচশো শ্রোতার কাছে বলার মতো উঁচু কণ্ঠে বক্তৃতা শুরু ক'রে দেবেন।

তবু স্ত্রী থাকেনা! আমাদের হ'লে—চরণামৃত খেতো মশাই! বিকাশদার সলিলোকি থেকে গল্প শুরু হলো—।

সত্যিই অতিরিক্ত একনিষ্ঠ ভক্তি বোধহয় ভালো নয়—। বিশেষ ক'রে ওদের। স্ত্রীরা তাতে নাকি আরো যথেচ্ছ হবার সুযোগ পায়—। বেড়ো সায়েবেরও তাই হয়েছিলো। ডুমাইন্ এ:ভন্যা-কোয়ার্টার্সের ওঁর পাশের ফ্লাটে থাকতেন—ইন্সপেক্টর ইসমাইল—। চোখে সুর্মা লাগানো ছ'ফুটী পাঞ্জাবী।

বেড়ো সায়েবের অতি বিশ্বাস আর ভালোমানুষির সুযোগ ওঁর স্ত্রী, ইসমাইল, না দুজনেই ভালো ভাবে নিয়ে কে যে কাকে জালে জড়ালো বুঝতে দেয়ার আগেই একদিন বাড়ি ফিরে বেড়ো সায়েব স্ত্রীকে দেখতে পেলেন না—। পাশের ইসমাইলের ফ্লাটও অন্ধকার। হয়তো সিনেমা টিনেমা গিয়ে থাকবে ওরা—। বেড়ো সায়েব ব্যাপারটাতে গুরুত্ব আরোপ করলেন না—। কিন্তু রাত দশটার পরে গুরুত্ব আরোপ করতেই হ'লো—। তখন গুরুত্বে গুরুত্বেও কিছু হয় না। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে ইসমাইলকেও আর দেখা গেলো না—। পরে আস্তে আস্তে খবর ছড়ালো। ইসমাইল মিসেস বেড়োকে ইলোপ করেছে—।

মিঃ বেড়োর বন্ধুরা তো বললেন, মিসেস বেড়োই ইসমাইলকে নিয়ে উধাও হয়েছেন। তাঁর ইদানীন্তন ভাবভঙ্গী নাকি এ'কথার যাথার্থ্য প্রমাণে কসুর করেনা—।

এ সমস্ত কাহিনী চাপাই ছিলো—। বিকাশ ঘোষ তা থাকতে দেননি।

বেড়ো সায়েব তো চাপা মানুষ। আসল ব্যাপার বড় কেউ জানতে পারেনি, সমসাময়িক বন্ধুরা ছাড়া।

তাঁর সেই সব বন্ধুদের মুখে কিছু কিছু শোনা; আর গত যুদ্ধে ফিপটিনাইন পোর্ট অপারেটিং ইউনিটের ক্যাপ্টেন হ'য়ে সামরিক কাজে বসরা পোর্টে কর্মরত অবস্থায় এক কুয়াশাঘন সন্ধ্যায় হুইস্কি-মত্ত অসতর্কতায় সেকেণ্ড্ লেফ্‌টেনাণ্ট বিকাশ ঘোষকে তিনি মনের পাত্র উজাড় ক'রে বাড়িয়ে ধ'রেছিলেন; —একবার মাত্র। সেই যা—।

—তবে হ্যাঁ ফেথ্‌ফুল্ হ্যাসব্যাণ্ড্ বটে!

বসরায় তো ওঁরা একটা প্রবাদই তৈরী ক'রে ফেলেছিলেন—

'থোড়া দুধ আউর থোড়া চা, ইরাকী লেড়কী বহুৎ আচ্ছা!' একটু দুধ আর চায়ের বিনিময়ে নিজেদের বিকিয়ে দিতো ওখানকার মেয়েরা। এতো দরিদ্র আর সস্তা মানুষ। যুদ্ধে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো হয়তো আরো ভেঙ্গে গিয়েছিলো—। রেমার্কের বইয়ের বর্ণনার মতো সত্য—। লাঞ্চের পর বিকাশদার সবচেয়ে জমাটি গল্পে ডুবে যেতাম আমার শিক্ষানবিশী সময়ে—। উনি শিস্ দিতেন মাঝে মাঝে। ভালো অভিনেতা, অভিনয়ের gesture, posture, tablot তো প্রতি মুহূর্তে, কথায় কথায়—। কথা বলার ভঙ্গীর নাটকীয়তার কথা আগেই বলেছি। আর নকল-বিদ্যে—। কে কেমন ক'রে কথা বলে, চলে ফেরে; মুখভঙ্গী থেকে সমস্ত কিছু নকল ক'রে দেখিয়ে অফিসে হাসির হট্টগোল তুলে দিতেন উনি।

—হ্যাঁ মশাই, রেমার্কের বইয়ের মতো, হুবহু—! বসরায় আমাদের ক্যাম্পে ইরাকী মেয়েরা টুকিটাকি জিনিস পত্র বেচতে আসতো দিনে। সেইখানেই ব্যবস্থা করতো রাতে নিজেদেরই বেচার—। বললে বিশ্বাস করবেন না, Ration 'এর দোকানের লাইনের মতো এক এক সন্ধ্যায় কোনো বিশেষ

মেয়ের জন্যে ক্যাম্পের কোনো বিশেষ ঘরের বাইরে লাইন লেগে যেতো পোর্টইউনিটের আজকে-সাধু নানা জাতের পার্সোনেলের। আর কতো অল্পে সন্তুষ্ট ইরাকী মেয়েরা।

কিছু রেশন, কিছু পয়সা দিলেই হাসিমুখে চলে যেতো আবার পরের দিন আসার অঙ্গীকার ক'রে—।

—জীবনে কম বদমাইশি করেছি! বিকাশদা হঠাৎ অন্যমনস্ক হ'য়ে, হয়তো পুরোন সে সব কথা ভাবতে ভাবতে বলতেন—

মদ খেয়েছি যথেচ্ছ। যুদ্ধ শেষে বাড়ি ফিরে মাকে প্রণাম আর গঙ্গাস্নান ক'রে সেই যে সাধু হলাম তো হলামই—!

—ওখানে আমাদের সেকি ভয়! রোজ রক্ত পরীক্ষা আর ইন্‌জেকশন্। রোজ! কিন্তু ফেথ্‌ফুল্ বটে মশাই বেড়ো সায়েব! ওসবদিকে ফিরেই চাইতো না। নিজের মনিব্যাগের মধ্যে রাখা স্ত্রীর ছবিটা দিনে বার কয়েক ক'রে দেখে মশাই টানা তিন বছর চালিয়ে দিলে—! আশ্চর্য!—বিকাশদার তখনকার মুখভঙ্গী দেখে যে কেউ মনে করতে পারতো একটা অসম্ভব কিছু বেড়ো সায়েব—।

—একবার তো দুষ্টু-শরোমণি Capt Barma মিলিটারী পোশাক পরিয়ে ক্যাম্পের মধ্যেই এক ইরাকী সুন্দরীকে নিয়ে এসে নিয়মভঙ্গের চূড়ান্ত ক'রেও বেড়ো সায়েবকে টলাতে পারেনি। সাচ্চা আদমী একেই বলে। খাঁটি সোনা মশাই! তাব'লে মশাই সবাই পারে? প্রথম বছর যখন সায়গনে গেলাম পোর্ট অপারেটিং ইউনিটের সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট হয়ে, এক বছর বাড়ি আসিনি। মিসেস্'এর মুখখানা তো ভুলে আলুভাতে হয়ে গেছে। আর, এক প্যাকেট সিগারেট একটিন কনডেন্সড্ মিল্কের বিনিময়ে

ভালো ভালো বংশের কাঁচা হলুদ রঙের সায়গন-সুন্দরী যদি আপনার ঘরে এসে বিছানার অংশ নেয় তো ঠিক থাকা যায়? বলুন মিঃ ঘোষাল, ঠিক থাকা যায়? এ'কথার সঙ্গে সঙ্গে অতি উৎসাহে আমার কাঁধে একটা প্রচণ্ড চাপ্পড় প'ড়ে দম আটকে দেবার উপক্রম হয়—।

চরিত্রটা সুযোগহীনতার দড়ি দিয়েই না বাঁধা! সুযোগের ছাড় একবার পেলে বাঁধা গরু ছাড় পাওয়ার মতো হবে না, বলুন? তাহ'লে দেখুন! fifty one years—। জামার বোতাম খুলে বিশাল বক্ষ উন্মুক্ত ক'রে ফুলিয়ে গরিলার মতো কয়েকটা চাপ্পড় মেরে বললেন—ক্ষতি কী হয়েছে? যথেষ্ট, যথেষ্ট, উপভোগ, যাকে বলে অত্যাচার উচ্ছৃঙ্খলতা করা গেছে। হয়েছে কী? বুড়োআঙুল তুলে আবার বললেন কচু—! পরক্ষণেই ইংরিজী রীতিতে ফ্রর-র-র ক'রে শিস্ দিয়ে গাইলেন ইংরিজী গানেরই একটা কলি—। মেজাজটাই আসল! বুঝলেন মিঃ ঘোষাল! কিছুতেই কিছু হয় না-E-a-t dr-ink a-nd be me-rry! গানের সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে টক্কর দিয়ে চললেন ফক্সটর্টের—।

ঐ মেজাজের জন্যেই আজ এই পজিশন। তা'হলে বিদ্যে মশাই সেই ক্লাস ফাইভ! ভাগ্যিস যুদ্ধ লেগেছিলো—! চ'লে গেলাম জীবন বিপন্ন করে, তবেই না আজ এই উন্নতি! তা না হ'লে আপনারা য়ুনিভার্সিটির যেসব জুয়েল ছেলেরা আসছেন—তাঁদের সঙ্গে সামনে ব'সে কথা বলার যোগ্যতা আছে আমার? নয় কি! সত্যি বলুন? মুখ ওপর দিকে তুলে হা হা ক'রে হেসে চললেন বিকাশ ঘোষ।

ওঁর অকপট ভাষণে অবাক হবার নেই। সকলেই জানে যে! অভিজ্ঞতা আর দেখা শোনা—এক কথায় সুপারভিশনে কাজ

চালিয়ে যান বিকাশদা—। দিনের দিন কাজ ওঁর ভাষায় দিনগত পাপক্ষয়—। কিছু লিখতে হলেই মাথায় হাইড্রোজেন বোমা পড়ে। কেবল সারাদিনের কাজের বিবরণ অবশ্য-কর্তব্য ডায়েরী লেখাটা সড়গড় করে রেখেছেন কার ক'রে দেয়া ড্রাফট্ থেকে—। খাতা টেনে নিয়ে সরসর করে বাঁধা ভাষায় লিখে যান—Took over charge from Mr. I atta and made over to Mr. Ghosal at 1400 hrs, on date with office keys etc...

তাতেই কি একটি ছোট্ট পকেট ডিক্সনারী ড্রয়ারে না রেখে নিশ্চিন্ত? বানানে হোঁচট পদে পদে। শব্দে শব্দে, অক্ষরে অক্ষরে—। কথায় বার্তায় ভাবে ভঙ্গীতে পুষিয়ে দেন—। সেবার আহা, বেচারী বড় দুঃখ করেছিলেন—। ন'নম্বর বার্থে City of Bristol জাহাজে ফলকা ভর্তি পাটের গাঁটরিতে আগুন লাগবি তো লাগ, বিকাশদার ডিউটির মধ্যে—। কে দয়া ক'রে বিড়ির শেষাংশটুকু জাহাজকে দান ক'রে ধন্য করেছেন—! শুধু প্রলয় কাণ্ড নয়। মর্মান্তিক দুর্ঘটনাও—ক্যাপ্টেনের জীবনহানি—। হতভাগ্য ক্যাপ্টেন জোনস্—! বিদেশে বিভূঁইয়ে কর্তব্যের-খাতিরে বেঘোরে প্রাণটা দিয়ে দিলো—অতিউত্তেজনায় আর দায়িত্বের ভারে—। পাটের গাঁটের আগুন ঠিক কি রকম জ্বলছে জানা না গেলেও, বোঝা গেলো ভেতরে ভেতরে চাপা গাঁটরিতে আগুন গুমিয়ে গুমিয়ে ধিকি ধিকি জ্বলছে; আর ধোঁয়া—। সমস্ত ডক অন্ধকার করা-ধোঁয়া।

অতিরিক্ত উত্তেজনা ভয় হতাশা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় ক্যাপ্টেন রেলিঙ্ পেরিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে এমন ঝুঁকে প'ড়ে হ্যাচের মধ্যের আগুনের অবস্থা আর জাহাজখানা

বাঁচবে কিনা জানতে গেলো যে, টাল সামলাতে না পেরে সোজা হুমড়ি খেয়ে পড়ল আগুন গনগনে-হ্যাচের মধ্যে—। আর উঠল না। ওঠানো গেলোনা। কয়েকঘণ্টা জাহাজের শুধু ওপর থেকেই না, গা ফুটো ক'রে পোর্ট্ ফায়ার বিগ্রেড্ আর ক্যালক্যাটা ফায়ার বিগ্রেডের সমবেত চেষ্টায় পাঁচ ঘণ্টায় আগুন নিভলো—।

উদ্ধারকারীরা জোনস'এর যাকে বলে, রোষ্ট হয়ে যাওয়া দেহটা বার করে আনলো অনেক কষ্টে কিন্তু সনাক্তকরণ শক্ত হলো। ঐ দেহটাই ক্যাপ্টেন জোনস-এর ? তাঁর জাহাজের অফিসারদের চোখে সন্দেহ—। আগুনে আগুনে আদিম যুগে ঝলসে যাওয়া মাংসের মতো, পোড়া ঝলসানো কালিমাখা একটা দেহ। বেচারী জোনস্! ওর স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা হয়তো তখন ইংল্যাণ্ডের কোনো শায়ারের ক্ষুদে বাড়িতে নিশ্চিন্ত নিদ্রামগ্ন। কাল কেব্‌ল-গ্রাম্ যাবে শেলের মতো—।

ঐ দুর্ঘটনায় বিকাশ ঘোষকে দেখার মতো—। দৌড়ো-দৌড়ি ক'রে ফায়ার বিগ্রেডের সাহায্যে জল কাদা মেখে, হাঁটু পর্যন্ত ট্রাউজার গুটিয়ে এক আওয়ারা-কাণ্ড—। চেষ্টা আন্তরিকতার ক্রটি তো দূরের কথা—ষোলো আনার ওপর আরো ষোলো আনা। তবু মন পায়না। দুর্মুখ ডেপুটি ডক্‌স্ ম্যানেজার চ্যাটার্জি সায়েবকে ঘটনা স্থলে ইংরিজীতে ব্যাপারটা বোঝাতে গিয়ে ধমকই নয়—অশ্লীল গালাগালি—। ইংরিজী ভুলই না হয় হয়েছে, তাই বলে—! মিঃ চ্যাটার্জি ওঁর কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বললেন —ফের যদি ইংরিজীতে আমার সঙ্গে কথা বলো তো তোমার—!

এর পরেই একটা অমুদ্রনীয় অশ্লীল গালাগাল। ঘটনা-স্থল থেকে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে ফিরে চার্জ বুঝিয়ে দেবার সময়

অতি দুঃখের সঙ্গেই বলেছিলেন—দেখলেন মশাই! আমি একজন বাহান্ন বছরের বুড়ো আমাকে বলে কিনা—! তার পরেই সেই অমুদ্রনীয় গালগালটির পুনরুক্তি করলেন, দ্বিরুক্তি না ক'রে—।

তারপরই কি নিস্তার আছে! ঐ সমস্ত রিপোর্ট লিখতে হবে। টেলিফোনে অল-কনসার্নড্ মেসেজ্ পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে তার খসড়া ক'রে দিয়ে। নিস্তার আছে? ভবিষ্যতে জয়েন্ট এনকোয়ারীর নানা ফ্যাকড়ার জবাব দিতে হবে না? তখন? তখন অন্যের সাহায্যে আর কি। তখন ভাবনা নেই অবশ্য। উনি বলেন—তখন আপনারা আছেন।

—আর আছে আমার মাষ্টার মশাই!

ওঁর ছেলের বয়সী A. D. M. G. মিঃ সমীর মুখার্জি ওঁর মাষ্টার মশাই। চিঠি ড্রাফ্ট্ ক'রে দেন আইন মাফিক। উপদেশ পরামর্শ দেন গণ্ডগোল বাধলে—।

আবার বভিন সায়েব কি বললে জানেন! বলে কিনা—You are really an actor! কেন, আমি কি এখানে ডিউটি না করে অভিনয় করি—।

চুপ করে থাকার চেষ্টা করেও কৃতকার্য হওয়া গেলনা। কেন আপনি তো একটিং করেন! ব'লে হাসলাম—।

বিকাশদার পানতুয়া চোখ লেডিকেনি হয়ে গেলো—।

—কী বললেন?

মানে মাঝে মাঝে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট না থাকলে ওঁর পোষ্ট'এ একটিং—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একটিনি, করেন না? বভিন সায়েব অবশ্য রহস্য ক'রে বলেছেন—!

—তাই বলুন—। আবার হো হো করে হেসে উঠলেন সকলের বিকাশদা। —সেদিন বলে কি জানেন? বলে আমাকে নাকি প্রায়

রাত্রে চৌরঙ্গীতে দেখতে পায় ঘোরাঘুরি করতে। আমিও ছাড়ব কেন। জোরের সঙ্গে বলেছি—Why not? I'm still young? শুনে খুব খুশি। মনের মতো কথা শুনেছে কিনা। ঝুটা দাঁত বার ক'রে সাচ্চা হাসি হেসে আবার বললেন একদিন গেছে মশায়। চৌরঙ্গী—ময়দান—রেড্‌রোডে ঘুর ঘুর করার দিন। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে শৃঙ্গাররত যুগলকে দেখে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়ানোর দিন। ও! উনি সত্যি সত্যি যেন কোন যুগলকে দেখছেন এমন ভাবে পকেটে হাত আর দাঁতে দাঁত চেপে অদ্ভুত ভঙ্গিতে আমারই দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ পিট-পিট চোখে।

Red Tapism কথার কতো বিচিত্র-রূপ, কতো ব্যঞ্জনা দ্যোতনা হ'তে পারে, তার চূড়ান্ত পরিচয় পেয়েছিলাম ঐ বিকাশ ঘোষেরই ব্যবহারে। ছকের বাইরে কিছু করতে হলেই ভদ্রলোকের ছক্কা পাঞ্জা খাওয়ার অবস্থা—।

তেইশ নম্বরের শেডক্লার্ক দ্বিজেন চক্রবর্তী অন্যমনস্কতায় কী ক'রে কে জানে, পা পিছলে ডকের জলে পড়ে গিয়েছিলো সেবার। সহকর্মীরা সাহায্য করার আগেই সাঁতরে নিজেই উঠে প'ড়েছিলো। একে শীতকাল, তায় বেশ রাত। ছুটি তো চাই। ঐ ভিজে অবস্থায় তো আর কাজ করা চলে না। সকলে ওকে এ, এস্ বিকাশ ঘোষের কাছে নিয়ে গেলো তাড়াতাড়ি। একজন গিয়ে রিপোর্ট দিলো লজ্জা পাওয়া-দ্বিজেনকে বাইরে রেখে—। বলো কি? জলে প'ড়ে গেছে দ্বিজেন? দাঁড়াও এখুনি ব্যবস্থা করছি। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে টেলিফোন তুলে নিলেন—Skin Diver আনাচ্ছি। তলিয়ে গেছে?

—না স্যার, ও নিজেই সাঁতরে উঠে এসেছে। এখন ওকে আজকের মতো ছুটি দিন।

এ্যাঁ ? নিজেই উঠেছে ? দাঁড়াও আগে রিপোর্টটা নিই পুরো--

ডকের জলে মালপত্র বা কিছু প'ড়ে গেলে একটা ছাপানো ফরমে রিপোর্ট ভর্তি করতে হয় আর অল কনসার্নড্ টেলিফোন-বার্তা পাঠাতে হয়। ছাপানো ফরমের নানা কলম।

একটা ফরম টেনে নিয়ে কলম ভর্তি করে চললেন—Berth and vessel's name লেখার পর ফুটকিচিহ্নাঙ্কিত ফাঁকা জায়গাটা ভর্তি হলো—। এর পর কলাম Cargo dropped ……। ওর পাশে উনি ভর্তি করলেন Shed clerk Dwijen Chakrabarty লিখে—।

তারপরই থমকে দাঁড়ালেন—।

When Skin diver callėd for ……

এর পরে কী লিখবেন ?

—এখন কী করি বলোতো ? Skin diver যে ডাকাই হয়নি—। এটা বে-আইনী। আহা তুমি নিজে জল থেকে উঠে আসতে গেলে কেন ? প্রসিডিওর অনুযায়ী ডুবুরী এসে মালটাকে তোলে। এখন কি লিখি ? নতুন কেসের ফরমই বা পাই কোথায় ? আঃ ! তুমি উঠে আসতে গেলে কেন ? Skin diver এসে তো তোমায় তুলবে।

সকলের চক্ষুস্থির। বলেন কি ভদ্রলোক ? পাগল নয়তো ? একি অফিসার রে বাবা ! এ যে হুক্ সাহেবকেও হার মানালো।

সে না হয় বিদেশী ছিলো—। ……

যুদ্ধের সময় পোর্ট এ, আর, পি তে এয়ার রে'ড্ ওয়ার্ডেন ভর্তি করার ভার পড়েছিলো একবার কর্নেল হুকের ওপর। উনি তখন সদ্য স্কটল্যাণ্ড থেকে এসেছেন ভারতবর্ষে। ওঁর ওপর নির্দেশ

ছিলো Matriculateদের নেয়ার—। প্রার্থীরা সারবন্দী A. R. P. হেডকোয়ার্টাসে ফেয়ার-ওয়েদার হাউসের বড় বারান্দায় বেঞ্চে ব'সে। একজন একজন ক'রে ডাকা হচ্ছে। ঘরে শুধুমাত্র হুক্ সায়েব আর একজন কেরানী—। প্রথম প্রার্থীর ডাক পড়তেই সে লাফিয়ে ঘরে ঢুকে সেলাম করে দাঁড়ালো—।

—What's your name ?

নাম বলল প্রার্থী—।

—Are you a Matriculate ?

—Yes Sir।

ওর দরখাস্তখানার ওপর লাল পেন্সিল দিয়ে লিখলেন হুক্ সায়েব,—Approved.

ইংগিতে সে বাইরে গেলো পরের জনকে ডেকে দিয়ে—।

দ্বিতীয় প্রার্থীর প্রবেশ—। আর হুক সায়েবের প্রশ্ন—What's your name ?

বলা হ'লো—।

—Are you a Matriculate ?

—I have passed the Intermediate Examination Sir.

আর যায় কোথায়। টেব্‌ল চাপ্‌ড়ে ভেঙ্গে ফেলার যোগাড় ক'রে হাউ হাউ ক'রে উঠলেন হুক্ সায়েব—I want to know whether you are Matriculate or not ? সদ্য Albion's shore পরিত্যাগ করা-হুক্ সায়েব জানবেন কি করে Matriculationএর পর I. A. পাশ করতে হয়।

ছেলেটিই বা তার বিদ্যের ছাপ ছাড়বে কেন ? সে আবার বলল যে সে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ।

—All right you may go।

ওর দরখাস্তের উপর আরো বড় বড় ক'রে লাল পেন্সিলে লিখে দিলেন হুক্ সায়েব Not approved। Non Matriculate সেই হুক্ সায়েবকে হার মানিয়ে দিলেন দেশের মানুষ বিকাশ ঘোষ।

বেচারী বিকাশ ঘোষেরও দোষ নেই। বিদ্যে বুদ্ধি কিছুই নেই। সব সময় ভয়, ঐ বুঝি ভুল করলেন; বেআইনী কিছু ক'রে চাকরি টলমলিয়ে দিলেন। আইনের খাতিরেই যা—।

সেই বিকাশদা কাল রিটায়ার ক'রে গেলেন। আর হাসি নেই। চোখ বেয়ে জল।

সিদ্ধি খেয়ে ঝোঁকের মাথায় বিজয়াদশমীর রাতে যেমন খুব চেপে ধ'রে আলিঙ্গন ক'রে পরের দিন বুকে ব্যথার ব্যবস্থা করা হয়, তেমনি জোরে বুকে চেপে ধরলেন বিকাশদা বিদায় নিতে এসে—। তার চেয়েও জোরে।

—"স্বপ্ন আমার জোনাকি"—

সে জোনাকি, এ প্রবাসে না হয় তুমিই; কিন্তু স্বপ্ন আমার কে? সে কী 'দীপ্ত প্রাণের মণিকা'? এই ভেবে ভেবে গত কয়েকটা রাতের রঙ ফিকে ক'রে দিয়েছি। রাগ কোরোনা! আর যাই করি না কেন, তোমার কাছে কখনোও কিছু গোপন করিনি, সেইখানেই আমি সচ্চিদানন্দ না হ'লেও, মুক্ত,—বিবেক-দংশন-শূন্য। আমার ধারনা তোমাকে তো ব'লেছি—মানুষ যখন শিব টিব কিছু একটা নয় তখন—বিশেষ ক'রে তোমার আমার সম্পর্ক যেখানে, সেখানে মনে আসা কোনো অন্যায়কেও

গোপন করলেই অসার্থক হ'লো সম্পর্ক আর তার আদর্শ। পবিত্রতার চাঁদ ম্লান কলঙ্কিতই নয়, হ'লো রাহুগ্রস্ত—। তাই অভয় পেলাম কিনা না জেনেও আমার অকপট আত্মউন্মোচনে মুক্তির চেষ্টা—।

—স্বপ্ন আমার জোনাকি না হয় হ'লো, কিন্তু স্বপ্না আমার কি? কতো কতো রাত ফিকে ক'রে দিয়েছি এই ভেবে। আকাশের পুব-মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হয়তো লজ্জায় ফেলে দিয়েছি তাকে। লাল হয়ে উঠেছে সে ভোর বেলা—। আর এ কাজটি নিজের ঘরে করিনি—রাত ডিউটিতে—।

ডিউটিতে রাতে ঘুমোনোর ব্যবস্থার কথা মনে আছে তো? পাশের ঘরে টেব্‌লে নিজের দৈর্ঘ্য মাপার কথা পিওনকে দিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিয়ে? মনে আছে?

সে ব্যবস্থা ঠিকই আছে এখনো, তবে তার সদ্ব্যবহার করা গেলো না এই দুঃখ। কারণ কয়েকটা ঝামেলা। চুরির ঝামেলাটাই প্রধান—। চুরির প্রতিযোগিতায় নাকি কোলকাতা বন্দর অপ্রতিদ্বন্দ্বী—। বিরাট এক আন্তঃপ্রাদেশিক দল নাকি সুপরিকল্পিত ভাবে ঐ কার্যে লিপ্ত। এর ওপর আছে নানা জাতের স্মাগলিঙ্‌। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে চা চুরি, আমদানী দ্রব্যের কুলিন-বিচার নেই—। Inter caste, inter provincial' এ থেমে না থেকে international এর পর্যায়ে গেছে এর গতিবিধি—। কোনো মূল্যবান জিনিস জাহাজ থেকে নামলো তো রক্ষে নেই—। পেটিতে হয়তো রয়েছে ঘড়ি কিংবা কলম। সঙ্গে সঙ্গে পোর্টারদের দলে ঢুকে থাকা সেই সব দলের লোকের চোখে চোখে ইশারা হ'য়ে গেলো। আর মাথায় ক'রে নিয়ে দলীয় পোর্টার এমন যত্নের সঙ্গে পেটিটিকে ফেললো যাতে পেটিটা

অংশত ভেঙ্গে চুরে যায়। তারপরেই বেশ কয়েকদিন বিশেষ বিশেষ জায়গায় খুব সস্তায় ভালো নামী-দামী ঘড়ি পেন কিনতে পাওয়া যাবে না এমন কথা জোর ক'রে বলা মুশকিল—।

এবারের ব্যাপারটা কিন্তু চা চুরি। পুকুরচুরি শোনা ছিলো। দেখলাম বাগান অর্থাৎ চা বাগান চুরি। পুলিশ পেয়াদা সমস্ত মোতায়েন। গুদাম বন্ধ; হঠাৎ দেখা গেলো গুদামের একটা দরজা খোলা। দেখা নয় আবিষ্কার—। পরের দিন সকালে দরজা খোলা আবিষ্কারের ব্যাপারে জমাদার বা শেডফোরম্যানরা টমাস এডিসন, হাম্ফ্রি ডেভী, স্কট, লিভিংষ্টোনের সমতুল্য—। তারপর আর কি, রাতে সংবাদ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে সেপাই নিয়ে গুদাম তল্লাসী করতে যেতে হবে টর্চের সার্চলাইট ফেলে ফেলে। শুধু চা কখনও হয়না চা'এর সঙ্গে 'টা' অবশ্যম্ভাবী ব'লেই বোধ হয় শুধু চায়ের পেটিই নয়, লক্‌ফাস্টের জাল কেটে কিংবা তালা ভেঙ্গে মূল্যবান জিনিস পত্র পরম শান্তিতে—শান্তির প্রতীক পায়রার মতোই উড়ে গিয়ে থাকে—। যাবার রাস্তা কিন্তু বাউণ্ডারী ওয়াল বেয়ে—যাকে তোমরা সোজা ভাষায় 'scaling the wall' ব'লে থাকো—। এরপর পুলিশ রিপোর্টে হাঙ্গামা। পুলিশ যদি আবার কাজ দেখানো আর কেস দেয়ার তাগিদে গেটের কাছাকাছি শীতে ঘুমুতে না পারা কোনো নির্দোষ ভিখিরীকে ধ'রে এনে দেয় তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও তদন্তের জন্যেও চার্জ্জশীট ক'রে পাঠাতে হবে। এবং শেষে ডায়েরীতে সমস্ত লিখে আবার সেই ত্রাণকর্তা, সর্বদায়িত্বহরা-অলকনসার্ন্ড মেসেজ লিখে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বেস। ক্ষতি পোর্টকমিশনারস্-এর হ'লো না, তার ব্যবস্থা করলাম, চোরও ঠিক ধরা পড়লনা, যার মাল গেলো তারও ক্ষতি নয়, এমন কি আমার বিশ্বাস ইনসিওর করা সত্ত্বেও ইন্সিওর কোম্পানীও কোথা দিয়ে, কি ক'রে যেন

পুষিয়ে নেবে ; মাঝ থেকে আমার হয়রানি—। সে যাক। সে না হয় গেলো। কিন্তু রবিবার গেলে চলবে ? চলবেই—। আজকাল আমার রবিবারটা কাকের কাছে পাকা বেলের মতোই, ছুটিই নেই—। নিজের কথা বিচার ক'রে দেখলে 'বেল পাকলে কাকের কি' নয়। কাকের অনেক কিছুই--।

রবিবারটা আমার চাই—। শনি রবি আমাদের থিয়েটার একাডেমির ফুলবেঞ্চ অধিবেশন আর ফুলড্রেস আড্ডা—। স্বপ্নারা সেই সপ্তাহ থেকে নিয়মিত আসছে—। প্রায় দু'মাস কেটে গেছে, অনেক জল ব'য়ে গিয়েছে গঙ্গায়, আর তারপর থেকে অনেক জাহাজ ছেড়ে গেছে আর পৌঁছেচে—। আমাদের নাটক এগিয়ে গেছে অনেকদূর। শুধু আমিই পড়েছি পেছিয়ে—! এই ঘৃণ্য জঘন্য কাজের জন্যে। তবে এ রবিবার রাতপাল্লার পরের-বিশ্রামের রবিবার। বেল পাকলেও কাকের অনেক কিছুই নয় ? বিকেলের ডিউটিতে যেতে না পারলেও সকালের ডিউটিতে নিয়মিত একাডেমি যাই, আর রাত, ডিউটিতে একবার করে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আসি কাজে আসার আগে—। গত দু'দিনই স্বপ্না আর মিসেস ভাদুড়ি একটু সময়, আর একটু কষ্ট ক'রে আমাকে ডিউটিতে পৌঁছে দিয়ে গেছেন মিসেস ভাদুড়ির নিজের সারথ্যে—! ডকের মধ্যে আমায় ছেড়ে দিয়ে দুঃখ করেছে স্বপ্না—।

—আপনার জন্যে করুণা হচ্ছে মিঃ ঘোষাল ! আমরা কোথায় ধীরে সুস্থে নরম-গরম বিছানায় এলিয়ে পড়ব, আর আপনি এই ডিসেম্বরের শীতে—ভাবতেও কেমন লাগে--। এ চাকরি আপনি কেন নিতে গেলেন ? যাবার সময় কেন জানিনা, মনে হ'লো চোখ ছল ছল ক'রে উঠল স্বপ্নার—। সকলকে এড়িয়ে শুধু আমাকে জানিয়েই যেন আমার দিকে চাইল সে ঐ চোখে--। ওদের গাড়ির W. B. A. 'এর পরের চার সংখ্যার

নাম্বার প্লেটটা ছোট আলোর নীচে কুয়াশা-কুয়াশা রাতে ঝাপসা হবো-হবো সময় মনে হ'লো চীৎকার ক'রে দাঁড়াতে বলি আর এক্ষুনি ইস্তিফা দিই চাকরিতে—। কতো রাতে মনে হ'য়েছে, তোমরা, যারা প্রতি রাতে ঘুমুতে পাও, তারা সত্যিই ভাগ্য করেছ—। পরদিন সকালে তপেনকে চার্জ বুঝিয়ে দেবার সময় বলছিলাম আর কি—যাক বাবা চাকরিটা খুব বেঁচে গেছে এ যাত্রায়। Narrowly escaped! জিজ্ঞাসা জ্বল জ্বল ক'রে উঠল তপেনের চোখে—।

—কাল রাতে ঐ অবস্থায়, তোমার মতো হ'লে নির্ঘাত চাকরি ছেড়ে ওদের গাড়িতে চড়ে বসতাম।

বলো কী? চাকরি বাঁচা নয়তো কী? মুখের চেহারা পাল্‌টে গেলো ওর, হাসি জ্বলে উঠল দাউ দাউ ক'রে—!

রবিবার এসে গেল অবশেষে—। যতোই কেন দেরি ক'রে সবার শেষে আসুক,— তবু সে আসেই—। অফিসে লেটের মতো বেশ দেরি ক'রে আসার লজ্জায় লাল হ'য়ে দেখা দিল রবিবার পূবদিক থেকে। তপেন দত্তও—। চার্জ বুঝিয়ে দিয়েই দৌড়—। অন্য কিছু নয় ট্যাক্সি—।

সারাদিনটা ম্যাজমেজে, ঘুম ঘুম—। বিকেল হ'তেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে আমার 'দিগ্বিদিক' নাটকের মহড়ায় থিয়েটার একাডেমিতে। এতো আগে এলাম! প্রায় কেউ নেই—। আছে। সকলের চেয়ে বেশি আছে—।

—আপনি? একা?

স্বপ্নাকে ওফেলিয়ার মতো বাগানে বেড়াতে দেখে ঐ ধরনের একটা ভাব হ'লো আমার—।

—হ্যাঁ, বাবার আজ কোথায় যেন পার্টি। রোটারীতে বোধ হয়। আসতে পারলেন না। আর সুপ্রভাদি প্রদ্যোতবাবুর সঙ্গে চৌরঙ্গীর দিকে গেলেন। ভাবলাম, আজ রবিবার, আপনি আগেই আসবেন, তাই—মাটিতে যেন পরম আশ্চর্য দর্শনীয় কিছু দেখে নীচু দিকে চাইল স্বপ্না! বেশ লজ্জা—। লাল লজ্জা—। কৈফিয়তটা যেন জুতসই হ'য়েছে। তবু। কত সরল ও! সর্বাঙ্গজোড়া কিশোরী-সারল্য—। ভালো লাগবেই, তোমারও লাগতো, ব'লে দিলাম—।

—এখনও বিশেষ কেউ নেই। চলুন একটু বেড়িয়ে আসি লেকের দিকে—।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ হবে—।

একাডেমির অফিস ঘরে খবর দিলাম—একটু পরেই ফিরবো। বেরিয়ে পড়লাম পায়ে হেঁটে, স্বপ্নার সঙ্গে—। স্বপ্নে—স্বপ্নে? সেই একই লেক! এঁ্যা! যখন এসেছি একা, লেগেছে একরকম। ছাত্রজীবনে বন্ধুদের সঙ্গে সময় গড়িয়ে দেয়া-দুপুর আর বিকেলগুলো লেগেছে আর একরকম। আর তোমার সঙ্গে এসেছি আর ফিরে গেছি—সেই যে একদিন কাক না-ওঠা-ভোরে—সম্পূর্ণ অন্য রকম মন নিয়ে। যমুনার মতো লেক সেই একই কিন্তু। মনে হ'য়েছিলো ঐ কয়েকরকমই লাগতে পারে বুঝি। ঐখানেই শেষ। না সুমি, স্বপ্নার সঙ্গে এসে আর এক নতুন অনুভূতির গন্ধ পেলাম—।

ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে এগিয়ে বাঁদিকে লেকের প্রায় গায়ের ওপর একটা গোল সিমেন্ট-চাতাল অপ্রত্যাশিত ভাবেই খালি পাওয়া গেলো রবি-অপরাহ্ণে। আশ্চর্য! যেখানে দু'জনের জায়গা সাধারণত হয় না। হলে কিন্তু পরম রমণীয় হয়।

একটু বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে, দূরে-দূরে বসলাম কি আমরা? দেখাদেখি গলাও ব'সে গেলো আমাদের? কথা আর বেরোয় না।

—তারপর আপনার নাচ শেখা কী রকম এগোচ্ছে? চুপ চাপ ব'সে থেকে সময় কাটাতে পারতাম হয়তো, কিন্তু স্বপ্না পারতো কিনা জানতাম না বলেই কথোপকথনের অবতারণা, কষ্ট করেই—।

—কয়েকটা নতুন পাঠ নিয়েছি, তবে প্রদ্যোতবাবুকে পাওয়াই শক্ত—। স্বপ্না পালকের মতো জিব নাড়লো হয়তো। মিষ্টি—!

—আমার মনে হয় প্রদ্যোত মিসেস ভাদুড়ির মধ্যে মনের মতো শিল্পী পেয়েছে—।

—সত্যিই যে তাই! সুপ্রভাদির মতো নিখুঁত সর্বাঙ্গ-শিল্পী কম দেখেছি—।

—প্রদ্যোত আবার খুব খেয়ালী ছেলেতো! কাউকে ভালো লাগলো তো উন্মত্ত হ'য়ে উঠবে। পকেটে দেড় টাকা আছে হয়তো, ওর মনে হলো ট্যাক্সি চেপে বেড়াবে, তো বেড়াবেই। ট্যাক্সিতে উঠেই ব'লে দেবে এক টাকা চার আনা হ'লেই যেন নামিয়ে দেয়া হয়—। আর বাকি চার আনায় হয় পার্কে ব'সে ঝাল-মুড়ি খেয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরবে, না হয় বাড়িতে রেস্ত থাকলে, অবার ট্যাক্সিতে চ'ড়ে বাড়ি এসে ভাড়া দেবে—।

সুপ্রভাদি প্রদ্যোতবাবুর 'বাণীনৃত্যম'এ যোগ দিয়েছেন, জানেন বোধ হয়?

—হ্যাঁ—।

—আপনি একা থাকলে কম কথা বলেন, আর অনেক লোকজন থাকলে বড় বেশি বৈঠকী কথা ব'লে মাত্ ক'রে রাখেন দেখেছি—।

এবার হাসলাম—।

—মনটা পরশু থেকে খারাপ ক'রে দিয়েছেন খারাপ চাকরির কথা মনে করিয়ে দিয়ে—। চাকরিটা ছাড়ার কথা মনে মনে চেপেই রেখেছিলাম। প্রথমত ঐ পারিপার্শ্বিক, নীরসতার কষ্ট, তারওপর মনোমত নয়। রবিবার নেই!

এ চাকরি কিংবা কোনো চাকরিই আমার নয় বুঝেও করতেই হবে ভেবে ক'রে যাচ্ছিলাম। আপনি সব ওলটপালট করে দিলেন উস্কে দিয়ে; মনে হচ্ছে আর একদিনের কাজও দুর্বিসহ, আপনি আমার বৈরাগী মনে সুড়সুড়ি দিলেন সেদিন রাতে—।

—সত্যিই আপনাকে ঐ চাকরি করতে দেখলে ভীষণ কষ্ট হয়—! তা ছাড়া—।

হঠাৎ চুপ করে গেলো স্বপ্না—। আমিও 'তা ছাড়ার' পর কি শুনতে চাইলাম না ইচ্ছে ক'রে। রোদ প'ড়ে এলো হঠাৎ। যাবার সময় স্বপ্নাকে ভালো ক'রে দেখার লোভ সূর্যদেবও সম্বরণ করতে পারলেন না মনে হ'লো—। আলোর আবীর মাখিয়ে দেখে নিলেন শেষবার।

—চলুন চা খাই কোথাও—।

উঠলাম।

রাস্তায় মত পরিবর্তন ক'রে সোজা একাডেমি—। ওরা সবাই এসে গেছে। মহড়া আরম্ভ হয়ে গেছে প্রক্সিতে প্রক্সিতে। অভিনয়ের দিন এগিয়ে আসছে যে।

কী ব্যাপার? কোথায়?

'গিয়েছিলে' শব্দটা ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন সুপ্রভাদি।

—যদি বলি আপনাদের খুঁজতে? স্বপ্নাকে কৈফিয়তের হাত থেকে রেহাই দিলাম।

—তাহ'লে অবিশ্বাস করব! হেসে উঠলেন মিসেস ভাদুড়ি, প্রদ্যোৎনারায়ণের সঙ্গে অনেকেই যোগ দিলো সে হাসিতে—। আসর জমজমাট।

ফেরার সময় বারবার আপসোস করলাম—কেন তোমার কথা ব'লে আজ পরিষ্কার হ'য়ে গেলাম না স্বপ্নার কাছে? তবে কি দুর্বলতার ঘুণ ধরেছে ভেতরে ভেতরে? মানুষের স্বভাবই কি এই নাকি? কেন এমন হয়? অভাবের থেকে তো নয়—। সত্যি বলতে কি মনের মধ্যে ভাগাভাগি হ'য়ে গেছে। একটা মন ঐ দুর্বলতার দিকেই টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মনকে, লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে। স্বপ্নাকে পর ভাবতেও কষ্ট পাচ্ছে সে মন। এমন কি আছে মনে জানি না। দ্রৌপদী পঞ্চের ওপর ষষ্ঠ কামনা করেন ওর জন্যেই, নারী হ'য়েও। তা'হলে? আমরা পুরুষ হ'য়ে একের ওপর আর এক বোধ হয় স্বাভাবিক ভাবেই ভাবি। মনে রেখো এ আমার কনফেশন। ওপিয়ম ইটার না হ'য়েও কনফেশন। মানুষ হিসেবে অন্তত তোমার কাছে খাঁটি বলেই বোধ হয় বলতে পারলাম। ক্ষমা ক'রো দোষ। এ ধরনের চিন্তার দিকে একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করলাম। তুমি রইল কলসিতে তোলা জল? আর স্বপ্না—ঝর্ণা—, না না! এ আমি কী ভাবছি?

—আজ আপনি খুব কম কথা বলছেন। কী ভাবছেন অত?

ওদের গাড়ি আমার বাসস্থানের কাছাকাছি আসতে জিজ্ঞেস করল স্বপ্না—।

—সে বলার নয়—!

—বলুন না!

বোধ হয় আঁচ ক'রেই জানতে চাওয়া—।

নিশ্চয় হ'য়ে নেবার জন্যেই কি? আর হয়তো অন্যমনস্কতায় কিংবা ভাবাতিশয্যে আমার হাত ধ'রে ফেললো স্বপ্না কাঁপা-কাঁপা-তুলো-তুলো হাতে—।

—বলবেন না? সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেই লজ্জা। ভীষণ লজ্জায় কুঁকড়ে স'রে গেলো সে ছিটকে—।

—আর একদিন বলব!

ও আর কথা বলতে পারলো না। গাড়ি পৌঁছে গেলো বাসায়—।

—আবার কাল সন্ধ্যেয় দেখা হচ্ছে—!

—আচ্ছা!

কেউ চেয়ে থাকলে না দেখেও যে-ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে বোঝা যায় তাতেই বুঝলাম গাড়ির অন্ধকার থেকে স্বপ্না শুধুমাত্র আমার দিকেই চেয়ে আছে।

রাত এগারোটা! কোটের হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখে পেছন ফিরলাম—। পিঠটা সির-সির ক'রে উঠল—।

'বন্ধনহীন গ্রন্থি।'

এ গ্রন্থি শুধু পথই বেঁধে দিতে পারে নাকি? না। পথ ছাড়াও, অন্যত্র পড়তে পারে তা। জানলাম, দেখলাম, অবাক-

অভিভূত হলাম। নতুন একটা রূপ অর্থ আর রসানুভূতি নিয়ে হাজির হলো কথাটা। একটা নয়, একাধিক ; তুজনের দিক থেকে তুটো বিভিন্নধর্মী গ্রন্থি মনে হলো ; ভাবলাম সবই সম্ভব—।

আমাদের বহু প্রতীক্ষিত 'দিগ্বিদিক'এর অভিনয়-সাফল্যের রাত সেটা। একটা হেক্‌টিক্ সন্ধ্যে—। দিগ্বিদিক থেকে আসা বহু বিশিষ্ট দর্শকবৃন্দ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মধু বর্ষণ ক'রে গেলেন. অভিনয়ের—স্বপ্নার, আমার মিসেস ভাতুড়ির, প্রদ্যোতেরই নয় শুধু, প্রশংসা টীম্‌ওয়ার্কের। নাট্যকার সংগীত ও নৃত্য পরিচালকের, মঞ্চসজ্জা আলোক সম্পাতের। পরবর্তী প্রযোজনার দিকে আগ্রহে তাকিয়ে থাকার কথা বললেন অনেকে—।

একটা বোঝাপড়া আর ভুল বোঝার বোঝা হালকা করতে সেই রাতেই প্রদ্যোৎনারায়ণকে কয়েকটা প্রত্যক্ষ-প্রশ্নের সম্মুখীন করলাম অনিচ্ছাসত্ত্বেও—।

প্রদ্যোতের মতো বিখ্যাত পরিচালককে আমিই চালনা ক'রে নিয়ে গেলাম চৌরঙ্গীর দিকে—। চুম্বকের আকর্ষণের মতো বহু অধ্যুষিত চৌরঙ্গীতে এসে অনেক-অনেকদিন পরে প্রদ্যোৎনারায়ণকে আবার আলগা দিতে হ'লো—। কোনো শক্তিবলেই আটকানো গেলো না। মিনতি ক'রে আমার এতোদিনের বারণ সেদিনের মতো অস্থায়ীভাবে প্রত্যাহার করাতে ব'লে, আমাকে অন্য কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে, যেন মন পেয়ে গেছে এমন নিশ্চিন্তি সূচক শব্দ তুললো ও, এমন সন্তুষ্টি দেখালো, যে সত্যিই বলা গেলো না কিছুই—।

বলতে চাইও নি। ইচ্ছে করেই এতোদিনের কঠোর নিষেধাজ্ঞাকে আজ আর চালু রাখতে চাইলাম না। কারণ ছিলো—। ওর কাছ থেকে অকপটভাষণ আর বিশেষ

মনোভাবটা জানার ছিলো—। ওর পানদোষটা ছাড়িয়ে এনেছিলাম যদিও—।

ও আমাকে চীনে-খাবার খাওয়াবে ব'লে 'নিউ ক্যাথেতে নিয়ে গিয়ে বসালো। তারপর খানা-পিনা। কি জানি কেন জিন্ খেতে ভীষণ ভালো বাসে প্রদ্যোত। জিনের ইউডিকোলোন-ইউডিকোলোন গন্ধটা মন্দ লাগেনা আমার।

খাওয়া দাওয়ার মাঝামাঝি প্রশ্নটা তুললাম গোড়া থেকে।

—কিছু মনে ক'রো না, সুপ্রভা ভাদুড়ির সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা এখন ঠিক কোন পর্যায়ে রয়েছে প্রদ্যোত—?

তোমাদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা নিয়ে নানান কথা শুনছি চারদিকে, তাই জিজ্ঞেস। গতকাল একাডেমির কোনো সভা নাকি তোমাদের—

—ভালোই করেছ জিজ্ঞেস ক'রে! আমি আজ সকাল থেকেই তোমার কাছে কথাটা কী ক'রে ব'লে হালকা হওয়া যায় চিন্তা করছিলাম। আমি জানি, যে যাই বলুক, বলবে আড়াল থেকে, তোমার প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই হবে আমাকে—। কারণ একমাত্র তুমিই আমার সুহৃদ। অনেক স্খলন, পতন থেকে তুমিই রক্ষে করেছ আমায়। বেশ যেন একটু এলিয়ে পড়া-কণ্ঠ প্রদ্যোতের—।

—শোনো প্রদ্যোত, সুপ্রভা ভাদুড়িকে যতোটুকু জেনেছি তাতে মনে হ'য়েছে নানাভাবে জীবনে বঞ্চিত তিনি। সব থেকেও, অনেক অভাব, অনেক চাহিদা তাঁর। তারওপর শিল্প-মত্ততা। শিল্পমত্ততা থেকে শিল্পীমত্ততা স্বাভাবিক সহঘটন। একে অপরূপ সুন্দরী, তায় সম্পূর্ণ স্বাধীনা। সোসাইটী-শিরোমণি। তাঁর করুণ অতীত ইতিহাস তোমাকে জানানো প্রয়োজন—।

—দেখো আমরা শুধুমাত্র অতীত দিয়ে মানুষকে বিচার করতে গিয়ে ভুল করি। অতীত বাদ দিয়ে ভালো-মানুষ হ'তে চাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ আরো খারাপ হয়ে যায় তাই—। একটা প্রতিহিংসা জাগায় তার মনেঃ আর প্রতিহিংসা আরো খারাপ করে। একথা তোমাকে আজ নতুন ক'রে বোঝাতে হবেনা যে, কেউ যদি চুরি ক'রে জেলে গেলো, তো সে গেলোই—। যতোই কেন সাধু হ'তে প্রাণপণ করুক সে, আমরাই সমাজে পুনঃপ্রবেশের ছাড়পত্র নামাঞ্জুর ক'রে আবার চুরি করাবো তাকে। ঐতো নিয়ম। জীবনে একবার ভুল করা-বিধবাকে চিরকাল আমরা সযত্নে brothel এ পৌঁছে দিয়ে এসেছি—।

তাব'লে তুমি অসাবধানী হতে পারো না—।

সুপ্রভা ভাদুড়ির অতীত কতোটা ঠিক জানো শুনি?

আমি বেশ গুছিয়ে পোর্টে প্রথম দিন চাকরি করতে এসে রোজারিওর মুখে শোনা সুপ্রভা ভাদুড়ির স্বামী মিঃ ভাদুড়ির কাহিনী শোনালাম, অন্যান্য লোকের কাছেও যা শুনেছিলাম সব ব'লে গেলাম গোপন না ক'রে—। চুপ ক'রে শুনলো প্রদ্যোত; চুপ্‌টি ক'রে শুনলো—।

কিছুক্ষণ। তারপরেই তার গুরুগম্ভীর গলায় মেঘ ডাকিয়ে দিলো,—তোমার কাহিনী অসম্পুর্ণ, আংশিক; একদিকের ঘটনা শুনেছ, জেনেছো শুধু অতীতের একটুকু বহিরাবরণ। ওপরের পর্দাটাই দেখে সন্তুষ্ট থেকেছ, ছবি দেখনি ভেতরের—। আমি শুধু অতীতই দেখিনি, বর্ত্তমানে এসেছিই নয়, ভবিষ্যৎটার একটা অপূর্ব সুন্দর ছবিও দেখছি যেন—।

যবের শিষের ছবি আঁকা চৌকো জিনের শিশির প্যাঁচালো ছিপি ঘুরিয়ে ও যেন কাহিনীর ফেনার ফুল ফুটিয়ে

দিলো ; ইউডিকোলোনগন্ধী-কাহিনী—। সোডার সঙ্গে আর একটু পানীয় মিশিয়ে ধীরে সুস্থে, ঠোঁট দিয়ে চুমুকে চুমুকে শুষে নিতে নিতে ব'লে চলল প্রদ্যোত,—।

—ব্রাবোর্ন-বিউটি !

দশ বছর আগেও সুপ্রভা সান্যালের ঐ নাম ছিলো, এ'কথা তোমার জানার নয়, কারণ তুমি থাকতে কোলকাতার বাইরে—। কোলকাতার হৃৎস্পন্দন শুনতে পাওয়া আমরা জানতাম। কোলকাতার নাড়ি-জ্ঞানের ব্যাপারে আমরা সবাই কবিরাজ ব'লেই নয়, নাচে গানে অভিনয়ের আসরে বহু বার ওঁকে দেখেছিলাম যে! শুধু ওঁকেই নয়, ওঁর বাড়ির অনেককেই। তখন আমার এতো খ্যাতি ছিলোনা। আমাকে ওঁরা একটু আধটু চিনলেও প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিলো না। ব্রাবোর্ন কলেজের রূপে গুণে, বিত্তে, সেরা মেয়ে সুপ্রভা সান্যালের উজ্জ্বলতম ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ থাকার কোনো কারণ ঘটেনি কোনোদিন—। সুপ্রভার বাবা রায় জগদীশ সান্যাল বাহাদুর পার্টিতে যেতেও বিরক্ত হ'তে লাগলেন শেষকালে। সর্বত্রই মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব। সর্বত্র—। সে প্রস্তাব, বিত্তশালী জমিদার পুত্রের অভিভাবকদের কাছ থেকেই নয়,—রাজা মহারাজাদের প্রাসাদ থেকেও ।

—একটা মেয়েকে বড় হতে দেবার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে সবাই। জগদীশবাবু প্রায়ই বলতেন ওঁর স্ত্রীর কাছে।

—তা এমন কি অন্যায় করেছেন তাঁরা ? অমন মেয়ে দেখলে কার না সাধ যায়! তা তুমি চটছো কেনো ? এতো ভালোই ! মেয়ের বিয়ের ভাবনাটা ভাবতে হবে না আমাদের—।

বিয়ের ভাবনাটা ভাবতে হয়নি ঠিকই, কিন্তু বিয়ের পরের ভাবনাটা ভাবতে হয়নি, এমন কেউ, শুধু ওদের সংসারেই নয়, আত্মীয়-স্বজন পরিচিতদের মধ্যেও ছিলো না।

রজ্জুকেই সর্পভ্রম হয় না শুধু, সর্পকেও রজ্জুভ্রম হ'তে পারে। এ ক্ষেত্রে উপমাটা ঠিক ঐ অর্থের বাহন না হ'লেও, ঘটনাটা ঐ ধরনের ঘটে গেলো কিসের টানে কে জানে—। কোলকাতা সমাজ থেকে হঠাৎ উধাও হলো সুপ্রভা সান্যাল। না, ইলোপমেন্ট নয়। বি, এ, পাশ করার পর অক্সফোর্ডে গেলো ইতিহাস পড়তে। ইতিহাস রচনা করতেও। গ্রহ ছাড়া আর কি? তা না হলে আর কয়েক মাস পরে গেলেও সংঘর্ষটা, (সংঘর্ষ ছাড়া কি?) ঘটতে পেতো না বোধ হয়। গ্রহ-বৈগুণ্য—। কারণ ঠিক ঐ সময় সুপ্রভার রূপকথার রাজপুত্র অক্সফোর্ডে ইংরিজীতে এম, এ, পাশ ক'রে বিশ্রাম করছিলো। দেখা হ'য়ে গেলো। দেখা নয়, ছুটি সৌর তারকার একাকার করা সংঘর্ষ। যাওয়া—দেখা—আর ভালোবাসা। এই আরোহ।

সমীর ভাদুড়ি। অক্সফোর্ড-সূর্য। তার আলোর ঝলকানিতে সম্মোহিত হ'য়ে যাওয়া-কতো স্বর্ণকেশিনী নিজেদের পুষ্পাঞ্জলি ক'রে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলো। কতো। দেখা হ'লো একদিন এক উৎসবে। বোধ হয় বিজয়া উৎসবে। সমীর তখন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, এখানে সেকানে চাকরির দরখাস্ত পাঠায়, লাইব্রেরীতে বসে। দেখা হ'লো। তারপর যেমন হয়;—সেখান থেকে লাইব্রেরী, লাইব্রেরী থেকে পার্ক, পার্ক থেকে রেস্তোরাঁ, বাসা,—বাসা থেকে week-end sea resort. সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেঙ্গে বিয়ের সানাই বাজা নহবতখানায়।—সে পরের কথা।

সমীর কোলকাতা পোর্টের নিয়োগপত্র নিয়ে চড়ল জাহাজে। মন চায়না আর। তীরের দিকে শাদা রুমালের নিশানা উড়িয়ে উড়িয়ে হাত ব্যথা ওর, সুপ্রভারও। শুধু হাতই নয় চোখও সেও আর বেশিদিন টিকতে পারেনি লণ্ডনে। অজুহাতের অভাব

এমনিই হোতো না, তাতে আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামায় ঘা পড়ল। তুরী-ভেরী বেজে উঠল দিকে দিকে। All roads to the western front! তাই প্রথম পাওয়া-প্লেনে লণ্ডনকে নিচে রেখে আকাশচারিণী হ'লো সুপ্রভা, বাবার জরুরী তারে।

দমদমে সুপ্রভার অভ্যর্থনায় সমবেত সকলের মধ্যে এবার একটি ছিপছিপে সুদর্শন নতুন মানুষের উপস্থিতি জানারা নজর করলেও, না-জানারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নি। কিন্তু আনতে হ'লো। সুপ্রভার আত্মীয় স্বজনই নয়, স্তাবকবৃন্দের অনেকেই—তরুণ ব্যারিস্টার বরুণ বোস থেকে, কিছু না করা-ধনীর দুলাল অনুপম চৌধুরী পর্যন্ত নিজেদের নানাভাবে জাহির ক'রে আকর্ষণীয় হবার চেষ্টার ত্রুটি বিচ্যুতি করেনি কোন দিকেই—। কিন্তু কয়েক দিনেই ওদের ভুল দেখা গেলো উজ্জ্বল নতুন জ্যোতিষ্কের মতো। সুপ্রভার হৃদয়াকাশে একশ্চন্দ্রঃ সমীর ভাদুড়ি,—দ্বিতীয় নাস্তিঃ—। চাকা ঘুরে গেছে সাগর পারে, সকলের অলক্ষ্যে—। অন্যেরা অন্যই,—অপ্রধান। তারপরের দুটো মাস কনে দেখা আলোর মতোই আসন্ন বিবাহের রঙে রাঙা হ'য়ে আসা-স্থায়ী গোধূলি লগনের উত্তেজনায় কেটে গেলো দেখতে দেখতে। সমীরের অষ্টিনে আজ বোটানিক্স্ তো কাল একাদিক্রমে ব্যাটারী ডাউন আর চাকা ফাঁসাতে ফাঁসাতে ডায়মণ্ডহারবার হ'য়ে কাকদ্বীপ পর্যন্ত—। ফাঁকা রাস্তায় যাকে বলে one hand drive'ও করেছে সমীর সুপ্রভার সিংহ-কটিতে বাঁ হাতের অজগর-বেড় দিয়ে। ঘেঁষে এনেছে আর বলেছে—কেমন লাগছে সু—? সারা জীবন যদি এমনি ক'রে ছুটে বেড়াতে পারতাম?

—ওরে বাবা, তাতে রাজী নই! বিশ্রাম, আহার-বিহারের অবসর পেতাম কোথায় তা হ'লে?

—ও গুলোর ফাঁকে ফাঁকে যদি বলি—!

—রাজী !

তবে ওরা ক'রেছে—। এদেশের সংস্কার আর আদর্শকে যথা সম্ভব বজায় রেখে সংযত কোর্টশীপের জাহাজ ভাসিয়ে একদিন বিয়ের বন্দর দিয়ে সংসার নগরীতে প্রবেশ করেছে পায়ে পায়ে। ঐখানেই ভুল করেছে—। পরে মনে হ'য়েছে ওদের। ধান পাকার মাসে ওদের পাকা দেখাই শেষ নয়। বিয়ের ফুল ফুটে উঠেছিলো মরসুমী ফুলের জাঁকজমককেও ম্লান ক'রে দিয়ে—।

মানুষের মন, স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক, শুধু মানসিক ঐক্য আর আধ্যাত্মিক আদর্শের ভিত্তির ওপর একমাত্র প্রীতির গাঁথনিতে দাঁড়িয়ে থাকে না বোধ হয়—। যতোই কেন ভারতবর্ষ হোক। এখানের নারীত্বের পবিত্র উদার-ধ্যানরূপ যতোই কেন মহিমময়ী হোক। তবু! আরো একটা, কিছু থাকে, তা দেহ। জৈবিক মানুষ দেহাতীত-রামধনু নিয়ে বাঁচেনা হয়তো—।

ভুল ভাঙ্গলো—। ফুলশয্যার ফুলেই কীট। দেহের ভিক্ষার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটি-সূর্য সমীর অকৃতকার্য। রিক্ত নিঃস্ব, নিরুত্তর সে দেহের প্রশ্নে—। প্রথমদিন একেবারে হালছাড়ার মতো মনে হয়নি কারুর। কিন্তু প্রথমের পরেও দ্বিতীয়, তৃতীয়—প্রতিদিন আসে,—যায়। প্রতি রাতের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়—। পরাজয়ের কালি চোখের কোলে মেখে রাত ভোর ক'রে দিতে হয় দুশ্চিন্তার আধিব্যাধিতে—।

একি হ'লো ? এতো দুর্বলতা কোথায় লুকোনো ছিল ? কেন এমন হ'লো তার ভাগ্য ? এ লজ্জা কোথায় রাখবে সমীর ?

সে পুরুষত্বহীন ?

তারপর ও থেকে যা হয়—হীনমন্যতা—স্নায়বিক দৌর্বল্য—সন্দিগ্ধপনা—।

সুসজ্জিত বোড়ের মতো একের পর এক এগিয়ে এসে মাত ক'রে দিলো। আচ্ছন্ন ক'রে দিলো ওর মনুষ্যত্ব—চরিত্রকে—।

সুপ্রভা কিন্তু মানিয়ে নিতে কসুর করেনি। প্রথম ক'দিন তো অনভিজ্ঞতায় আসল বাদ দিয়ে অন্য সব কিছুই চিন্তা ক'রেছে। আগে, বেচারি কিছু জানতো না। ক্রমে মেয়েদের স্বাভাবিক সংকোচ আর লজ্জার ওড়না খসে গেছে বিয়ের সাতপাক ঘূর্ণির যাদুতে—।

একদিন রাতে প্রশ্ন করেছে সুপ্রভা লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে —কাছে আসতে চাওনা, আমাকেও যেতে দাওনা। গেলেও সরে যাও। আমি কী করেছি গো?

মুখ কালি করা-সমীর বিছানার ফাঁকা ঠাণ্ডা দিকে সরে গিয়ে হাঁফিয়েছে, কথা বলেনি: শুধু যন্ত্রণাসূচক শব্দ বেরিয়ে এসেছে ওর গলা থেকে—।

—তুমি কী আমাকে ভালোবাসোনা আর? কথা বলো না কেন? কী হয়েচে গো?

—না কিছু না! বলার কিছু নেই।

বিষাদ-করুণ পরিস্থিতি! মানুষকে এমন দুর্ভোগও ভুগতে হয়। কেন এমন অবস্থা হয় মানুষের। বুকের কাছে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা স্ত্রী। সমস্ত কিছু সমর্পণ ক'রে দেয়া মেয়ে। থালায় ঝোল ঢেলে বককে খেতে দেয়ার গল্পের মতো অবস্থা সমীরের—। দারুণ অভিশাপ! ক্রমে বুঝতে পেরেছে সুপ্রভা, আর শিউরে শিউরে উঠেছে পরিস্থিতির জটিলতার আশংকা ক'রে। তবু খাঁটি বাঙ্গালীয়ানার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছে, চেয়েছে মানিয়ে নিতে—। গোপনে প্রিয়তম বান্ধবীর পরামর্শ নিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসার কথা বলেছে সমীরকে আভাসে ইঙ্গিতে

পরোক্ষভাবে! আরো বেজেছে সমীরকে ঐ সমস্ত কথা। পাগল হ'য়ে গেছে ও আত্মগ্লানিতে, সামর্থ্যহীনতার লজ্জায়—।

হ্যাঁ, পাগলই হ'য়ে গেলো সমীর ভাত্নড়ি।

বিলেতের এক পার্টিতে শখ ক'রে খাওয়া অমৃতই বিষ হ'য়ে দেখা দিলো শেষে—। মদ আর মদ—। সব ভোলা, সব ভোলানোর নেশা—। ইচ্ছাকৃত আত্মধ্বংসের পথে বল্গাবিহীন-দৌড়—। ঐ বিপদজনক যাত্রায় হাল দিলো ছেড়ে ঠিক ঘূর্ণির মুখে—। মদ, মদ আর মদ—।

বাড়ি আসা বন্ধ করে দিয়েছে। ইচ্ছে ক'রে কুসঙ্গে মেশে তাড়াতাড়ি ধ্বংস হওয়ার জন্যে, ভুলে থাকার জন্যে আর—। আর বোধ হয় নিজের আর ভাগ্যের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে।

সুপ্রভা প্রথম প্রথম গুম হ'য়েছিলো। পরে দেখলো অসম্ভব। এমন করে থাকা যায় না। চলে গেলো তাই পিত্রালয়ে—। আর ভুলে থাকার জন্যেই আবার শিল্পী জীবন, নৃত্যগীত, অঙ্কনের রাজ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকতে চাইলো। ফল হ'লো উল্টো—। কিছুদিনের মধ্যেই সমীরের মুখ থেকেই কথাটার উৎপত্তি হয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে সাধারণ খবরে পরিণত হ'লো—। সুপ্রভা ব্যভিচারিণী। so called society girl! ঠিক থাকবেই বা কি ক'রে? স্বভাবের সঙ্গে কতোদিন যুদ্ধ করতে পারে মানুষ? সমীর যখন ঐ রকম?

সমীরের বন্ধুরা অনেকে টিপ্পনি কাটলো—। তারপর আরো রঙ চড়লো খবরে। শীগগিরই ওদের ডিভোর্স হ'য়ে যাচ্ছে। সুপ্রভা বিয়ে করবে আবার। ওর বাবা সত্যিই চেয়েছিলেন বিয়ে দিতে—। এর পরে সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো এই যে, যারা সুপ্রভার সঙ্গে বিশেষভাবে মেলামেশা করতো তারাও

আড়ালে ওর চরিত্রের ওপর কটাক্ষের ছলে এর, ওর, তার সঙ্গে সুপ্রভার গোপন সম্পর্কের ইংগিত করতে লাগলো সহজভাবে—নিঃসংকোচেই—

আর ওদিকে সমীর ভাদুড়ি নিজের জ্বালায় ঘরবাড়ি গাড়িতেই আগুন জ্বালেনি—দুষ্টগ্রহের প্রভাবে চাকরি খুইয়ে কি ভাবে রাস্তায় নেমেছে তা তুমি জানো—

প্রদ্যোত হঠাৎ নিঃশ্বেস ছেড়ে একটু চুপ করলো। আরো জিন ঢেলে খালি হয়ে যাওয়া টাম্ব্লারটা টইটুম্বুর করলো—।

বার দুয়েক শুষে নিয়ে প্রায় আঙ্গুলে আগুন ঠেকা সিগারেটটাকে নতুন একটা সিগারেটের সঙ্গে চুমু খাইয়ে আগুনের লিপষ্টিক লাগিয়ে নিলো সেটাতেও। কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়ার পর্দ্দা ফেলে দিলো ওর আর আমার মাঝে।

—এ অতীত থেকে কী পেলাম আমি? চুপ ক'রে থাকতে না পেরে প্রশ্ন করলাম বেশ মৃদুকণ্ঠে।

—এইবার পাবে। এতোক্ষণ অতীত রোমন্থন ক'রে মুখ তেতো করেছি তোমার। এইবার চুণ দেবো কাহিনীর পান-এ।

—স্বীকার করতে লজ্জা নেই, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা শুধু তোমরই নয় সারা কোলকাতার লোকেরই জানা—। Darling of the Society হ'য়ে থাকাই আমার সবচেয়ে বেশি কাম্য! যাকে ব'লে ladymad! আমি তাই—। সেই আমি—। সে যাক! একাডেমির কেউ কেউ যা বলেছে ঠিকই! গতকাল লেকের Island টার ওপর আমি আর সুপ্রভা অনেক রাত পর্যন্ত ছিলাম। হ'লো না, গোড়া থেকে বলতে হ'বে।

আমার স্বভাবানুযায়ী কয়েক দিনের মধ্যেই সুপ্রভাকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি—। তুমি ভালো ক'রেই জানো আমার ভালোবাসা আমার খেয়ালের মতোই কেমন ক্ষণে ক্ষণে

বদলায়! আমার ভালুক-জ্বর—ভালোবাসা—। এটা আমার দোষই—। নতুন খোঁজা আমার চরিত্রের দোষ! আমিই প্রকৃত হীনচরিত্রের; ভারতের আদর্শবিরোধী—। একটা নতুন পোশাকের মতো সুপ্রভাকে কয়েকদিনের নেশার উপকরণ করতে চেয়েছি, একথা তোমার কাছেই অকপটে স্বীকার ক'রে গেলাম। পাকা শিকারী হওয়ায় আমার বুঝতে বাকি থাকেনি, সুপ্রভা আমাকে পছন্দই করে না শুধু—ভালবাসে। তাই আমার দিক থেকে বল্লা ছাড়া ঘনিষ্টতা 'তর' থেকে 'তম'তে যেতে মাত্র কয়েক-দিনই যে যথেষ্ট তা বোধ হয় আর ব্যাখ্যা করে না বললেও চলবে। হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম—কাল আমাদের অনেক রাত পর্যন্ত লেক-দ্বীপে দেখতে পাওয়ার সংবাদটা অতিরঞ্জিত নয়—।

প্রাকৃতিক পরিবেশের নাকি এসব ব্যাপারে একটা বিশিষ্ট রোল্ প্লে করার থাকে? সত্যিই। এই কালটা উজ্জ্বল, ঋতুর যৌবনকাল। বাংলাদেশের হেমন্ত, তায় আবার পূর্ণিমার আগের রাত—। দুটো চাঁদ; একটা আকাশে অন্যটা জলে। পূর্ণিমার রাতটা নয়, তার আগের রাতটা শনিবারের মতো মিষ্টি লাগে আমার—। বসেছিলাম। হঠাৎ মনে হ'লো দুটো চাঁদ নয় আরো একটা আমার পাশে। এর প্রভাও কম যায় না—সুপ্রভা—। আর সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন নয়, একেবারে প্রত্যক্ষ প্রস্তাব—।

—এই রাতটা আমার সব চেয়ে ভালো লাগে সুপ্রভা! রবিবারটা আমার কাছে বিশেষ কিছু নয়। শনিবারটাই সব। তার ওপর মনের মত সঙ্গ যদি থাকে—। খুব নরম গলায় বললাম ওর কানের কাছে। লোকজন তখন বেশ কমে এসেছে—।

—কী পরিষ্কার আকাশ! আর জলের ওপর কেমন দুলছে দেখো চাঁদটা! সত্যিই, এমন রাত কদাচিৎ আসে! সুপ্রভার মনেও রাতের মোহ ছুঁয়ে গেছে। মনে হ'লো, এই সেই মুহূর্ত—।

ভালো লাগছে ?

ওর তুলতুলে হাতটা নিজের হাতের মধ্যে এই প্রথম নিলাম। ওর হাত কাঁপছিলো—। পলতে বেয়ে বেয়ে আগুন চিড়চিড় ক'রে এগোতে এগোতে বোমা ছুঁয়েই যেমন হঠাৎ চমক লাগিয়ে পলকের মধ্যে ফেটে পড়ে, আমার তেমনি হ'লো—। ওর হাত ছুঁতেই সব যেন কোথায় কি হ'য়ে গেলো—। নিজেকে প্রকাশের আকৃতিতে হঠাৎ ফেটে পড়লাম যেন। ভীষণ শক্তির এক চুম্বন চেপে ধরলাম ওর পাতলা গোলাপী ঠোঁটে, কিছু ভেবে দেখার সময় না পেয়ে—। প্রথমটা একটু কেমন হ'য়ে গেলেও বিস্ময়কর শক্তিতে ও হ্যাঁচকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সংযত গম্ভীর কণ্ঠে আমার আবেগের মৃত্যু-দণ্ড ঘোষণা করলো—ছিঃ প্রদ্যোত ! যা ভেবেছি তাই ! সবাই কি সমান হবে ? তুমিও এইভাবে মিশতে চাইলে ? এতো অসংযত ? কেন তুমি অসংযত হ'লে হঠাৎ ? কেন তোমার সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা আনালে ? আমি যে সত্যিই তোমাকে ভালবাসি।

—নিজেকে সামলাতে পারিনি ! ভালো আমিও বাসি ব'লেই তো অমন ক'রেছি সুপ্রভা—। তখন যা আমার অবস্থা ধারণা করতে পারবে না সুব্রত। একটু থেমে বললো প্রদ্যোত—।

—না না, তুমি ভালোবাসায় ছুরি মেরেছ। ঐ ভাবে ভাল আমি বাসতে পারি না। তোমাকে বন্ধুর মত, নিজের প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভায়ের মতো ভালোবাসি—! আর তুমি—? ও কেঁদে ফেললো।

—তবে কি তুমি অন্য কাউকে ?

—তুমি কি আমার জীবনকাহিনী জানো না ? আমার বিবাহিত জীবন ?

—সে তো একটা কলোস্যাল ফেলিওর ব'লে শুনেছি।

—ঠিকই শুনেছ। ব'লে, ও সমস্ত ঘটনা বললো—।

—সেই যে ফুলশয্যার রাতে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গেলো সমীর, আর ফিরলো না। দুর্বলতা আর সন্দেহের আগুনে ঝলসে ঝলসে মানুষটা যেন কী রকম হয়ে গেলো—। কেমন সুন্দর ছিলো। কেমন মিষ্টি ছিলো ও বিয়ের আগে—। নিজের অক্ষমতায় দোষারোপ করলো আমার ওপর—। সন্দেহ! আমি যে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি স্বাভাবিকভাবে, এ কেমন করে সম্ভব? বিশেষ বয়সে অন্য দেহ-সম্পর্কহীন হ'য়ে সুস্থ মানুষ কি ক'রে থাকে? এই ধারণা ওর—। আমি নিশ্চয়ই ব্যভিচার ক'রে বেড়াচ্ছি—। কিছুতেই বোঝাতে পারা গেলো না ওকে, এতে ওর কোনো দোষ নেই—। বোঝাতে গেলে আবার উল্টো বোঝে। ভাবে অন্যদিককার ব্যাপার সামলাতে আমি ওর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছি। মানুষ কতো জটিল, কতো সংকীর্ণ হ'য়ে যায়। নিজের ওপর, জগৎ জীবনের ওপর নিদারুণ বিতৃষ্ণা এসে গেলো এরপর। বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়লাম সমীরের ওপরও। আমার কাছে আরো ছোট আরও বীভৎস দেখানোর হাত থেকে ওকে বাঁচানোর জন্যেই ছেড়ে এলাম একদিন। ঐ অবস্থায় আমার দুটো পথ ছিলো—এক সমীরের ওপর প্রতিশোধ নিতে ওর চেয়েও উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে যাওয়া—যা গিয়েছি ব'লে অনেকেরই ধারণা। আর দ্বিতীয় পথ সব কিছু ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নেয়া। আমি একটা তৃতীয় পরিকল্পিত পথে পা দিলাম—। ভারতের ঐতিহ্য রক্ষে করতে কতো জীবনই তো বলি গেছে—। আর একটা যাক না! হ্যাঁ তাতেই সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ আর প্রতিশোধ হবে সমীরের ব্যবহারের। ঠিক করলাম সাধারণভাবেই একটু বা বেশি ক'রে সমাজে মিশবো মনটাকে গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে নিয়ে—। এটাকে তুমি একটা খেয়াল, পাগলামী, খেলা

বলতে পারো। কিন্তু সত্যি জেনো, নিজেকে বাজে খরচ করে একটা বিজাতীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয় বলেই, আনন্দ পাই বলেই, হাহাকার করা নিজের দুর্বল মুহূর্তগুলোকে বিজয়দর্পে মাড়িয়ে চলে আসতে পারি—। সবচেয়ে দুঃখ, সমীর আসল আমাকে জানবে না; চিরকাল ভুল জেনে যাবে।

চোখের জলে চাঁদের প্রতিফলন আর ওর কণ্ঠস্বরে বুঝলাম সুপ্রভা খুব সংযত হয়ে কাঁদছে।

—আমাকে তুমি ক্ষমা করো সুপ্রভা। না জেনে অপরাধ করেছি—। আমার চোখ খুলে গেছে।

—তুমিও কিছু মনে কোরোনা ভাই। তোমাকে যথেষ্ট অপমান করেছি! তোমার কী দোষ। তুমি কী ক'রে জানবে আমার তপস্যার কথা! যা হয়েছে ভুলে যেও! আজ থেকে বন্ধুর মতো, বোনের মতো ভালোবেসো। কেমন? তোমাকে আমি ত্যাগ করতেও পারবো না, একটা ভুল হয়েছে ব'লে! সত্যিই যে ভালবাসি তোমাকে প্রদ্যোত—!—

প্রদ্যোত আবার চুপ করলো। তারপর হঠাৎ আমার হাত চেপে ধ'রে মুখর হয়ে উঠলো আবার—।

—বিশ্বাস করো ভাই, কাল রাতেই আমি অন্য মানুষ হ'য়ে গেলাম। বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে মাথা হেঁট হলেও আমি অনেক উঁচুতে উঠে গেলাম। এই প্রথম নিজের মা, বোন ছাড়া মেয়েকে শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসতে শিখলাম। নাঃ, এ ভারতবর্ষেই সম্ভব। এদেশ বলেই সমীর সুপ্রভার কোনো সম্পর্কের বন্ধন না থাকলেও কী এক অদৃশ্য গ্রন্থি থেকে গেলো চিরকালের, যা ছেঁড়ার নয়? কাল লেক-দ্বীপে আমাদের অনেক রাত পর্যন্ত দেখাতো যাবেই—। ঐ ব্যাপারের পর আমরা সহজভাবে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেছি। এখন আমাদের মধ্যে একটা

স্বর্গীয় প্রীতির সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে—। বিশ্বাস করো সুব্রত আমি আর সে প্রদ্যোতনারায়ণ নেই। প্রদ্যোত চেয়ারটাকে পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে বললো—চল—।

আমি চেয়ে চেয়ে নতুন প্রদ্যোতকে দেখতে লাগলাম। ও সমীর আর সুপ্রভার মধ্যে এক বন্ধনহীন গ্রন্থি দেখেছে। আমি আর একটা বন্ধনহীন গ্রন্থি দেখতে পেলাম। প্রদ্যোত আর সুপ্রভার এই নতুন মধুর সম্পর্কের গ্রন্থি। গ্রন্থিহীন বন্ধনও।

কিড্ সায়েবের নামে Kidderpore। এর ধ্বনি পরিবর্তিত রূপ খিদিরপুর। আর কোলকাতা পোর্টের জনক ওয়াটসন সায়েবের নামে ওয়াটগঞ্জ। এখনো ওঁরা বেঁচে রয়েছেন নামে। চোখে দেখলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত বন্দরকে চিনতে পারতেন কিনা সন্দেহ। সেটা বোধ হয় ১৭৮১ সাল। কর্ণেল ওয়াটসন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে বন্দর তৈরীর অনুমতি নিয়ে আদি-গঙ্গার গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশের নাড়ির গতি পরিবর্তনে মেতেছেন। টালি-নালার মোহানায় ডক নির্মাণ করেছেন তিনি। জাহাজ মেরামতির ডক। কাজ বেশিদূর এগোয়নি। তারপর একশো বছর চুপচাপ। বন্দর, ইতিহাস-বিহীন।

শিল্প বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ার ঢেউ আধুনিক ডক তৈরীর সূচনা করলো ১৮৭০ সালে। গঙ্গার ধারে চারটে জেটি নির্মাণ শেষ হ'লো।

ঐ বছরে। ১৮৯২ সালে প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ 'লুইস' কোলকাতা বন্দরে ভিড়ে নতুন যুগের বাণী শোনালো—। তারপর প্রসার আর প্রসার, উন্নতি আর বিস্তৃতি ; খিদিরপুর ছাড়িয়ে কিং-জর্জেস ডক আর গার্ডেনরীচ জেটিস্ পার হ'য়ে বজবজ পেট্রেলিয়াম বার্থ পর্যন্ত, অবিচ্ছিন্ন, অপরিশ্রান্ত গঠন-ইতিহাস—।

স্যাঁতানী লাগা আলমারি বোঝাই বই ছাদের রোদে হঠাৎ ছড়িয়ে দেয়ার মতো ঘেঁষাঘেঁষি-ঠ্যাসাঠ্যাসি বাড়ি, খোলাখাপরা, টিনের আর পাকা অট্টালিকা। একতালা, তালার ওপর তালা, বইয়ের ওপর বইয়ের মতো—। পরিমাপ, পরিকল্পনা-বিহীন খিদিরপুর—। ওদিকে দেয়ালে রুইয়ের মেটে লাইনের মতো কুলি-লাইন ; হাইড্ রোড লাইন, দমকল লাইন, টিনাবাজার লাইন, লাইনের পর লাইন—। কতো কতো—।

এস্, এস্, সিটি অফ্ অক্স্ফোর্ড্ জাহাজের ডেকের রেলিঙে বুক দিয়ে দেখে দেখে মনে মনে ঠিক করছিলাম ধান্নুর বাসাটা আন্দাজে আন্দাজে—। এইমাত্র ধান্নুকে নিয়ে চলে গেলো লাল ক্রস লাগানো অ্যাম্বুলেন্স্খানা—। একেবারে নিয়ে চলে গেলো। অনেক কিছুই শুনতাম ওর সম্বন্ধে ওর সহকর্মিদের কাছে, অফিসের বাবুদের কাছে, ওর নিজের মুখেও—।

একদিনের ঘটনা বললেন ক্লাস ফোর কর্মী-এসট্যাবলিস-মেণ্টের ইনচার্জ শুভ্রাংশু সেন। উনি কেঁদেই ফেললেন। আর আর খবর দিলো ঝিংড়ি জেসোয়ারা, আমার অফিসের পিওন। ওর মুখেই ব্যক্তিগত ঘটনাগুলো শুনতে শুনতে এসেছি জাহাজের ওপর ; বলতে বলতে আর চলতে চলতে চোখের জলে পথ ঠাওর করতে না পেরে হোঁচট খেয়েছে ঝিংড়ি বার কয়েক। দুর্ঘটনার যুক্ত-তদন্ত শেষ হয় নি এখনো। ঠিক হয় নি দায়িত্বের, কার দোষ। হ্যাঁ, ঐখানেই ধান্নুর বাসাটা। তাই হবে।

সম্ভাব্য স্থানটা থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে এলাম সমস্ত খিদির-পুরের ওপর বুলিয়ে বুলিয়ে। কিড্ সায়েবের খিদিরপুর—। মাঝখানে, অক্টোপাসের মতো সমস্ত কিছু আঁকড়ে থাকা ডক্। তাকিয়ে তাকিয়ে থাকলাম আর থাকলাম ওদের মুখে শোনা ছাড়া-ছাড়া ধান্নুর কাহিনীর বিন্যাস চিন্তার সূক্ষ্ম রিফুকরণে। আশ্চর্য জায়গা!

খিদিরপুর ডক।

এক অন্য জগত···।

মাল তোলা আর ফেলা। ওঠা আর নামা, জলশক্তি চালিত ক্রেন্ আর জাহাজের ডেরিকের উদ্ভট ঘড়ঘড়ে শব্দে মুখর। লোক লস্কর, খালাসী-সারেঙের বিচিত্র কলতান। নির্বিরোধী সাধারণ মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীর 'পরে নির্মমতার চরম, স্নায়বিক কসাইখানা—

দ্বিতীয়-যুদ্ধখ্যাত সাইরেনে সময় ঘোষিত হয়, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নায়—। তীক্ষ্ণ, তীব্র—বিরক্তিকর। হিলহিলে তলোয়ারের মতো শিস্ দিয়ে যায় মোরগ-ডাকা ভোরে, আধজাগন্ত মানুষের কানে কানে—। পাশ ফেরার অবকাশ দেয় না চৌম্বিক আকর্ষণে—কুলিশ কঠোর নির্দয়তায়। কান্নার চাবুকে চাবুকে জাগিয়ে তোলে কুলি লাইনকে-লাইন, নিষ্ঠুর নিয়মানুবর্তিতায়।

হাইড্-রোড লাইনের উনপঞ্চাশ নম্বরে থাকা-পিওন ঝিংড়ি জেসোয়ারা সবার আগে ওয়ার্নিং দেয় তার স্বাভাবিক রসিকতা, পাগলামী আর খামখেয়ালীতে—টাইন্ চলা যা রহি হ্যায়! আপনা আপ্না জমিন্ সামালো!

চৌকিদারী চীৎকারে 'হুলিয়া' করে আর পায়চারি করে, পায়চারি করে আর ঘোষণা করে—নিজের হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া-বারান্দা থেকে। এ নিত্য নৈমিত্তিক। এছাড়া সাধারণত ভালো

মানুষ, লাজুক প্রকৃতির অমায়িক বুড়ো ; কিন্তু তার সামরিক জীবনের তথা কথিত বাহাদুরির কথা বলার সময় কী এক যাদুতে মুহূর্তে পাল্টে যাবে ওর অবয়ব আর কণ্ঠস্বর।—

—মালুম্! হাম্ আদান, মিশির, ফ্রাঁস্মে লড়াই কিয়া ? বহোৎ বরফ বরিষতা উস্ মুল্ক্। জাড়াকা দিন্মে দো খোরাক ব্রান্দি মিলতা থা-হ্যাঁ-া-া !—

শ্রোতৃবর্গের সম্ভ্রম সঞ্চারের জন্যেই বোধ হয় অস্বাভাবিক গর্জন ক'রে ওঠে কৃত্রিম কণ্ঠে। আর এডেন, মার্সিলিস্, ফ্রান্স-এর বীরত্ব কাহিনীর মধ্যে দো'খোরাক ব্র্যাণ্ডিটাই যে কেন প্রাধান্য লাভ করে বোঝা যায় না।—

চোদ্দসালের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো সে সুইপার হয়ে। নিদর্শন স্বরূপ পরিষ্কার খাকি পোশাক পরে, বুকে নানান রঙা রিবন লাগায় আর সমরিক নিয়মানুবর্তিতায় দাড়ি কামায় প্রত্যহ—। একটু যেন বিশিষ্ট ; পাঁচজনের পঞ্চম ব্যক্তি।—

সাপুড়ে বাঁশি-সাইরেনের ডাকে সাপের মতো নিঝুম কুলি লাইনে প্রাণের স্পন্দন জাগে। 'ভ'-বাজোয়া' হাজরির তাগিদের চাবুক চাঙ্গা ক'রে দিতে চায় সকলকে। ঝিংড়ির ডাকে প্রথম সাড়া দেয় ধান্নু—প্রতিদিন। ঠিকা পোর্টার ধান্নু। প্রয়োজন মতো ডকের মাল তোলা নামানো জীবিকা। ওদের লাইনের মধ্যেই একটু খোলা জায়গায় বে-আইনী ঝুপড়িতে বাস। এখনো পাকা কোয়ার্টার্স মেলে নি। কাজ অনিশ্চিত। মাসের বারোদিন কাজের নিশ্চয়তা, তারপর, পদ্মপাতার জল। সেই হিসেবে তলব। তাতে দিন-আনা-খাওয়া লোকের বারোদিনই চলে, বেশি নয়! প্রায়ই ব'সে যেতে হয়। ওর বসার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনগুলোও যদি বসতো। কবে কোথায় গিয়েছে তা ? ওর ঝুপরিতে সম্বলের মধ্যে এক লোটা। বর্তন বলতে পেতলের কানা-উঁচু ফণ্ড

ফঙে তিনখানা থালা আর কয়েকটা আজে বাজে ডেয়ো-ঢাকনা। আসবাব এক খাটিয়া। প্রাণীদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী, দুই ছেলে-মেয়ে আর খাটিয়ায় অসংখ্য খাটমল! নিজেরা খেতে না পেলেও ওদের নিয়মিত খাদ্য যোগাতে হয় প্রতি রাত্রে, দেহের রক্ত দিয়ে—।

ঝিংড়ির দিল্লাগীতে আনন্দ পায় ধান্নু কাজ কর্ম থাকলে। রসালো প্রত্যুত্তর চালায় জানানার সামনেই, তারই বিষয়ে। আগের রাতের ঘটনার খুঁটিনাটির আভাস ইঙ্গিতপূর্ণ রসিকতা। ফাঁস ক'রে দেয় জানানার গোপনতম আচরণগুলো নগ্ন ভাষায়। প্রথম প্রথম যশমতিয়া বাধা দিতো। এখন নিলাজ হাসি হাসে কুলকুল ক'রে। ঝিংড়ির ঐ নানা সুলভ সম্পর্ক লাইনের সব জানানাদের সঙ্গে। আদমীরা মনে করে না কিছু ঃ—বুড্ডা বহোৎ দিল্লাগী করতা।

যশমতিয়া। মিষ্টি নাম। ধান্নুর চুপি চুপি মতিয়া ব'লে ডাকার ইচ্ছে থাকলেও ডাকতে পারে না। ধর্মভয়। ওদের আবার জানানাদের নামোচ্চারণ বারণ। বাবুরা যেন কী! অফিসের কাজে জানানাদের নাম জিজ্ঞেস করে নির্বিকার হ'য়ে। ওরা হেসেই খুন ?

—উ নেহি বাতানে সাকেগা! অন্য লোক দিয়ে বলায় আর মেয়েলী লজ্জার গ্রাম্য-হাসি হাসে।

ঝিংড়ির আজ মিছেই চীৎকার। আজ আর সাড়া দেবার অবস্থা নেই ধান্নুর। মাঝে ক'দিন কাজ ছিলো না। কাজ পেয়েছে। কিন্তু রসদ ? ইঞ্জিন চালাতে জল আর কয়লা চাই। জল আছে। কয়লা ? সকলেরই প্রায় সমান অবস্থা। অদ্ভুত জীবন! দারিদ্র্য আর অপরিচ্ছন্নতাই সব। অনাহার অর্ধাহারের মতোই স্বাভাবিক। এর থেকেও ভালো অবস্থা যে

হ'তে পারে, এর বিরুদ্ধে যে কিছু করার বা বলার থাকতে পারে তা ঢোকে না মাথায়। জীবনযাত্রার মান? মান কোথায়? আছে। জীবনযাত্রার অপমান। চোখের দৃষ্টি তাই ভাবলেশহীন। শুধু মাত্র লোভ, ক্রোধ আর বিদ্বেষের ছাপ পড়ে তাতে। দেহত্বক লাবণ্যহীন, রুক্ষ--। স্ত্রী পুরুষেব মিলন যন্ত্রচালিতের মতো, নিয়মমতো—আবেগ-আবেদনহীন।

বোকা ধান্নুর অবস্থা আবার চরম। বেশ কয়েক পর্দা নীচে। উনিশ বিশ নয়, এগারো বাইশ। আয়-ব্যয়ের সাধারণ হিসাবেরও ওর ছোট্ট পাকা মাথায় স্থান সংকুলান হয়না। তিন বারে পাঁচ-পাঁচ টাকা ধার দিয়ে সব্বাই চল্লিশ টাকা কবুল করিয়ে নেয়। তার ওপর আছে কাব্‌লী সুদ বা তার চেয়েও উগ্র কিছু। শতকরা হিসাবে না পাওয়া—দশটাকায় মাসে পাঁচ টাকা। আসলীর কথা থাক; সুদ দিতেই শরীর হিম্। ঋণের অঙ্ক স্ফীত হ'য়ে চলে বর্ষার দামোদরের মতো; বেড়ে চলে জলা জমির পাটের মতো চড়চড় ক'রে—। বেহিসেবী দেনায় মাথার প্রতিটি পাকা চুল বিক্রি হয়েছে ওর। তলবের দিন জীবনে পুরো টাকা নিয়ে তোলে না ঘরে! দেখার আগেই চিলের মতো ছোঁ মেরে হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। কথা মতো না পেলে চলে অকথ্য শাসানি গালিগালাজ আর টানা হেঁচড়া—। 'উধার' আর বেয়াজেই তলবের বারো আনা খতম। সাতদিন চলে অবশিষ্টে! তারপর পূর্ব্ববৎ; উধার—। এখন তাও মিলছে না। মিলছে শুধু গালিগালাজ। কী ক'রে আজ সাড়া দেবে ধান্নু—? কেমন ক'রে দেবে? ঝিংড়ি চুপ। ধান্নু উঠে বসতে চায় খাটিয়ায়। সহজ নয়। শক্তি কোথায় শরীরে? কদিন অর্ধাহারে চলেছে। কাজতো

অর্ধেক নয়! এক হপ্তা বাদ তলব। এ-ক'দিন চলে কিসে? যশমতিয়া কতো কান্নাকাটি করে। অন্য আদমীরা তো চালাতে পাচ্ছে ঠিক। সে-ই বা পারে না কেন? কেন এতো দুরবস্থা তার? মন খারাপ ক'রে আর না খেয়ে খেয়ে অসুখ হ'য়ে পড়েছে। সে একবার তাকিয়ে দেখে। নিঃশ্বেস পড়ে একটা। নিটোল যশমতিয়া শুকিয়ে পাকিয়ে গেছে। নাকের কানের চাঁদির গয়নাগুলো নেই। নিরাভরণা, নিরাবরণাও। ছগনলালের দোকান থেকে চার পয়সার ছাতু ধার ক'রে খেয়ে কাজে বেরোতে হয় ওকে। আজ শেষ বারের মতো ধার দিয়েছে ছগনলাল; কাল থেকে আর আধেলা পয়সাও মিলবে না।

এগারোটার সময় আফিসে হাজির হয় খুটখুট ক'রে। বড়বাবু শুভ্রাংশু সেনই ওর শেষ ভরসা। সম্মান বোঝে ব'লেই সব শেষে নেহাত নিরুপায় হ'য়েই ধরা দেয় ওঁর কাছে—। অফিস ইনচার্জ শুভ্রাংশু সেন কবি। কি যেন পান উনি ধান্নুর মধ্যে। তার অনেক আব্দার, পাল্টা রসিকতা সহ্য করেন উনি নিজের পদমর্যাদা আর ব্যক্তিত্বের প্রতিদানেও—। ধান্নুর প্রাচ্যদেশসুলভ সরলতা, দার্শনিকতার তারিফ করেন মনে মনে। কতোকগুলো সহজ সরল জীবননীতিকে নেয়ার দর্শন। এই হ'লে এই হবে। অভিযোগ নেই—। ভালো না লেগে পারে? ওকে নিয়ে রহস্য রসিকতা করেন শুভ্রাংশুবাবু। কৃত্রিম ব্যঙ্গ বিদ্রূপে জর্জরিত করতে চান ওর ছোট কালো দেহটাকে। পাকা চুল দেখিয়ে বলেন যে, জানানা ধান্নুকে ভালোবাসতেই পারে না। ধান্নুর অবস্থা চিনির প্রলেপ লাগানো কুইনীনের বড়ির মতো। অন্তরে দুঃখ কষ্ট, খিদে তেষ্টার তিক্ততাকে চাপা দিতে হয়—মুখে চোখে হাসি-খুশির প্রলেপে। হজম করতে হয় রসিকতা।

কেয়া মালুম বড়াবাবু—, আব্ হাম বাহার চলা আয়া: উয়ো যে খুশ্ কর্ সকতি! লেকিন্ জানানীওঁকো বিশ্ওয়াস্ করনা চাহি—!

সামনের পেতলের পিন্ গাঁথা দাঁতগুলো বার ক'রে হাসে কষ্টে সৃষ্টে। ওর বয়েস বেশি হয়েছে স্বীকারই করতে চায় না। চুল অকালে পেকেছে বোঝাতে চায়—।

—তোম্ বুঢ্ঢা হ্যায়! শুভ্রাংশুবাবু হাসেন।

—মান্ লেতা, হাম বুঢ্ঢা্সে বুঢ্ঢা! একটু থেমে বেশ নীচু পর্দায় বলে—দোঠো রূপেয়া চ্যালা দিজিয়ে বাবুজি! র‍্যাশান উঠানা হ্যায়—!

—এসিওয়াস্তে মান লিয়া তোম বুঢ্ঢা হ্যায়?

হাসতে হাসতে টাকা এগিয়ে দেন শুভ্রাংশুবাবু।

স্বস্তির নিঃশ্বেস পড়ে ধান্নর—যাক্!

একটা বিশিষ্ট-বিন্দু সীমা আছে প্রত্যেক জিনিসেরই। চক্ষু-লজ্জারও। চোখ এবং লজ্জা থেকেও চক্ষুলজ্জাহীন হ'তে পারে মানুষ সময় বিশেষে। যশমতিয়ার কঠিন অসুখ। কী হ'য়েছে বোঝেনা ধান্নু; বুঝতে চায়ও না হয়তো। সেদিনের টাকায় রেশন ওঠে নি। যশমতিয়ার পথ্য এসেছে। কম্পানী ভালো তাই রক্ষে—। ডাক্তার আর ওষুধের খরচ দিতে হ'লেই হ'য়েছিলো আর কি—! কিন্তু রেশন? কোনো বন্দোবস্তই করা সম্ভব হয় নি। চরম খাদ্যাভাব। কতোদিন—কতোদিন গম বোঝাই থলে নিয়ে বাড়ি ফেরে নি সে—! হাতে-গড়া মোটা রুটি আর নেনুয়ার ভাজি—। আর বেশি কিছু চায় নি তো ওরা! উঃ কতোদিন! এ ক'দিন শাত্তুতে চালিয়ে দিয়েছে কোনোক্রমে।

দুর্বল হয়ে পড়েছে বেশ খানিকটা। পেটটা খাল হয়ে গেছে যেন। উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘোরে,—হাত-পা ওঠে কেঁপে! ওর ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফেরে না সারাদিন। কেন ফিরবে? বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ তো খাবার—। খাবারের বল্গা নেই যে টেনে রাখে ওদের—। কোনো কোনোদিন অবাক ক'রে দিয়ে ফেরে সকাল সকাল, কুকুর-ক্লান্তিতে। মার খেয়ে ফেরা। চুরিচামারিতে অসাবধানতার পুরস্কার—। ধান্নু সহানুভূতি জানায় না। করে না তিরস্কার—। ওর শক্তি নেই; ভালো লাগে না কিছুই। কিন্তু কাজের শক্তি—। থাকতেই—রাখতেই হবে। অঙ্গ শিথিল করা অনুভূতি সত্ত্বেও—! অভ্যেস মতো সে সাড়া দেয় যন্ত্র-শ্যামের বাঁশিতে। ছুটে যায় ডক—যমুনায়। শেষ চেষ্টার মতো কাজ ফেলে দশটা নাগাদ ঘাই দেয় একবার অফিসে। ব্যাপারটাকে হালকা ক'রে নেবার আর চক্ষুলজ্জা এড়াবার জন্যে শুক্‌নো জিভ্‌কে জোর ক'রে, রসালো ক'রে, মুখে হাসি টেনে রহস্যচ্ছলে সাহায্য চায় শুভ্রাংশু সেনের কাছে। খাবার ছুটিতে কিছু না হ'লে চলে না আর। পেটে কিছুই পড়ে নি সকাল থেকে—। কে কার মনের খবর রাখে। অবস্থার গুরুত্ব বোঝেন না শুভ্রাংশু সেন। হাঁকিয়ে দেন। —হররোজ্‌ মাঙ্‌নে আতা! শরম নেহি!

চাবুক খেয়ে চাবুক চুরি ক'রে মুখে হাসির জোয়ার বজায় রেখে চলে আসে সে, আহত ক্ষুদকুঁড়ো-আত্মসম্মানের পিঠে হাতে বুলিয়ে। সাইরেন বেজে ওঠে! এগারোটার।

এ বাঁশি কিন্তু অভ্যর্থনা পায়। খাবার ছুটি। বর্ষার পিঁপড়ের মতো পিল্‌ পিল্‌ ক'রে লোক বেরিয়ে চলে গেট্‌ দিয়ে সার সার। অজগর সাপ এক গহ্বর থেকে মুখ ব্যাদান ক'রে বেরিয়ে আসে যেন। মাথা-ই নেই তো মাথা ব্যথার মতো

তাড়া নেই ধান্নুর। সাইরেন অভ্যেস মতো উত্তেজনা আনলেও কিসের ঝাঁকানি যেন সব কিছু স্তব্ধ ক'রে দিতে চায়,—স্নায়বিক বিপর্যস্তি আনে। সংস্থান নেই আহারের, সম্ভাবনা নেই সংস্থানের। উদাস-নির্লিপ্ত মনে এগিয়ে চলে সে পথের ধারের ক্ষুদে শালগাছটার ছায়ার দিকে।

ওঁয়াওঁ—ওঁ—য়াঁ—ও,—ওঁ—য়াঁ—ও......

সাইরেন ককিয়ে ওঠে দশ সেকেণ্ডি মেয়াদে। বারোটা। বিশ্রামের একঘণ্টার ঝিমুনি ছুটে যায় ধান্নুর। আবার কাজ। শরীরে বিদ্রোহের দাহ। কিন্তু—? বিরাটকায় কিন্তু। যশমতিয়ার রোগশীর্ণ মুখ স্মরণ ক'রেই ঝেড়ে ঝুড়ে ওঠে সে কশাঘাত জর্জরিত গরুর মতো—।

—কাল তলব্ হোগা—।

আজকের দিনটা! যেমন ক'রেই হোক চালিয়ে যাওয়া চাই-ই—! তা না হ'লে—। না ভাবতে পারে না ও—। আরো কঠিন, আরো নির্মম উপবাসের তাড়না উপহাস ক'রে ওঠে যেন। ঠেলে নিয়ে যায় ক্রেনের তলায়—।

কাজ চলে—।

অবিরাম অবিশ্রাম কর্মব্যস্ততা।

বুদ্ধির লাগাম লাগিয়ে জল আর তেলকে ইচ্ছেমতো হুকুম তামিল করায় মানুষ অশ্বশক্তির পরিমাপে। ক্রেন শান্তশিষ্ট সুশিক্ষিত সার্কাসের হাতীর মতো শুড় তুলে তুলে ঘোরে। এঞ্জিন উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োয়,—হুইসিলের হ্রেষায়। বিমিশ্র বিচিত্র শব্দের ঐকতান। ক্রেনের হুস্-হুস্, ডেরিকের ঘড়, ঘড়, জাহাজের ভোঁ; আর স্টিমার এঞ্জিনের তীক্ষ্ণ ভগ্ন কণ্ঠের হুইসিল।

সবার ওপরে মানুষের চীৎকার।

ধুলো—ধুলো—আর ধোঁয়া।

নীচে মাল বোঝাই ট্রলি গুদামের পাথরের চাঙড় পাতা মেঝে কামড়ে কামড়ে চলে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো।

দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ভারতের ভাগ্য বিধাতা। তার ওপর নির্ভর পুরোপুরি, শাশ্বত ভারতের খাদ্যাভাব। খেয়ালী মৌসুমীর গতিবিধি দুষ্টু স্কুল পালানো ছাত্রের মত। কখনও আসে, বেশিই আসে, আবার কোনো বার দেখাই নেই। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি। ফল খাদ্যাভাব। এবারে খাদ্যাভাব চরম, হাত পাততে হয়েছে বাইরে। এ ভিক্ষের শেষ কোথায়? কী আছে এর শেষে? জাহাজের কাজ চলেছে। গম নামানোর কাজ। চারদিক গম গম করছে যেন। ক্রেন আর ডেরিক সমবেত সঙ্গীতে গম নামাচ্ছে সিটি অফ্ অক্সফোর্ড জাহাজ থেকে। একেবারে এক ডুলিতে চব্বিশ বস্তা গম নামছে। সাধারণের দ্বিগুণ। ডবল্ স্লিঙ্গ অপারেশন। বিচিত্র কর্ম চাঞ্চল্য। পাগলের মতো এক কাজ অন্যটাকে ব্যঙ্গ ক'রে চলে আপন খেয়ালে। ডুবিয়ে দিতে চায় প্রতিদ্বন্দ্বী শব্দকে।

একশো টনের তিন-পেয়ে শিয়ার-লেগ্ ক্রেনে এঞ্জিন নামছে। ক্যানাডিয়ান এঞ্জিন। বিস্ময়কর বহন ক্ষমতা শিয়ার লেগের। তার সাহায্যে এসেছে ভাসমান ক্রেন স্যামসন,—তিরিশ টন তোলে অনায়াসে। সত্যিই স্যামসন। নামকরণকারী রসিক। এতো কাজের মধ্যেও গমই প্রধান। গম আর গম। মোটা দড়ির জালে গমের বস্তাগুলো বন্দী ক'রে ক্রেনের মুখের আংটায় লাগিয়ে দেয়া হয় জাহাজের খোলের মধ্যে থেকে।

ক্রেন সেগুলোকে নামিয়ে দেয় ডকের "কোয়েতে" খালাসের জন্যে। ধাঙ্গুরা জাল থেকে মাছ বার করার মতো বস্তাগুলোকে

বার ক'রে গুদামজাত করে মাথায় কিংবা ঠেলাগাড়িতে ক'রে। মন্থর গতিতে শুরু হয় কাজ মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তর নেশায়। স্বাভাবিক গতি আস্তে আস্তে আবার ফিরে আসে সকলের অজান্তে। যান্ত্রিক অভ্যাস। টলতে টলতে কাজ ক'রে চলে ধান্নু। আর একটু! আজকের দিনটা কোনো রকমে—। ভগবান্ !!

ভেতরে বাইরে কতো তফাত। এতো যে গম মাথায় ক'রে বইছে, বস্তা মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে—অথচ এরই অভাবে অন্তরটা খা খাঁ ক'রে জ্বলে জ্বলে উঠছে। পা চলছে—চোখে অন্ধকার। ঘৃণ্য আতিশয্য!

শোরগোল ওঠে হঠাৎ। একাধিক কণ্ঠের খবরদার শব্দটা শোনা যায় শুধু। কয়েকটা গুরুভার পতনের শব্দ কাছের লোক শুনেও থাকবে বা, দূরে পৌঁছায় নি। মিলিয়ে গেছে অন্য শব্দের সমুদ্রে, হট্টগোলের উত্তাপ ক'মে সর্বকিছু প্রকৃতিস্থ হলে দেখা যায় একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষে পেয়েছে ন'মম্বর ক্রেনের তলায় কর্মরত পোর্টাররা। তিন নম্বর হ্যাচ্ থেকে তোলা গম-বোঝাই জালটা ডকের ওপর শূন্যে ঝোলা অবস্থায় হঠাৎ ছিঁড়ে যায়। সবক'টা গমের বস্তাই হুড়মুড় ক'রে পড়েছে 'কোয়ে' লাইনে। যে যেদিকে পেরেছে পালিয়ে বেঁচেছে।

কিন্তু—

ছ'নম্বর গ্যাঙের সর্দার ইদ্রিস খাঁর মুখ শুকিয়ে যায়। সজারুর কাঁটার মতো শক্ত আর খাড়া হ'য়ে ওঠে কাঁচা পাকা ঘন দাড়ি।

ধান্নুকে তো দেখা যাচ্ছে না বাইরে। গুঞ্জনরত জনতার মধ্যে চকচকাচ্ছে না তো তার সার্কাসের ক্লাউনের অঙ্গভঙ্গিকারী খাটো দেহ—!

সেকি— ?

সত্যিই—।

ওদিক থেকে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ছুটে আসে।

—আদমী দবা গ্যয়া।

গোল হ'য়ে ভিড় করে সবাই। দ্রুততালে বস্তা সরাতে সরাতে অস্ফুট আর্তনাদ ওঠে।

জিভ্ আর তালুতে আফসোস সূচক শব্দ তোলে—চিক্ চিক্।

—হা রাম! জান চলা গ্যয়া!!

উপুড় হ'য়ে পড়েছে ধান্নু সবকটা বস্তার বোঝা নিয়ে। বুকের দুদিকের পাঁজর এক হ'য়ে গেছে চেপ্টে। কশ বেয়ে গড়াচ্ছে তাজা রক্ত—। মুখটা একটু ওপরদিকে ওঠানো। হয়তো শেষ নিঃশ্বেস নেবার শেষ চেষ্টার সাক্ষী। মর্মন্তুদ দৃশ্য।

সুপার-কারগো, লেবার সুপারভাইজার দৌড়ে এলেন; এলো অ্যাম্বুলেন্স! ধান্নু এ সমস্তকে ফাঁকি দিয়ে অনেক আগেই প্রাণ নিয়ে সরে পড়েছে অন্য জগতে।

দুর্ঘটনার সংবাদের গতি আলোর মতো—। আশপাশ থেকে লোক ভিড় করে অবিলম্বে, শুভ্রাংশু সেনও। দৃশ্য দেখে চোখে জল রাখতে পারেন না উনি। উধাও-মন ছোটে ধান্নুর স্মৃতির আকাশে, তাঁর প্রীতির উৎস থেকে ঢেউ ওঠে উথলে উথলে। হঠাৎ পাশে কার কোমল উপস্থিতিতে সম্বিত ফিরে পান। ঝিংড়ি জেসোয়ারা। খবর পেয়ে থাকতে পারে নি; অত সাধের প্রাণ গেলেও না ছাড়ার-ডিউটি ফেলে চলে এসে দাঁড়িয়েছে সামরিক কায়দায় অ্যাটেন্‌শনে—। মিলিটারী ধাঁচে ও স্যালুট্ দেয় মৃত ধান্নুকে। বিদায় সম্ভাষণ! ওর কোচকানো শুক্‌নো মুখের চামড়া চোখের জলে তেল তেল দেখায়। 'একটা'র সাইরেনকে **Last Post** এর মতো শোনায়।—

—ঠিক করছিলাম ধান্নুর বাসাটা—!

এখুনি খবর পাবে যশমতিয়া। আর স্থর ক'রে আর পাঁচজন দেহাতিয়ার মতো কাঁদবে—

—হে ভগবান তু ক্যা কিয়া?

সে কান্না সাইরেনের গোঙানিকেও ডুবিয়ে দিতে চাইবে সময়—সময়।—

অ্যাম্বুলেন্স তো অনেকক্ষণ চলে গেছে। শুভ্রাংশু সেন এখনও দাঁড়িয়ে জলের ধারে—।

বছর খানেক পরে কমপেনসেশন কোর্ট থেকে রায় বেরোবে একহাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ওর স্ত্রীর নামে। ধান্নুর জীবনের দাম।

জয়েণ্ট এনকোয়ারীর কতোদূর?

আমাকে দেখতে পেয়ে বিষাদমাখা চোখে চাইলেন শুভ্রাংশু সেন—।

হ্যাঁ, প্রাথমিক ব্যাপারগুলো……।

কী সাব্যস্ত হ'লো?

ষ্টিভেডোরের স্লিঙ্গ পুরোন ছিলো! সেই দায়ী। আর কি?

আমি মৃদু হাসার চেষ্টা করলাম। পারলাম না—।

কিংবদন্তী!—

জুতো ফেরানো ছিলোনা ব'লে মেটিয়াবুরুজের নবাব ওয়াজেদ আলি কোম্পানী আমলে ইংরেজদের হাতে বন্দী হ'য়েছিলেন—।

নবাবী গেলেও সম্মান আর মেজাজ বাঁচানোর নবাবী তখন—। সিংহাসনে বসতে যাওয়ার সময় নাকি সোজা চলে গিয়ে, সিংহাসন থেকে একটু দূরে সিংহাসন মুখো জুতো রেখে খালি পায়ে বসার নিয়ম ছিলো—। আর দরবার শেষে উঠে আসার সময় কেউ একজন জুতোর মুখ ফিরিয়ে দেবে তবেই আবার না ঘুরে সোজা গিয়ে পায়ে গলানো হবে জুতো—। নিজে ঘুরে বা জুতো ঘুরিয়ে পরবেন ? ইস্ ! তার চেয়ে মৃত্যুও ভালো।

ইংরেজরা মেটিয়াবুরুজের নবাববাড়ি আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে গোপন এবং প্রকাশ্য পথে সকলেই জান-মান বাঁচাতে হলো উধাও—। বেগমমহল পর্যন্ত—। দরবার কয়েক মুহূর্তেই সিপাহি-শান্ত্রী রক্ষীশূন্য হ'লো—। নবাব দরবার করছিলেন। হঠাৎ সকলকে এদিক সেদিক হ'তে দেখে বুঝলেন পালানো উচিত—শিয়রে শমন। দুর্মুখ ছিলেন নাকি। প্রতিকথায় অশ্লীল গালাগালির মাত্রা দিতেন।

ব্যাপার দেখে হাঁক ছাড়লেন—কৈ শালা হ্যায় ? মেরা জুতিকো দিক ফিরাও !

ফাঁকা দরবারে ওঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরার আগেই ইংরেজ সৈন্যদের ভারি বুটের আওয়াজে সমস্ত কিছু ঢেকে গেলো—। জুতোর মুখ ফেরানো হয় নি, নবাব কি করে ওঠেন ? উনি ইংরেজদের হাতে নিরুপায় হ'য়েই ধরা দিলেন বসে বসে—।

কাহিনীটা আবগারী বিভাগের আওতায় থেকে কল্পনা করা কিনা ঠিক না জানলেও বিশ্বাস করতে বেশ লাগে কিন্তু—। সত্যি হ'লে আর জুতোর দিক্ ফেরানো থাকলে হয়তো আবার মেটিয়াবুরুজ খিদিরপুর উদ্ধার করতেন নবাব, আর ডক তৈরী হ'তো না ওখানে ; না হলে আমাকেও আসতে হ'তো না

চাকরি ক'রতে। বিশ্বাস করার অন্য কারণও আছে, কেন না অনুরূপ আর একটা ঘটনার জন্যে আমি এখানে বন্দী হলাম যে! তুমিতো জানোই!

এখানের চাকরির ইণ্টারভিউ পাবার সময় আমি গিরিডিতে। কেউ আসতে দিতে চায় না। ও সুযোগ যাক! এই-ভাব। এমন অসহযোগ যে ট্রেন ধরার জন্য গাড়ি বার করতে ব'লে দেখা গেলো গাড়িটার মুখ ফিরিয়ে বার ক'রে এনে পৌঁছে দেবেন যে ড্রাইভার বাহাদুর, তিনি অনুপস্থিত। বৌদি ফন্দি ক'রে ভাগিয়েছে তাকে। দাদা বাইরে। তুমি তো শুনেছ। ঐতেই হঠাৎ জেদ চেপে গেলো। যেতেই হবে। যা কখনো করি নি। সুটকেস হাতে হাঁটা। আর গলদঘর্ম হ'য়ে ট্রেন ধরা শেষ মুহূর্তে—। গাড়িটা হাজির থাকলে আমি নিজেই হয়তো রাস্তায় মতলব পাল্টে বাড়ি ফিরলেও ফিরতে পারতাম। আগে কতবারই তো গেছি—।

তাই বলছিলাম ঐ মুখ ফেরানোর ব্যাপার—।

এসব কথা আমার মনে আসে নি এমন নয়, কিন্তু এমন ক'রে আসে নি। পূজো আসছে-আসছেটাই যেমন ভালো; মাইনে পাবো-পাবোটাই যেমন ভালো, তেমনি কনফার্মড্ হবো-হবোটাই মন্দ নয়, অন্তত আমার কাছে। পূজো এলেই মাইনে পেলেই শেষ হওয়ার মতো confirmed হলেই স্বাধীনতা শেষ। এমনি একটা মনোভাব হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সেদিন বিনা নোটিসে। দেখতে দেখতে এমনি ক'রে ক'বছর চাকরিই করলাম না, পাকা চাকুরে হ'য়ে মনে হ'লো—যাঃ, এবার শেকড় নেমে গেলো; বাঁধা পড়লাম। আর সঙ্গে সঙ্গে—বললে বিশ্বাস করবে না—ভীষণ অস্বস্তি আর অসহিষ্ণুতা; নিজের বিপদ আর অনিশ্চিৎ ভবিষ্যত জেনেও! ভীষণ অস্বস্তি—।

বাঁধন ছেঁড়ার আকৃতিতে গুমরে গুমরে উঠতে লাগলাম অকারণে। হঠাৎ। কেনো জানি না। এ মানসিক বিশৃঙ্খলার কোনো সঙ্গত কৈফিয়ত নেই। এ স্বভাব হয়তো রক্তে রক্তে মেশানো বলেই—। হয়তো নয় নিশ্চয়ই। আর বলেছি, ঝড় শুধু ঝড়ই নয়, বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ—প্লাবন—একা নয় কেউ। নানাবিধ বাহ্যিক আচার-ব্যবহার মানসিক ঝড়ের পার্শ্বচর হয়ে দেখা দিলো অচিরাৎ। ছুতোনাতো, নানা কারণ, প্রায়ই চাকরির বিপক্ষে দাঁড়াতে শুরু করে দিয়ে বিপর্যস্ত ক'রে ছাড়তে লাগলো সেদিন থেকেই। গ্রহচক্রের বিধান। প্রথমেই কাল হ'লো কোয়ার্টার্স্। পোর্টে শুনতাম চাকরি পাকা হ'য়ে কোয়ার্টার্সের জন্যে দরখাস্ত করলে, খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা হ'লে রিটায়ার করার মাসখানেক বাকি থাকা-সময়ে কোয়ার্টার্স মঞ্জুর হয়েছে ব'লে চিঠি আসে।

এ-হেন পোর্টে দু'মাসের মধ্যে আমার কোয়ার্টার্স্ কী ক'রে কী কার্যকারণ পরম্পরায়, ঠিক হ'য়ে গেলো তা বোধহয় ভগবানও বলতে পারেন না—! পোর্টের ভগবান পারেন কি? বোধহয় পারেন। এ ব্যাপারে সমাদ্দার সায়েবের কতোটা হাত ছিলো জানি না, তবে যাঁর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছিলো তাঁর কথায় আসছি আস্তে আস্তে। উঃ, হুঃ,—বেশ জোরেই আসতে হবে দেখছি।

মিঃ মণি চ্যাটার্জি! তিনি যে চ্যাটার্জি সায়েব হবেন এতো সাধারণ কথা; কিন্তু না, তিনি মণি সায়েব, তিনি অসাধারণ—।

তপেন দত্তের মুখে প্রথমে শুনেছিলাম যে পোর্টের কাজের একটু এদিক-ওদিক হ'লেই যেন নিজের বাপ-মা মরার শোকের মতো লাগে ওঁর। কারো ভুল দেখলে দাঁত মুখ খিঁচিয়েই নয়, শরীরের সমস্ত পেশীর যতো রকম সম্ভব-অসম্ভব সঞ্চালন, আকুঞ্চন প্রসারণ এবং অস্বাভাবিক শক্তি সংযোজন ক'রে তেড়ে এসে আক্রমণ করবেন উনি, একাধারে মুষ্টি-মল্ল-বহুমুখী

ব্যায়ামবীরের মতো—। শুধু মাত্র মারতে বাকি রাখলেও এক-এক সময় মনে হবে—এই বুঝি মেরেই বসলেন ত্রুটি হওয়া-অভাগা নিম্নপদস্থ অফিসারকে। ওঁর তখনকার রূপ, রূপ নয় অপরূপ—দেখার মতো। অথচ দেখ, কাজের যে কিছু উন্নতি হ'লো তাতে, তাও নয়! As-পূর্বম! হাইড্রলিক প্রেসারে goes on for ever।

এ হচ্ছে তপেনের ভাষা—ডকের বিভিন্ন ভাষার co-existence. ইংরিজী, বাংলা-হিন্দীর সরবতী ভাষার বিশেষ টেক্‌নিক্‌টার ও প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। চার্জ বুঝিয়ে দেবার সময় বলবে—নাম্বার 12 Shed washing বন্দোবস্তস্ have to be made! একদিন গিয়েই দেখি বেয়ারারদের ব্যাপার নিয়ে এখানকার ভাষায় বাবুদের ফায়ার করছে—রবিবার কী বুকিং ক'রেছিলেন? লোকজন all কাটোয়া! I had ro write letters, enter in the peon book and make it লাগাও myself। তপেনই বলেছিলো সব, মণি সায়েবের ইতিহাস। পোর্টটা যেন ওঁর মেটারন্যাল আংকেলস্ হাউস্। নানান আব্দার! অথচ এতো বোকা যে, লিউইসের কথা ছেড়েই দাও, সাধারণ ভালো মানুষ কাতলামাছ শান্তি বিশ্বাসের ব্লাফ্‌ও ধরতে পারেন না! তপেনের সঙ্গে মণি সায়েবের মাংস-দুধের সম্বন্ধ। তার কারণ তপেনের মতে একটিই। তপেন ব্রাহ্মণ নয়, দত্ত। না না, বর্ণবিদ্বেষ নয়! নতুন অফিসার এলেই মণি সায়েব প্রথমেই চিন্তা কোরবেন তার সঙ্গে নিজের চারটি উপযুক্ত (?) মেয়ের সম্বন্ধ করা যায় কিনা? যিনি পালটি ঘরের হবেন তাঁর সঙ্গে উনি ততদিনই নরম ব্যবহার কোরবেন যতোদিন না প্রস্তাব নানা অছিলায় প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। তপেন এক নম্বর কারণের জন্যেই ওঁর চক্ষুশূল নয়। ওর একটা, একটা নয় একাধিক, দু'নম্বর কারণ আছে। তপেনের গুণ যতো দোষ তার চেয়েও

অনেক বেশি। এতো উগ্র আমি আর দেখি নি। ভাতুড়ির মতো অবস্থা না হয়। ডিউটিতে মদ খাবে জল খাওয়ার মতো। অন্তত সপ্তাহে একটা ক'রে পুলিস কেস থাকবে ওর বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অপরাধে। মাসে দু'বার ওর স্পোর্ট কার'টা কারখানায় যাবে ধাক্কায় জখম হ'য়ে—। তার ওপর মেয়ে। নতুন নতুন, সর্বজাতের। রাইট্ এ্যাণ্ড্ লেফ্ট্। কোনোদিনও সময় মতো ডিউটিতে আসবে না। কিন্তু ডিউটি থেকে যাবে হয় একটু আগেই না হয় সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। কারণ দুবার লেট করে না তপেন। আসার সময় লেট্ করেছি, আবার যাবার সময় লেট করাটা কী ভালো দেখায় ? হাজার হোক চাকরি তো। অদ্ভুতভাবে হাসতে হাসতে গোলাপী রঙের ঠোঁটে চিড় খাইয়ে বলবে ও।

এক রবিবারে ছ'টার ডিউটি। ওর ঘুমই ভাঙ্গলো পৌনে আটটায়। সঙ্গে সঙ্গে চাকরি gone রে বাবা! ব'লে কোট হাতে ক'রে লাফিয়ে গাড়িতে উঠে দশ মিনিটে সেকশনে হাজির। ঘড়ির কাঁটা দুটো আটটা-বারোটায়। চাকরির শুধু বারোটা। ওর চক্ষুস্থির চেয়ারম্যান্, ট্রাফিক ম্যানেজার আর মণি সায়েবকে ওর অফিসের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আলোচনা রত দেখে। নার্ভ মাই ডিয়ার! ওই সময় দরকার সাহসের। যেন কিছুই হয় নি—ঠিক সময়েই ডিউটিতে এসেছিলো, বারো নম্বরের দিকে জরুরি ব্যাপারে রাউণ্ড্ দিতে গিয়েছিলো ফিরছে—এমনি ভাব দেখিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ওদের মুখোমুখি হ'লো। আর দু'একটা প্রশ্নের উত্তরে আগের দিনের মুখস্থ ক'রে রাখা খুঁটিনাটি এমন প্রাঞ্জল ক'রে বললো যে কেউ বুঝতে পারা দূরে থাকুক, ঠিক সময়ে ডিউটিতে আসে নি জেনেও গজ গজ করতে করতে মণি সায়েব ওপরওলাদের কাছে কিছু বলতেই পারলেন না-ই নয়, চেয়ারম্যান সায়েব মুখের ওপরই ব'লে গেলেন—Smart boy!

তপেনই বহুদিন আগে একদিন মণি চ্যাটার্জির জীবনী শুনিয়েছিলো। যতোটা জানে তার বেশিটা রঙ চড়িয়ে দেয়া জীবন-কাহিনী। শুনিয়েছিলো কেমন ক'রে তখনকার T. M. সামনার সায়েবকে খোসামোদ ক'রে, তাঁর গাড়ি ঠেলে উনি খুব নীচুপদ থেকে ধাপে ধাপে ওপরে উঠেছিলেন; শুনিয়েছিলো ওঁর চিরুরুগ্না স্ত্রীকে নিয়ে মণি সায়েবের সাংসারিক জীবনের grim tragedy'র কথা। পুত্রহীন শুধুমাত্র চারটি মেয়ে নিয়ে ওঁর দুর্ভাবনা। দুষ্ট মেজাজের প্রতিক্রিয়া কেমন ক'রে নিম্নপদস্থের মাথার ওপর পড়ে তাও বেশ মনস্তাত্ত্বিক শিল্পীর তুলিতে রঙ ফলাও ক'রে আঁকার ত্রুটি করে নি তপেন—।

—কিন্তু সাবধান! স্বজাতি কোনো ছেলে এলেই উনি—জামাই হ'লে কেমন হয়—এমনি মানসিক দৃষ্টিতে দেখবেন প্রথমেই! ওর বহু চেষ্টায়ও বিয়ে না হওয়া, আটাশ বছরের—প্রতি বছর কুষ্ঠি পালটে আঠারো করা—মেয়ের সুপাত্র না হ'তে পারলে প্রীতির চোখে দেখবেন না।

সম্ভবত এই জন্যেই সমস্ত অফিসারদের ওপর রাগ ওঁর। সত্যিই! তপেন মিথ্যে বলে নি। আমার কোয়ার্টার্স টা এতো সহজে পাবার মূলে উনিই ছিলেন সন্দেহ হ'য়েছিলো। পোর্ট যেমন ওঁর স্বর্গাদপি গরিয়সী, পাশের বাংলোর লেট সায়েব ঠিক তার উল্টো। কিছু না। Go to hell ভাব। আমরা যখন দেখেছি ওঁর অবসর নেয়ার সময় আসন্ন। বিপত্নীক লেট্ সায়েবের অত টাকা, তবু তালিমারা হাফপ্যান্ট ছাড়া আর কোনো দিন দেখা যেতো না তাঁকে—। একটা নিঃসীম নির্লিপ্ততা আর উদাসীনতা—। মাঝে মাঝে বিনা কারণেই 'up' preposition যোগ ক'রে একটা অমুদ্রণীয় অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করা কথার মাত্রা ওঁর। রাউণ্ডে এসেছেন হয়তো। দশ নাম্বারের যোগ্য শেড্ ফোরম্যান নানান

অসুবিধের কথা বোঝাতে বোঝাতে ওঁর সঙ্গে হাঁটা শুরু ক'রলেন 'কী' লাইনের ওপর দিয়ে দিয়ে ক্রেনের ছায়ায়-ছায়ায়। শুনছেন আর ঘাড় নাড়ছেন : yes ? I see ! so what ? এই সমস্ত কথা শুধু ! বলতে বলতে আর চলতে চলতে প্রায় সিকি মাইল পার হ'য়ে তু'নাম্বার শেডের পেছনের উইকেট গেট দিয়ে বেরিয়ে ইষ্ট সাইডে যাবার জন্যে সিঁড়ির প্রথম ধাপে যখন পা দিয়েছেন তখন শেড ফোরম্যান প্রিয়লাল রায়ের টনক নড়ল। এতোক্ষণ তো বলেই চলেছেন। সায়েব তো কিছুই নির্দ্দেশ দেন নি ! দেন নি আদেশ ? কী করা হবে তাহ'লে ? তাড়াতাড়ি আর কথা না বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন—Then Sir, what do you suggest ?

মিঃ লেট উত্তরে সেই up preposition যোগে অশ্লীল শব্দটি উচ্চারণ করলেন মুচকি হেসে। হতবুদ্ধি শেড ফোর-ম্যানের দিকে চোখ পড়তেই আবার বললেন Damn it ! শেষে আর একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ফিক্ করে হেসে, এই পাগলের ব্যবহারে হাসবেন না কাঁদবেন ঠিক করতে না পারা, অপমানে লাল শেড ফোরম্যান্‌কে সান্ত্বনা দিলেন শেষবার—Cheerio Roy ! ওঁর চরিত্র সকলের জানা থাকলেও এতটা আশংকা না করা প্রিয়লাল রায়ের কপাল থেকে চোখ তুটো যথাস্থানে ফিরতে সময় লেগেছিলো। এ কীরে বাবা !!

সেই লেট সায়েব Traffic Superintendent Mr Lett থেকে late Traffic Superintendent হতেই নাকি তাঁর ছেড়ে দেয়া বাংলোটা আমার প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝে আমাকে Allot করা হয়েছে বলা হলেও, বুঝতে বাকি ছিলোনা আসল উদ্দেশ্য—। কিং জর্জেস ডকের কোল ঘেঁষে গঙ্গার ওপরই সুরিনাম কোয়ার্টার্স। তারই একখানা 'এ' টাইপ বাংলো আমার ভাগ্যে শুধু শুধুই পড়লো না।

আমার মতে পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য এই ডক! এর মধ্যের মানুষের কথা বিচার করলে অন্তত! অবাক করা মানুষ বার্ন সায়েব। ওঁকে যেমন এক এক সময় interesting মনে হয় তেমনি ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে ওঁকে ছাড়িয়ে ওঁর কমিউনিটির ওপর। একটা বিদ্বেষই বুঝিবা। সকলেই অমন নয় জেনেও। মাথায় কিছু নেই। বোঝেন না নয়, বুঝতে চাইলেনই না কোনদিন। শুধুমাত্র ইংরিজী মাতৃভাষা হওয়ায় তখনকার ইংরেজ আমলাতান্ত্রিকতার ছত্রচ্ছায়ায় লালিত, পালিত, পরিপুষ্ট হ'তে পেরেছিলেন। আজকের দিনে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে হ'লে এদের মতো লোকের মাসে দেড়শো টাকা উপার্জন করাও শক্ত।

ঢিলেঢালা easy going দায়িত্ব-বোধ শক্তিশূন্য হাসিখুশি মানুষ—। শুধুমাত্র সিনিয়রিটির জোরেই ডেপুটি। আর আশ্চর্য এই যে পোর্টের বড় বড় ব্যাপারে রেণ্ট আর আয়ের পথ ঠিক করার গুরু দায়িত্ব এঁর হালকা মাথার ওপর।

অথচ উনি এক বর্ণ বোঝেন না। যা করবার সব হেড-ক্লার্ক সরোজবাবু। রাত পর্যন্ত থেকে আইন কানুন পড়ে, Schedule মেনে, কমিশনার্স-এর অনুকূলে চার্জ বেঁধে এক বিরাট নোট লিখে উনি সায়েবের টেবলে ফাইল দেবেন order চেয়ে। সায়েব পরদিন নিত্যনৈমিত্তিক আড়াইটার পর লাঞ্চ থেকে ফিরে ফাইলের পাহাড়ের দিকে তেতো মুখে চেয়ে ডাকবেন সরোজবাবুকে—।

সরোজবাবু এসে পাশে দাঁড়াবেন—। বেয়ারার এক এক খানা করে ফাইল এগিয়ে দেবে, আর বার্ন সায়েব সরোজ বাবুর সইওলা নোটটার দিকে একবার চাইবেন, Yes or No? কী লিখবেন জানতে চাইবেন। সরোজ বাবু একটু চিন্তা

করার ভান ক'রে Yes বললে সায়েব ইয়েস লিখবেন আর নো বললে No. সায়েবের সকালে একবার রাউণ্ড দেয়া ছাড়া ঐ মাত্র কাজ—। সায়েবের মাইনে আঠারোশো। সরোজবাবুর? সরোজ বাবুর আড়াইশো—। তার ওপর শনিবারে কোনো ফাইল দিয়ে ওঁকে বিরক্ত করা চলবে না। কারণ রেস স্বর্গ ধর্ম, পরমন্তপই নয়, রেসই সর্বদেবতা। অতোস্মৃদ্ধ, পা টেবলে তুলে দিয়ে সেদিন কয়েকজন বন্ধু বান্ধব আর 'বকি' নিয়ে কনফারেন্স বসবে ওঁর ঘরে দশটার পর থেকেই। রেসিং গাইড ব্লু পেন্সিলের দাগে দাগে জর্জরিত হ'য়ে উঠবে। লিউইস আর উনি নেতা। কাজের ক্ষেত থাকলেও এর ক্ষেত পড়বেনা কোনো দিনও। অসুস্থ থাকলেও বাড়ি থেকে লিউইসের কাছে দাগান্বিত খামেমোড়া গাইড আসবে sure success 'এর' suggestion এর মতো। লিউইস হাসবেন—How mad? অসুখেও এর চিন্তা?

চালুনির ছুঁচের বিচার। লিউইস অসুস্থ হলেও একই ব্যাপার। খামে মোড়া probable winners. তখন বার্ন হাসবেন—

Strange fellow! Even in serious illness—? Ah??

কিন্তু কথা তা নয়। বার্ন, বার্নিং প্রব্লেম নয় আমার—। প্রব্লেম, এলো মণি সায়েব আর ম্যাকিনটশ বধূর কাছ থেকে! কোয়ার্টার্সে এসে ছুটো জিনিস মনে হলো—এক, শেষে চাকরিতে

পাকা হ'য়ে আটক পড়ে গেলাম নাতো? তুই, চ্যাটার্জির মতলব তো ভালো মনে হচ্ছেনা! পাশেই ওঁর কোয়ার্টার্স। ওঁর মেয়েরা একদিন যথারীতি আলাপ ক'রে গেলেন। তপেনের কথাই ঠিক। বড় মেয়ে মাধুরীর যতো বিশাল বপু, পরের মেয়ে শিপ্রা ততো ক্ষীণা-তন্বী। পরের গুলোকে না হয় ধর্তব্যের মধ্যেই না আনা হ'লো—। সাবধানে থাকি। তবু একদিন কে, জি, ডি, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ব্যানার্জি সায়েবের মুখ দিয়ে পরোক্ষভাবে সেই বহু প্রতীক্ষিত প্রস্তাব এলো বিনা বিজ্ঞপ্তিতে।

হঠাৎ কে, জি, ডি'তে কাজ করতে হ'য়েছিলো একদিন। সকালের পোজিশন্ দিয়ে কাজকর্ম চালু দেখিয়ে অফিসের সামনে বড় সায়েবদের see off করছিলাম যাকে বলে—। মিঃ ব্যানার্জি, ওখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, হঠাৎ চ্যাটার্জি সাহেবকে ব'লে উঠলেন আমাকে দেখিয়ে, ভিড় থেকে একটু দূরে কথা বলতে বলতে নিয়ে গিয়ে—মেয়ের বিয়ের জন্যে অত ভাবছেন কেন স্যার? খুঁজলে হয়তো কাছেই দু'একজন সৎপাত্র মেলে! ব'লেই যেন হঠাৎ আমাকে আবিষ্কার করলেন—এই যেমন ঘোষাল; এরও তো বিয়ে হ'তে বাকি এখনও! আমি প্রমাদ গুনলাম। বুঝলাম পূর্বাহ্ণেই কথাবার্তা হ'য়ে তৈরী ক'রে রাখা আলোচনার রোমন্থন-—।

—কী ঘোষাল, এবার তো বিয়ে হওয়া উচিত! দেখি আমরা?

প্রায় ভগবানের নাম ক'রে, চোখ কান বুঝে ব'লে ফেললাম।

—সে স্যার ঠিক হ'য়েই আছে। মানে আমারই এক আত্মীয়া—। অনেকদিন থেকেই engaged। ভালো ক'রে চাইতে না পারলেও স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো প্রায়-একই উপায়ে বিনয়-প্রত্যাখ্যান আর একবার শোনা—চ্যাটার্জি সায়েবের বেগুনের মতো মুখ—। নিমেষে আর-আর বারের মতোই,

সামলে নিয়ে গম্ভীর হ'য়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন উনি। সেই শুরু বোধ হয়,—শেষের শুরু—।

শিব ঠাকুরকে যদি অনার্য দেবতা হ'য়েও আমাদের ভাগ্য-বিধাতা ব'লে মেনে নিতে হয়, তাহলে আমাদের উপর দুর্বিপাক, দুর্ভাগ্যের ত্রিমুখী আক্রমণের কথা বিচার করলে একদিকে যেমন তাঁর ত্রিশূলের আক্রমণ সাব্যস্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি বোঝা যায় আমরা সত্যিই আর্য; তাই অনার্য দেবতার অহেতুক আক্রমণ। এখন ত্রিশূল অন্য যা কিছুরই প্রতীক হোক না কেন, আমাদের প্রব্লেমের প্রতীক। কারণ আমি সব সময়েই দেখেছি দুর্ভাগ্য-প্রব্লেম তিন মুখ নিয়ে, ত্রিশূলী আক্রমণে বিপর্যস্ত ক'রে ছেড়েছে। সমস্যার তৃতীয় শূলটি ম্যাকিনটশ ফ্যামিলি থেকে আসতে পারে ভাবতে পারি নি—। আমার বাংলোটার দুটো অংশ। প্রবেশ পথ বারান্দা সমস্তই এক—। এসে দেখেছিলাম অন্য অংশের বাসিন্দারা ছুটিতে বাইরে—। দিন পনেরর মধ্যেই ওঁদের আবির্ভাব—। ম্যাকিনটশ্ দম্পতি মিঃ মাকিনটশ ম্যারিনের বড় অফিসার—হারভার মাষ্টার চমৎকার লোক। স্ত্রীও খুব সোস্যাল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই ধারণা গেলো পাল্টে; মনে হ'লো, হয় তিনি বাড়াবাড়ি রকমের উগ্র সোস্যাল, না হয় কিছু নয়; কারণ বুঝতে বাকি থাকলো না যে তিনি সোস্যাল সম্পর্কের বেড়া ডিঙ্গিয়ে পার্সোন্যালে আসতে ইচ্ছুক—। ভদ্রতা রক্ষে ক'রে প্রথম কয়েকদিন বেশ অভিবাদন আদান প্রদান, বিকেলের দিকে চায়ে ডাকা—এবং পাল্টা ডাক শোনার ওপর দিয়ে চলছিলো—।

মিঃ ম্যাকের কঠিন ডিউটি ; দিন নেই রাত নেই চব্বিশঘণ্টাই ওভারটাইম কাজে থাকতে হয়। মিসেস একা। সব সময়েই লোন্‌লি ফিল করেন। প্রথম প্রথম আমিই হিমালয়-ভুল ক'রে সঙ্গ দিতে চেয়েছিলাম। হঠাৎ আচার ব্যবহারের পরিবর্তন নজরে পড়ল। চোখের চাউনি কেমন যেন বেপরোয়া এলানো এলানো—। তুদিন নির্জন বিকেলে স্লিপ দিয়ে চায়ে ডেকে পাঠিয়ে নানাভাবে প্রকাশ করতে চাইলেন নিজেকে—। কী পোশাক! চাওয়া যায় না—চাওয়া যায় না! চেহারা, অস্বীকার করব না, ওঁর স্বভাবতই ভালো। আমাদের চোখে এতোটা উগ্রতা বোধ হয় সহ্য হয় না, তাই মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে কাটাতে হয়। কিংবা মিথ্যে বলব না—তু একবার চোরা চাউনি বড়জোর ঘুরিয়ে আনা—। কোমর থেকে কয়েক ইঞ্চি নানানো সুইমিং কষ্টিউম ছাঁদের ঢিলে too short—শর্টের ওপর বুকের একটু ওপারে উঁচে জাঁকিয়ে কামড়ে ধরা আঁটসাঁট নাম না জানা জামায় কী সাবলীল ভাবভঙ্গি! যেন কিছুই নয়!

তার ওপর যখন সামনের সোফায় পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসলেন .মিসেস—!

সুঠাম কদলী বৃক্ষবৎ থলথলে উরুদেশের তিলের দাগটি পর্যন্ত চোখকে হাতছানি দিতে থাকলো—।

দেখার পর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় আমার যা মনে এলো তা মাকড়সার জাল—। ভেবে দেখলাম ভুল হয়েছে, না জেনে ওঁর রেঞ্জের মধ্যে এসে পড়া গেছে হঠাৎ। সেদিনও সামলে সুমলে চলে আসা গেলো—! তারপর থেকেই পরোক্ষ আক্রমণ চলতে লাগলো নানাভাবে—।

ভোর পাঁচটায় স্নান করতে গিয়ে বাথরুমের প্রথম জানালার সামনে থমকে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে পড়তে হ'লো—অনিচ্ছা—নীতির প্রবল তাড়না— সত্ত্বেও—।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে—অস্বীকার ক'রে লাভ কি—বেশ একটু যেন মত্ততার সঙ্গে দেখলাম আলো জ্বালিয়ে, ওঁর বাথরুমের জানলার সামনে, নগ্নদেহে স্নান করছেন—বিংশ শতাব্দীর আফ্রোদিতে, দ্বিধা দ্বন্দ্বহীন হ'য়ে—ইচ্ছে ক'রে—। উনি ভালো ক'রেই লক্ষ্য করেছেন আমার ছ'টায় ডিউটি করতে হ'লে এই সময় স্নান সারতে হয়। হিসেব করে আসা—! দেখার পর প্রথম যাকে মনে পড়ল সে তুমি—। মনে হ'লো অন্যায় করেছি, অপরাধ,—তোমার কাছে—। আর মনে হয়েছে—এ বেশ ভালো হচ্ছে না। মুক্তি চাই এসব থেকে। কেমন ক'রে পাই—।

এর আগেই কয়েকদিন ভোরে বারান্দায় বেতের টেবল্‌টার ওপর তাজা ফুল দেখেছি—প্রীতির রাষ্ট্রদূত—। আর নানান সন্দেহ করেছি—। তবে কি মিস চ্যাটার্জি? ভুল ভাঙ্গলো। যাকে সন্দেহ করার কারণ ঘটেনি তিনিই। মিসেস ম্যাকিন-টশ। আজ বুঝলাম—।

তিনটের ডিউটি থেকে ফিরে একটু কাগজের পাতা ওলটাচ্ছিলাম পাইপে আগুন ধরিয়ে—খাটের ওপর আধশোয়া হ'য়ে—।

Knock ক'রে, may I come in? বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এলেন মিসেস—।

—গুড আফটারনুন্‌। ফিলিং লোনলি?

ধড়মড় ক'রে উঠে বসলাম।

—গুড আফটারনুন্‌।

তারপর যা কথাবার্তা হ'লো তা সোজা বাংলায় এই—।

—বিরক্ত করতে এলাম। বড় একা লাগছে! কিছু মনে করছো?

—ঠিক আছে—!

—তুমি ছাত্রের নিষ্ঠায় পড়াশোনা কর এখনও? কী ক'রে পারো? এক ঘেয়ে লাগে না?

শুধু একটু হাসিতে এর উত্তর দিলাম—।

তারপরেই একেবারে পয়েণ্টে চ'লে এলেন—

—তুমি বিয়ে করো নি কেন?

—মনের মত মেয়ে পাই আগে—।

—কী-রকম মেয়ে পছন্দ তোমার? খোঁজার উৎসাহ তো দেখিনে!

—এক কথায় বলা শক্ত! হাসলাম—।

—তুমি এতো লাজুক কেন ঘোষাল? দুপুরের দিকে গিয়ে আমার সঙ্গে গল্প ক'রে কাটাতে তো পারো! আমিও একা থাকি; চাকরবাকর কেউ থাকে না। অসুবিধে কোথায়?

—উনি ইংগিত-ভরা হাসি হাসলেন। উঠে আমার খাটে শরীর এলিয়ে দিয়ে মাথার ওপর দিয়ে বাহু-লতা তুলে সোজা করে ছড়িয়ে দিলেন।

—কিছু মনে কোরোনা।

এদিক ওদিক স্পষ্ট দেখতে পাওয়া সিল্কের, কাঁধ পর্যন্ত হাতকাটা, পোশাক। নীচে জালি-জালি বক্ষাবরণ। মসৃণ তক্‌তকে আর্মপিটের ইচ্ছে-প্রদর্শনী—। বেশ ভালো বোধ করলাম না—।

—চা বলি?

যেন মদ খাওয়া জড়ানো জড়ানো গলায় বললেন, অত তাড়া কিসের? আমাকে কী সহ্য হচ্ছে না?

বিশ্বাস কোরো, মুহূর্তে মনে হ'লো ভীষণ বিপদগ্রস্ত আমি। আর মনে পড়লো পরপর মাকে আর তোমাকে—। বিপদে পড়লে তাই হয়—। আমার মানসিক গঠনটাই কেমন যেন।

খুব জটিল গম্ভীর মুহূর্তে হঠাৎ খেলাচ্ছলে হালকা কথা বা সরস ইংগিতের এ্যান্টিক্লাইম্যাক্স ক'রে কী এক সাধ মেটাই আর বিরাগভাজন হই অন্যের। মিসেস ম্যাকিনটশের ঐ ব্যাপারে হঠাৎ সেই স্বভাবটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ভাবালো—কাশ্মীর হানাদারদের aggressor সাব্যস্ত ক'রে ঐ কথার ষ্ট্যাম্প লাগানো যেমন কার্টুন বেরিয়েছিলো, তেমনি একখানা বড়-গোছের Aggressor ষ্ট্যাম্প দিয়ে মিসেস'এর সাদা আমেরিকান সিল্কের জামার পিঠের দিকে একটা ছাপ মারলে কেমন হয়! সত্যি আক্রমণ হ'লে সহজাত প্রবৃত্তি বশে মানুষ যে ব্যস্ততায় আত্মরক্ষায় তৎপর হয় বোধ হয় তার চেয়েও দ্রুতগতিতে দঁড়িয়ে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে পর্দা খুলে, চাকরকে ডাক দিলাম—ঈশ্বর! আর্তকণ্ঠস্বরটা বাঁচাও—বাঁচাও'এর মতো হয় নি এমন কথা জোর ক'রে বলতে পারি না—। নামমাহাত্ম্য বটে! চাকরকে ডাকতে পরোক্ষে ফাঁকি দিয়ে ভগবানকে ডেকে পূন্যই করিনা—; বিপদে সত্যি ত্রাণকর্তার ভূমিকাতে অভিনয় করিয়েও ছাড়ি—।

ঈশ্বরের সাড়া পেয়ে নিঃশ্বেস পড়ল। ফিরে দেখি উঠে বসে দু'হাত মাথার ওপর দিকে তুলে আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে মৃদু হাসলেন মিসেস ম্যাকিনটশ।—টেক টাইম মাই বয়! সে হাসির অর্থ যদি সত্যি ক'রে থাকতে পারি তো ঐ—

* * *

এতোদিন জানতাম ঘোড়া হ'লে চাবুকের অভাব হয় না। আমাদের এতোদিনের বাঁধাধরা কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধ সত্যের বিপরীত মিথ্যে দিকটা সত্য ব'লে দেখছি আজকাল। জানতে অনেক বাকি ছিলো—। আছেও। দিনকালের সঙ্গে সঙ্গে উল্টে পাল্টে যাচ্ছে আগের কথার অর্থ, কথাও। এখন দেখছি চাবুক হ'লে ঘোড়ার অভাব হয়না। এ চাবুক ক্ষমতার—, দপ্তরী ক্ষমতার—। চিরকালই অশ্রদ্ধা ঔদাসীন্যের চোখে বিচার করেছি ঐসব সংকীর্ণ গণ্ডির ক্ষমতার চাবুক-ওলাদের। দেখেছি করুণা-ঘন চোখে। আহা- !

রাষ্ট্র শিল্প-সংস্কৃতি-সমাজ জীবন, কোথাও এঁরা, ক্ষমতা-শ্রদ্ধা-সম্মানের সিংহাসনের ধারে কাছে ঘেঁষা তো দূরের কথা, সিংহাসনাসীনদের দ্বার রক্ষা কার্যের দায়িত্বটুকুও পান নি। জীবনের ঐ সমস্ত আলো-বাতাসের দিকে ফিরেও না চাইতে পেরে, কোনোক্রমে চোখ কান বন্ধ ক'রে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম তিনটে বেড়া ডিঙ্গিয়ে একেবারে গ্রাসাচ্ছাদনের চারণ ক্ষেত্রে ! ঐ পর্যন্ত দৌড়—। কিন্তু জৈবিক প্রতিহিংসাপরায়ণতা যাবে কোথায়? কোথাও যা পান নি তা সুদে আসলে উসুল করতে তো একমাত্র চাকরি ক্ষেত্র। তাই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপের পরাকাষ্ঠা সেখানে।

ক্ষমতা-সূতো একটু আলগা পেলে হয়, উঁচুতে ওঠার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকার সর্ষপজাত তরল পদার্থের যথেচ্ছ যথাস্থানে ব্যবহারে পশ্চাৎপদ হবেন না এঁরা কোনোমতেই—।

তারপর বহু আয়াসলব্ধ ক্ষমতার চূড়ান্ত ব্যবহার বা অপব্যবহার, সংকীর্ণ পরিধির ঐটুকু ক্ষমতা সাত রাজার ধন মানিক। এঁদের হাবভাব পাত্রভেদে বিভিন্ন—বিচিত্র—। ওপর-ওলার কাছে আনুগত্য আর বিশ্বস্ততার অবতার, আর নীচের তলার কাছে নৃসিংহ-অবতার।

আমার চিরকালের ধারণা—যাঁরা ওপর দিক থেকে যতো নিপীড়িত হন, ততোই নীচের দিকে সেই গতিতে নিপীড়ন চালিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখেন। ওপর দিক থেকে পাওয়া চাপ নীচের দিকে গড়িয়ে দেন শুধু। আর যখন একবার মনে হ'লো অমুককে ওঁদের ভাষায়—টাইট্ দেয়া চাই, তখন যুক্তি নীতির বালাই থাকাটাই অযৌক্তিক। পূর্বপুরুষের জল ঘোলা করার মিথ্যে অপবাদের মতো—তৈরী করা অপরাধে প্রাণদণ্ড।

মণি সায়েব হয়তো আমার মধ্যে এমনি একটা দোষ দেখলেন ওঁর বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখানের মধ্যে। আমি খুব ইন্টেলিজেন্টলি ইস্যুটাকে এড়িয়ে গেছি বটে, উনিও খুব ইন্টেলিজেন্টলি টাইট্ দেবেন। ' ভয় নেই। তপেন বলেছিলো—।

ধান্নুর মৃত্যুর ব্যাপারে আমার ফাইণ্ডিং নাকি ঠিক হয় নি! ষ্টিভেডোরকে দোষী করলেও পোর্টকমিশনারস্‌কে দায়িত্ব মুক্ত নাকি করতে পারি নি ঠিক—। তৈরী করা অপরাধের পদধ্বনি? এর ফলে এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বীতশ্রদ্ধ বিরক্ত ছিলাম ব'লেই, কিংবা ন্যায় আর জেদের বশে আর এক ভুল ক'রে বসলাম সেদিন। আর এক এন্‌কোয়ারীর ব্যাপারে—।

ছ'নম্বর জাহাজে টবভর্তি ম্যাংগানীজ জাহাজে নামাবার সময় হঠাৎ টব উল্টে গিয়ে ম্যাংগানীজের টুকরোয় কয়েকজন পোর্টার জাহাজের খোলের মধ্যে ভীষণ আহত হ'লো—।

যতো দুর্ঘটনা কী আমার ডিউটিতেই ঘটতে হয়!

ইন্সপেক্টর ডক্ সেফটির সঙ্গে তদন্ত করতে গিয়ে অস্বীকার করা গেলো না টবের সেফটি ল্যাচ ঠিক ছিলো না। ঐ টব পোর্ট-কমিশনারস্-এর। দায়িত্বও। আমাকে লিখতে হ'লো—। আর যেহেতু আমি কমিশনারস্ এর দায়িত্ব ক্ষালন করতে পারলাম না, সেইহেতু, (কিংবা অতএব) আমি হঠাৎ হ'য়ে যাওয়া-ইন্এফি-শিয়েন্ট। একেবারে প্রমাণিত হ'য়ে গেলো—মণি সায়েবের কাজীর বিচারে। এরজন্যে শুধুমাত্র এখানকার ভাষায়—dressing downই হ'লো না, একেবারে দু'নম্বর ডকে, আমার বাসা থেকে সবচেয়ে অসুবিধে জনক দূরত্বে বদলী—।

—ইউ আর ওয়ার্থলেস্! রিপোর্ট টু এস্, ডক্ টু, টুমরো আফটারনুন্!

দুর্ঘটনার পরদিন সকালে মণি সায়েব রায় ঘোষণা ক'রে দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলেন।

রাগে তখন আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, অভিবাদন পর্যন্ত করলাম না। সেটাও লেখা রইল ওঁর নোট বইয়ে তৃতীয় অপরাধ ব'লে—এ আমি জানতামই—।

ভুলটা বিষের মতো! এককোঁটা ভুলে হাজার হাজার ঠিক কাজের পানীয় বিষ হ'য়ে যায়। প্রচারিত ভুলটাকেই চিরকাল মনে রাখবে লোকে। এ'তে সব শেয়ালেরই এক রা—। সমাদ্দার সায়েবও সমর্থন করলেন মণি সায়েবকে। এতো আলাপ-সখ্য-, সমস্ত ভেসে গেলো—। সকলি গরল ভেল!

মানুষের ভালোলাগা খারাপ-লাগাটা পুতুল নাচের মতো—। স্বার্থের তারে স্বপক্ষ আর বিপক্ষ যুক্তির টানে তার ভালো বা মন্দ-সূচক হাতনাড়া। যুক্তিও তৈরী হয় প্রয়োজন মত—পরিবেশ মাফিক, মনের পাকশালায় বিভিন্ন স্বাদের—। একটা বাসের আগোগা বাড়িকে বাইরে থেকে খারাপ মনে হবেই, কিন্তু যেই সেটা

হ'লো আমার পৈত্রিক বাড়ি কিংবা নিরুপায় হ'য়ে থাকতে হওয়া বাড়ি, অমনি পোষ মানলো বিরুদ্ধ বন্য-যুক্তি। কেমন লাগার ঘটলো তারতম্য—। চাকরিটা যখন নিয়েছিলাম, উন্নতি-স্বপ্নের স্বার্থে ভালো লেগেছিলো পুরোপুরি না হ'লেও—। আজ নানান বিপক্ষতা দেখে গৈরিক রঙের ছোপ লেগেছে মনে, বেজেছে বাউলের সুর। যাযাবর বৃত্তির ঘোড়াটার ওপর, অন্য কোথা, অন্য কিছুর দিকে মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে চলা, উধাও হওয়ার চাবুক প'ড়েছে,—আর যায় কোথা।—সময় হ'য়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে। চাকরিটা জোলো বিস্বাদ হ'য়ে গেলো। এতোদিন ঐ নীরস জিনিস কী ক'রে সহ্য ক'রে ছিলাম? বাঁধন ছেঁড়ার মনোভাব ক্রমশ পুষ্টিলাভ ক'রে চলল মনের মধ্যে—।

সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস্য রকমের নিরাসক্তি, সব কিছু, সকলেব ওপর বেপরোয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বেগ পেয়ে বসল আমাকে। যে কোন নতুন কারণ, তা এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও—চাকরির বিপক্ষাচারণের পক্ষে যথেষ্ট ব'লে মনে হ'তে থাকলো—।

বিকেলের ডিউটি।

আট নম্বরের পাশ দিয়ে রাউণ্ড দিয়ে ফিরতে ফিরতে নুরানী জাহাজের পানীয় জল সরবরাহের অবস্থাটা দেখতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম গ্যাংওয়ে দিয়ে একটি মহিলাকে নামতে দেখে। উনি টলছিলেন। প্রায়ই এমন ব্যাপার নজরে পড়ে সন্ধ্যের পর। ওদের টাকা দিয়ে ভাড়া ক'রে জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয় কয়েক ঘণ্টার জন্যে—।

কিছুকাল পূর্ব্বেও গালে ঠোঁটে কড়া রঙ ঘষে ঘষে লাল হওয়া-ফিরিঙ্গী মেয়েদেরই একচেটিয়া ছিলো এ ব্যাপারটা। কিন্তু যুদ্ধের তথা দেশভাগের পরে, আমরা আর সব ব্যাপারের মতো এ ব্যাপারেও পিছিয়ে থাকতে পারি নি। আজ

কাল ভারতীয় মেয়েদের যথেচ্ছ যাতায়াত নজরকে পীড়িত করে। ঠিক কোন প্রদেশের এরা চেনা শক্ত। বাঁকাচোরা ইংরিজী ছাড়া অন্য ভাষা শুনি নি কখনও—তাও দূর থেকেই —। আজ হঠাৎ লক্ষ্য করার ইচ্ছে জাগলো। মহিলাটির চেহারা ভালোই। বব্‌ড্‌ চুল। পেটকাটা লাল সিল্কের এলোমেলো ব্লাউজের তলায় সুডৌল পেটের নিখুঁত খাঁজ। হেভী মেক-আপ—। বাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ির কিনারা দিয়ে উঁকি দেয়া আরো লম্বা লেস্‌ওলা পেটিকোট। ঢিলেঢালা পোশাক। উনি টলছিলেন।

বাব্বা! কি ক'রে রেখেছে জায়গাটাকে, উঃ! প'ড়ে থাকা একটা আয়রন ওর-এর চাঙ্গড়ে ঠোক্কর খেয়ে আরো টলে পড়ে গিয়ে ওঁর মুখ থেকে মাতৃভাষা বেরিয়ে প'ড়ে স্তম্ভিত ক'রে দিলো আমাকে। অসুবিধেয় পড়লে মানুষের মাতৃভাষা বেরোয় স্বাভাবিক সাবলীলতায়। ওঁকে তুলে খাড়া করে দিলাম।

—Thank You!

মনটা কেমন-কেমন হ'য়ে গেলো। এতোদিন এঁদের সম্বন্ধে—বাঙ্গালী নয়, এই ধারণা ক'রে নিয়ে বোকামীর স্বর্গে ছিলাম কিনা! তাহলে বাঙ্গালী মেয়েরাও? এতোদূর? আর সঙ্গে সঙ্গে সেই যুক্তি—।

এই পরিবেশে থাকবো না আমি। এসব দেখতে পারবো না চোখের সামনে। মিসেস্ ম্যাকিনটশের আক্রমণেও ঐ কথা মনে হয়েছিলো। ওর শিকার হ'য়ে এখানে? প্রাণ থাকতে নয়।

—মানুষ এতো বোকা আর ঠাণ্ডাও হয়?

রাত নটার সময় চার্জ বুঝে নিয়ে আমার সমস্ত কথা শুনে মন্তব্য করলো তপেন। ওর এ-মন্তব্য অবশ্য মিসেস ম্যাকিন-টশের ব্যাপারে। এতোদিন বলি নি। আজ হঠাৎ আনুপূর্বিক বিবৃতি দিলাম একখানা—।

—ইস্! এমন সুযোগ ছাড়লে—?

চুক্ চুক্ শব্দ করলো তপেন। একটু ভেবে বলল,—তোমার চাকরিটা গেলে ভালোই হবে—।

—অর্থাৎ আরো ভালো কোনো চান্স পাবো বলছ?

চান্স পেলে কী জাহান্নমে গেলে সে ভাবনাতে তো ঘুম হচ্ছে না আমার। আমি ভালো চান্স পাবো একটা!

—তার মানে?

—তোমার কোয়ার্টার্স টা আমি নেবো হে! আর তোমার হেলায় হারানো সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করবো। আজই যাবো নাকি তোমার সঙ্গে?

—তা'হলে তোমার চাকরিটাই যাবে যে এক্ষুনি!

যাক! তবু তো একটা গুড cause 'এ যাবে। তোমার যে বিনা cause'এ এই effect 'হচ্ছে!

এই তপেন, আর তার good Cause। অদ্ভুত!—না?

জাহাজে আজ পর্যন্ত নির্ভুল প্লিম্সন চিহ্ন দিয়ে ফ্রেণ্ড অফ দি সেলর আখ্যা পেয়েছেন ইংরেজ ক্যাপ্টেন প্লিম্সন সেই অষ্টাদশ শতকে। অনেক গবেষণা ক'রে সারা পৃথিবীকে চারটি ভাগে ভাগ ক'রে জাহাজের গায়ে সাংকেতিক অক্ষর দেগে দিয়ে বলেছিলেন, সাবধান! এই দাগের ওপর অমুক এলাকা পার হ'তে হলে মাল বোঝাই করা বিপজ্জনক। সত্যিই! আজো সেই অনুশাসন মেনে নেহাত টাইফুন, টরনেডো, হ্যারিকেন, সাইক্লোনে না গিলে খেলে জাহাজ সম্পূর্ণ নিরাপদ।

আজো। ছাব্বিশ নাম্বার বার্থের 'ইঞ্চমে' জাহাজের গায়ে একটা বৃত্তের মধ্যে ডবল জেডের মতো চারহাতওলা প্লিমসন মার্কের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার নিজের কথা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে নিজের বোঝাই-বোঝাই মনের অনুরূপ অদৃশ্য প্লিমসন মার্কের কথা। আমার সীমা ছাড়িয়ে বোঝাইয়ের কথা। দাসমনস্কতা আর অভিজ্ঞতা বোঝাই বন্ধ করার সময় হওয়ার কথা।

আগেই বলেছি যে কোনো ছোটোখাটো তুচ্ছ নগণ্য বাইরের ব্যাপারই চাকরির প্রতি অশ্রদ্ধার আর এক পোঁছ লাগানোর কারণ হয়ে দেখা দিতে শুরু ক'রেছে ইতিমধ্যেই। অশ্রদ্ধা-বিতৃষ্ণার বিষে নীল-নীল মনই দায়ী এর জন্যে। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাও শয়তানের পিছু লাগার গল্পের মতো তাগিদ দিয়ে চলেছে—ছাড়ো! চাকরি ছাড়ো—!—ছাড়ো-ও-ও!! উটের পিঠের শেষ তৃণখণ্ডের মারাত্মক বোঝার মত আমার বিরুদ্ধে অতি হালকা জয়েণ্ট পিটিশনই বোধ হয় দেখা দিলো সেই 'লাষ্ট ষ্ট্র' হ'য়ে। যদিও আমার কাছেই, অন্যের দেখা-বোঝার আওতার বাইরেই।

চোরের প্রভাব বিকীরিত এলাকায় চোর হতে না পারলে unsocial হ'তে হবে নির্ঘাত। হবেই।

ভালো ক'রেছিলাম কিনা বিচার কোরো তুমি! ঘাট সারেঙ-এর বিরুদ্ধে আমার কঠোর ব্যবস্থা বোধ হয় সঙ্গতই হ'য়েছিলো স্বীকার করবে—।

ওহো—। তোমাকে বলাই হয় নি বুঝি? বহু সারেঙকে তুমি জানো না। জানার কথাও নয়—। পোর্টের কতকগুলো ফ্লাট আর ভারি নৌকো আছে নিজস্ব—। গাধাবোট। জাহাজের উল্টো দিক থেকে মাল বোঝাই নিয়ে, হয় হেভী লিফ্‌ট্ ইয়ার্ডে নামিয়ে দেয়া, না হয় নির্দেশমতো জায়গায় খালাস ক'রে ট্রান্সশিপ্‌মেণ্টের সাহায্য

করার কাজ বোটের—। প্রত্যেক বোটে একজন টিন্‌ডেল আর বারোজন নীল-পোশাকী লস্কর—! এদের সবার ওপরে তত্ত্বাবধায়ক ঘাটসারেঙ—! তার তীক্ষ্ণতদারকী সব বোটগুলোর ওপর। বড়ু সর্দার সেই ঘাটসারেঙ—। এক একজন লোককে, তা যতোই কেন সে অমায়িক বিনয়ী দেখাক—প্রথম দর্শনেই ভালো লাগে না। দু' একটা কথাতেই আসল রূপ পড়ে বেরিয়ে—। বড়ু সারেঙ সেই একজন।

ডকে কয়েকজন ওপরওয়ালাকে ছাড়া—এতো বিশ্রী আমার আর কাউকে লেগেছে কিনা বলতে গেলে রীতিমতো ভাবতে হবে, আর পাওয়াও যাবে না ভেবে—।

প্রথম দর্শনেই অপ্রেম—।

কয়েকদিনের বাসি দাড়ির রুক্ষ তীক্ষ্ণ ছুঁচোলো মুখের বড়ু সারেঙ—। কোম্পানীর নীলকোট আর সর্বঋতুতে ছাতা। ক্যান্‌সার হওয়া ফ্যাঁস-ফেঁসে ভাঙ্গা গলার মতো কণ্ঠস্বর—। সাধারণত ভাঙ্গা ভাঙ্গা আওয়াজ বেরোয়। সময় অনুযায়ী রকম বেরকমের স্বর পাল্টায়। কখনোও মেয়েলী সুরে আস্তে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ক্যানসারী কণ্ঠে ফিরে যাওয়া—। এই ওর স্বরযন্ত্রের সীমান্ত—। কাকা প্রায়ই বলতেন—যার গলার আওয়াজ নানা রকমের, সে ভাল লোক নয় জানবি। জানলাম। আশ্চর্য সত্যি কথা—।

'ডক ওয়ানে' থাকতে অফিসের পরেশ বাবুর মুখে ঘাটসারেঙের কমাণ্ডিং টোনের অভিযোগ শুনেছিলাম। ঠিক বলেছিলেন তিনি। বোট এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাবার অর্ডার সই করাতে আসতে হয় আমার কাছে। যেন নেহাতই সইটা না নিলে নয় তাই, না হ'লে আমাদের তোয়াক্কা করে না সে। তার এক হাতের মুঠোয় ডক্স-ম্যানেজার অন্য মুঠোয় ডেপুটি; অন্য

ডেপুটিরা হনুমানের সূর্য নেয়ার মতো, বগলের তলায়। ঐরকম ভাবখানা বত্থুর। কথায় কথায় ফোন্ তুলে ডেপুটিব নির্দেশ নেয় আর দেখিয়ে দেয় আপনাদের লোককে, কতো সহজে সে কথা বলে ওঁদের সঙ্গে ইচ্ছে করলেই—। সুবিধে পেলে নির্দেশ দিয়েও দেয় আবার! একটু কী রকম ক'রে এসে সরু লম্বা খাতাখানা বাড়িয়ে ধরে।

—একটা সই! কিছু দেখতে হবে না স্যার, ডি,ডি, এম, ও'কে বলা আছে!

করুণা ক'রে যেন আমার সইটা নিচ্ছে সে।

প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই ওর কথাবর্তায় বিরক্ত হ'য়ে আর সবার মতো চোখ বুজে সই দিতে চাই নি আমি। ইতিমধ্যে বিদ্রোহও জেগে উঠেছে চাকরির বিরুদ্ধে।

—আমাকে যদি দেখতেই না হয় তো সই করি কি ক'রে। সইটা তো আর ডি, ডি, এম, ও, কচ্ছেন না!

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বত্থুর আপাত বিনয়ী মুখের চেহারা গিছলো পাল্টে।

—ঠিক আছে স্যার! আপনি সই না করলে বোভিন সায়েব নিজেই সই করে দেবেন দেখবেন! একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে খাতাটা চটাস্ করে বন্ধ করে চলে গিয়েছিলো মনে পড়ছে। পরে যদিও জেনেছিলাম চুপি চুপি, আমার পরের ডিউটিতে আসা-সহকর্মী বসুর সই নিয়ে গিয়েছিল সে।

দু'নম্বর ডকে এসে দেখি ঘাটসারেঙের রাজত্ব। ওর হাজরি এখানে। ওভার টাইম্ বিল্, মাসিক ইণ্ডেণ্ট, অর্থাৎ মাসে মাসে বোটের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র—তেল, সাবান, দড়ি, বালতি থেকে নারকেলের ছোবড়া পর্যন্ত, আনার ব্যবস্থা হয় এখান থেকেই। কয়েক দিনের মধ্যেই গোলমাল শুরু হ'য়ে গেলো—। প্রায়ই

লক্ষ্য করতাম কোনো বিশেষ বোটের অধিকাংশ লস্করকে রাস্তায় ঘাটে বাজারে, বেসময়ে। নজর করা গেলো ঠিক সেই সময়ের জন্যেই তাদের নামে ওভার-টাইম্ লেখানো হ'লো পরে। একদিন চরম। সকালে উত্তর ক'লকাতা গিয়েছিলাম। বারোটা নাগাদ ফেরার পথে বোট মাঝিদের দুটো দলকে দেখলাম ধর্মতলায় ঘোরা ফেরা করতে। তাতে আর কি? পরের দিন পূর্বদিনের খাবার ছুটিতে অর্থাৎ বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত ওভার-টাইম্ কাজ করার সার্টিফিকেট লিখিয়ে সই করাতে এলো ঘাট-সারেঙ। আমি পূর্বদিনের ব্যাপারের ইংগিত করে অস্বীকার করলাম সই করতে। মুখ কালি ক'রে চলে গেলো ঘাটসারেঙ।

অফিসের সবচেয়ে দক্ষ পিওন রমজানের মুখে শুনলাম বোটের লস্করদের সঙ্গে ওভার-টাইমের পরিষ্কার ভাগের বন্দোবস্ত ওর। তাই অতো আগ্রহ—। রমজান আরো অনেক কিছু বলল—। টিন-টিন কেরোসিন তেল ইণ্ডেণ্ট করিয়ে আনিয়ে বাজারে বিক্রি করায়। পার্টির সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে ওভার-সাইডের মাল অন্য ভাড়াটে নৌকোয় পাচার ক'রে দেয়ার মতো নানা রকম smuglingএর নায়ক ও ঐ ঘাটসারেঙ। —এইতো স্যার কাল তিন টিন তেল নিয়ে গেছে। বোটতো আটাশ নম্বরেই রয়েছে সব। চেক ক'রে আসুন—! রমজানের কথায় কি মনে হলো, চেক করতেই ছুটলাম অন্য কাজ ফেলে। আর মিলে গেলো অক্ষরে অক্ষরে—। দু'টিন তেল উধাও—।

ডায়েরীতে রিপোর্ট করব কিনা ভাবতে ভাবতে নানা কাজে, এবং একেবারে, নির্মম হবো কিনা ঠিক করতে না পেরে, ভুলেই গিয়েছিলাম ব্যাপারটা—। পরের-পরের দিন সকালে

ডিউটিতে এসে তার প্রতিফল পেতে হ'লো হাতে-হাতে—। আহত বাঘকে ছেড়ে নিশ্চিন্ত থাকার প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো—। এতো চটপট কাজ হবে ভাবতে পারি নি—। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমার নামে দুর্ব্যবহার এবং অন্যান্য কয়েকটা মিথ্যে অভিযোগগুলো এক বিরাট দরখাস্তে সমস্ত টিণ্ডাল-লস্করদের টিপসই নিয়ে ভোর বেলাই একেবারে ডি, ডি, এম, ও, আর মণি সায়েবের দরবারে হাজির। শুধু তাই নয় সাতাশি দিনের ধর্মঘটের লড়াই চালানো, ঐতিহ্যময় য়ুনিয়নকেও এককপি দিয়ে এসেছে মিথ্যে অভিযোগের সাজি ভরিয়ে—। দুঃখের বিষয় সাধারণত য়ুনিয়নের দৃষ্টিতে, চাপা-দেয়া সব মোটারগাড়ির সারথীর মতো এসমস্ত ক্ষেত্রেই অফিসাররাই নির্ঘাত দোষী, এই স্বতঃসিদ্ধ। আর আমি সবেমাত্র কন্‌ফার্মড্ অফিসার ক্লাস টু—।

কিছু জানি না। মাঝে ছুটি ছিলো একদিন। সকালে চার্জ নেয়ার পরেই বিস্ফোরণ। চ্যাটার্জি সায়েব আগুন—।

—কী ক'রেছেন আপনি? পোর্টের ডক মাঝিদের ক্ষেপানো কতোবড় অপরাধ জানেন? কাজ আদায় করার যোগ্যতাই সবচেয়ে বড় গুণ।

—কিন্তু করাপশন বন্ধ ক'রে কাজ আদায় করতেই তো—। আমার কথা শেষ হ'তে পেলো না।

—ওয়ার্থলেস্! এখন জয়েণ্ট এনকোয়ারী সামলান্!

আগেরদিন ওঁর মেয়ে আমাকে চায়ে ডাকতে গিয়ে এ্যান-ম্যাকিনটশকে আমার গা ঘেঁষে ব'সে থাকতে দেখে নিশ্চয়ই অনেক রঙ-চঙ করে ব্যাপারটা জটিল করে তুলেছে বাবার কাছে। আমার মনে হলো নিশ্চয়ই তাই। মণি সায়েবের এতো রাগের আর কি কারণ থাকতে পারে?

—কী হ'য়েছিলো ব্যাপারটা? ঘাটসারেঙ তো অনুগত কাজের লোক! শুধু শুধু তো—

মিঃ সমাদ্দার পেটের নীচে নেমে যাওয়া বিলিতী গাবার্ডিনের ট্রাউজারটা তুলে ঠিক করতে করতে বললেন অন্য দিকে চেয়ে—।

আমি সমস্ত ব্যাপার ব'লে গেলাম আনুপূর্বিক।

—য়ু অট টু হ্যাভ বীন্ ট্যাক্টফুল্। নিজের খেয়াল খুশিতে আপনি আনরেষ্ট ক্রিয়েট করতে পারেন না! এ্যাপোলজি চেয়ে মিটমাট করে নিন্ নিজের ভালোর জন্যেই!

—এতোদিন জানতাম এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অফিসারদের প্রো-টেকশন দেয় অন্যায় করলেও নিয়মানুবর্তিতার খাতিরে। আর ন্যায়পথে থাকা সত্ত্বেও কতৃপক্ষের চোখেই আমিই দোষী? ষ্ট্রেঞ্জ!

—আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে সত্যিই আপনি দোষী। ঔদ্ধত্য কেন থাকবে?

ওপরওলার কাছে সকলেই অসহায়। ব্যক্তিগত বিদ্বেষে ক্ষতি করলেও, বিদ্বেষ প্রমাণ করা যাবেনা। হাড়ে হাড়ে বুঝলেও সকলেই কাগজে কলমের আইন মাফিক অভিযোগই দেখায়। বিচার হবে তার ওপর। নাট্যকারের মতোই ব্যক্তিত্ব থাকবে অনুপস্থিত—।

পাথরের মতো ভাব লেশহীন মুখ করে সোজা অফিসে চলে এসে তার পরের কয়েকটা পদক্ষেপ, বেশ ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে, কয়েকদিন থেকে মনের পাকশালায় পাক ক'রে রাখা সিদ্ধান্তই নিলাম—।

সাড়ে নটায় অফিস খুলতেই টাইপিষ্টের টেবলে একটা পাতলা কাগজে হাতে লেখা চিঠি আলতো করে ভাসিয়ে দিলাম বেশ নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট শুষতে শুষতে—।

—প্লিজ টাইপ ইট আউট! উইল য়ু?

চিঠিটায় চোখ দিতেই সে দুটো ভ্রূ ছাড়িয়ে উঠলো টাইপিষ্ট ভদ্রলোকের? —একি স্যার? সত্যিই?

নির্জলা! আপনি কি ভাবছেন ভাই আমি এপ্রিল ফুল কচ্ছি?

—কেন স্যার হঠাৎ রিজাইন করছেন, কেন? এই তো ক'দিন হলো কন্‌ফার্মড হলেন?

—ঐ জন্যেই বোধ হয়। এসব জিনিস হঠাৎ ক'রে ফেলতে না পারলে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় পরে। ভালো না লাগা জিনিসকে আঁকড়ে ধ'রে থাকলে সময়ই নষ্ট হয় না, শেষে নিজেকেও বঞ্চিত করতে হয়—।

মুখ দেখে মনে হলো ভদ্রলোক সত্যিই আহত হয়েছেন। সামলে নিয়ে বললেন—কেউ চাকরি ছাড়লে আমি খুশিই হই। মনে করি বেঁচে গেলো সে। যেখানেই থাক নিশ্চয়ই ভালো কিছু পেয়ে যাচ্ছে। আরো ভালোভাবে বাঁচবে —।

—কিন্তু আপনার এখানে ভবিষ্যৎ ছিলো। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!

—বেশি কিছু ভালো নাও হতে পারে। যেমন জুন-দুপুরের ঔজ্জ্বল্য—। একটা ক্ষোভ, আহত আত্মসম্মান, দুর্জ্জয় অভিমানে গলার মধ্য দিয়ে কি যেন ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগলো—। একমাসের নোটিস দেয়া পদত্যাগ পত্রটায় নাম সই ক'রে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ট্রের মধ্যে রেখে বাইরে এসে 'ইঞ্চমে' জাহাজের প্লিম্‌সন মার্কটার দিকে চেয়ে চেয়ে ঐ কথাই ভাবছিলাম।

ভালোই হ'য়েছে। এইটাই চাইছিলাম মনে মনে। এতোদিন জানতাম বোবার শত্রু হয় না। আজকাল নিয়ম অন্য। বোবার শত্রু সংখ্যাই বেশি। খোঁচা দেয়ার শত্রু। প্রচার আর ঢাক পেটানোর যুগ। জয় ঢাক। বক্তৃতার বিষে শত্রুক্ষয়। চুপ ক'রে থাকা ভালোমানুষী মানেই বোকামি আর দুর্বলতা। তার সুযোগ কেউ ছাড়েনা। চেষ্টা করলে জয়েন্ট এনকোয়ারীতে জিততে পারলেও মণি সায়েব রেহাই দেবেন

না। পদে পদে ছিদ্র খুঁজে করবেন অপমান। চ্যাটার্জি সমাদ্দার সায়েবের ঐ রকম মনোভাব দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমার কয়েকটা মুহূর্ত লেগেছিলো মাত্র।

প্লিম্‌সন মার্কের ওপর একটা সাদা চিহ্ন জাহাজের গায়ে। এ জাহাজে টুইন ডেক্‌ আছে তারই প্রতীক। 'টুইন ডেক্‌'। প্রটেকশনের মতো। আরো কিছু বোঝা নেয়ার ব্যবস্থা ওখানে আমার জীবন-জাহাজে প্লিম্‌সন মার্ক থাকলেও 'টুইন ডেক' নেই বোধ হয়। আর দাসত্বের বোঝা গ্রহণে অসমর্থ আমি।

বাঁদিকে হেভী লিফট্‌ ইয়ার্ড। ওখানকার সমস্তগুলো ক্রেণের বহন ক্ষমতা দেড়টনের বেশি। আমার হেভী মাইণ্ড। হাজার হোক একটা মায়া পড়েছে তো! এতোদিন এদের সুখ দুঃখ আশা, আকাঙ্ক্ষার স্পন্দনের সঙ্গে নিজের জীবন-স্পন্দন দিয়েছি মিলিয়ে মিশিয়ে। হ'য়েছি একাত্মা—। সেকি সহজে যাবার। বাঁকের মুখ থেকে সমস্ত ডকটা দেখা যায়। মাথা উঁচু উঁচু জিরাফ-গলা ক্রেন। সার সার ক্রেন। ঝাউবনের মতো সার!

একথা হয়তো সত্যিই যে, জীবনের অনেক জটিল মুহূর্তে বিনা যুক্তিতে আমরা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিই, কাজ করি—। অনেক বড় বড় কাজও নাকি এই ভাবে হ'য়েছে। অনেক খারাপ কাজও—। আসলে একটা আবেগে মানুষ হঠাৎ কাজ ক'রে বসে। আমার জীবনে বার কয়েক এমন হ'য়েছে। আজো হলো। মনে হলো এখানে এসে যে আস্তে আস্তে গ্রন্থির পর গ্রন্থিতে নিজেকে জড়িয়েছি নানাভাবে, তা খোলার সময় এসেছে গোড়া থেকে—। ছেলেবেলায় ধৈর্য হারিয়ে জটপাকানো ঘুড়ির সুতো তাড়াতাড়ি খুলতে গিয়ে আরো বেশী জট পাকাতাম—সে নিয়ম সব ব্যাপারেই। সে নিয়ম ব্যাপক। হেভী লিফ্‌ট্‌ ইয়ার্ড থেকে টাউজারের পকেটে

হাত দিয়ে লম্বা দৃঢ় পদক্ষেপে অফিসে গিয়েই ফোন তুলে প্রথমেই ডাক দিলাম স্বপ্নাকে। কর্তব্য। স্বপ্নার কাছে অপরাধের পাহাড় জমে উঠেছে মনে হ'লো হঠাৎ। ওর সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলে নেয়া উচিত ছিলো আগেই। নিজের কথা বলি নি, স্বপ্নার কথা ভাবি নি। কি এক মোহের বসে যেন, তোমার কথা চেপে গিয়েছিলাম একেবারেই। দুর্বলতা নয়তো কি? মনে হতো, শুনলে পরে ও এমন ক'রে মিশবে না আর। তাতে শান্তি পেতাম না। তোমার কাছে কখনও কিছু গোপন করিনি। হঠাৎ মনে হলো সেই গাড়িতে স্বপ্নাকে পৌঁছে দেবার পরও তো অনেক বার আমরা একত্র হ'য়েছি, ও যেন আরো কাছে আসতে চেয়েছে। আমি ব্যাপারটাকে না-গ্রহণ না-বর্জন পর্যায়ে রেখে এসেছি সে ঐ মোহেই। অন্যায়।

ও যদি অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে থাকে সরল বিশ্বাসে? কি পরিমাণ আঘাত দিতে চলেছি তাহলে, মনে ক'রে শিউরে শিউরে উঠলাম অস্বস্তিতে। এখুনি কিছু করা দরকার। আহা রে! মিষ্টি মিষ্টি, নরম নরম মেয়েটা!

সমস্ত দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

প্রায় দৌড়ে গিয়ে এমন ভাবে টেলিফোন তুলে নিলাম যে, ওদিকের ঘরের কর্মচারীদের মনে করার কারণ ছিলো যে, ঘাবড়ে গিয়ে আমি ওপর ওলাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে মিটিয়ে নিতে চাইছি ব্যাপারটা—। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে স্বপ্নার মিছরি-গলার আওয়াজ পেয়ে নিঃশ্বেস পড়লো আমার।

—হ্যালো—।

—সুব্রত ঘোষাল কথা বলছি। আজ বিকেলে আর্কেডিয়ায় চায়ের নেমন্তন্ন করলে গ্রহণ করবেন?

—তা না হয় করা গেলো। কিন্তু খবর কি আপনাদের? ক'দিন যে দেখাই নেই। হঠাৎ মনে পড়ল?

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা ভেসে এলো স্বপ্নার কথায় —।

কিছুদিনের জন্যে কোলকাতার বাইরে যাবো, তাই —।

—এ্যা? ক'দিনের ছুটি? হঠাৎ?

কেমন যেন শোনালো ওর গলাটা।

—ওখানে সব বলব। আসছেন তো ঠিক?

—যাবো। কিন্তু কখন?

—ঠিক পাঁচটায়। আর্কেডিয়ায়—। কেমন?

—আচ্ছা—।

নামিয়ে রাখা ভারি রিসিভারটার সঙ্গে মনের অর্ধেক ভারও যেন নেমে গেলো আমার।

বেলা দুটোয় যখন সেকশন্ ছাড়লাম তখন হৈ হৈ শুধু সেকশনে নয়—সারা ডকে ছড়িয়ে পড়েছে খবর। ফোনের পর ফোন।

—কী ছেলেমানুষী করছ? ফিরিয়ে নাও কাগজ। এটা তপেনের—। শেষে নিচুগলায় বলল, অবশ্য বাঁচলে তুমি। এই আবহাওয়া থেকে পরিত্রাণ পেলে। আর আমিও তোমার কোয়ার্টারস টা পাবো। ম্যাকিনটশদের নিয়ে টশিং করার হ'লো সুবিধে। কিন্তু চাকরি-স্থানে যে দুর্বল হলাম।

—হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কাজ করবেন না। কিছু না হোক সোজা রাস্তায় হাজার টাকা মাইনেয় যাবেন!

বাসু জানালেন ইষ্ট সাইড্ থেকে—।

—আমার যে ভাই লাকের দিকে লক্ষ্য, লাখের দিকে নয়। ভেবেই ক'রেছি—। উত্তর দিলাম।

দু'টোর সময় দু'নম্বর ডকে ডিউটিতে এলেন তেজী এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, মাথার সামনে দিকে হলুদ-চুল ফিকে হ'য়ে-যাওয়া-শিপম্যান। তাকে বলতাম—তোমার পদবী আর চাকরিতে অদ্ভুত মিল। তুমি প্রকৃতই শিপ্‌ম্যান।

হাসি ঠাট্টা করা ইজি-গোয়িং ছেলে। আজ আমার খবর শুনে গম্ভীর হয়ে গে'লো—!

—ভয় নেই তোমার সঙ্গী হচ্ছি শীগগিরই !

বলে কি। বর্তমান ভারতীয় মান অনুযায়ী ওর যা—যাকে বলে, কোয়ালিফিকেশন, তাতে এমন রাজার চাকরি ছাড়লে, একশো টাকার চাকরি জোটানোই শক্ত হবে যে !

—ছাড়বে কেন হঠাৎ ? তোমারও কী জয়েন্ট পিটিশন আর মণি সায়েব পেছু লেগেছে ?

—লক্ষ লক্ষ মণি সায়েবরা লেগেছে ব্রাদার। কিছু মনে কোরোনা, তাতে ঘোষ, বসু, ঘোষাল কেউ বাদ নেই ! শিপ্‌-ম্যানের মুখে হাসির গোলোকধাঁধা।

—আমাদের ইণ্ডিয়াতে থাকা বোধ হয় আর চলে না। তার জন্যে দোষ আমাদেরও স্বীকার করি। তুমি জানো নিশ্চয়ই ইংরেজ থাকতে মাতৃভাষা আর ওদের আধা রক্তের জোরে কতকগুলো বিশেষ সুযোগ সুবিধে ছিলো আমাদের। এখন জুতো অন্য লোকের পায়ে। খাপ খাইয়ে চলা শক্ত।

—আমরা দলে দলে অষ্ট্রেলিয়া চলে যাবো। সেখানে প্রয়োজন আমাদের। প্রচুর চাকরি খালি। মেলবোর্ণে জাহাজ থেকে নেমেই জেটির সামনের রাস্তার ওপরেই সাইন-বোর্ড দেখতে পাবে—**wanted**—!

বললাম—দেখো হোয়াইট্ অষ্ট্রেলিয়া আর আফ্রিকা নীতির উদাহরণে আমাদেরও ব্রাউন ইণ্ডিয়া ধুয়া তোলা উচিত ছিলো হয়তো। কিন্তু আমরা তা করি নি—। এখানে সকলের সমানাধিকার। নেপোলিয়ানের মতো ট্যালেণ্টের জয়গান এখানে। আমাদের শাসনতন্ত্রের খসড়া দেখো—।

শিপ্ম্যান নিঃশ্বেস ফেললো—তোমার কথা হয়তো ঠিক। তবে কি জানো ব্রাদার, ইংরেজ আমাদের অসহায় করে ছেড়ে দিয়ে গেছে, বাধ্য হয়ে—। ইংল্যাণ্ডকেও আমরা দেশ ব'লে দাবি করতে পারি না, আবার অনেকদিনের বদভ্যাসে তোমাদের সঙ্গেও মিলে যেতে পাচ্ছি না। হোম-ল্যাণ্ড ব'লতে আমাদের কিছুই রইল না। কি ট্র্যাজিক অবস্থা ভাবো।

—তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুললে শিপ্ম্যান।

—যেতে দাও। হাত বাড়িয়ে দিলো ও—চিয়ারিও ব্রাদার। বেষ্ট্ উইশেস্!

আর কথা বলতে পারলো না। ওর নীল-আকাশ-চোখে মেঘ জমে উঠলো হঠাৎ—।

—চিয়ারিও ভাই!—

বাইরে পা বাড়ালাম। বেশ ভারি লাগছে নিজেকে। এতোদিন চ্যাংড়া মনে হওয়া শিপ্ম্যাকে অন্য লোক মনে হ'লো—। ওর মনের গভীরে অবগাহন করে অদ্ভুত তৃপ্তি পেলাম যেন। আহা বাঁচুক ওরা। ব্যবস্থা হোক একটা। ওদের দোষ কি। বিদেশী শাসন ব্যবস্থার দোষেই না ওরা আজ নহুষের মতো হ'য়েছে। একা যাবেনা শিপ্ম্যান্। উল্ম্যান, রুনী, ড্যালি, হয়তো, লুইস, মনরোরাও যাবে।

ওরা নাহয় গেলো, শাদা চামড়া, লাল মুখ নিয়ে। কী করবে কালো ফিরিঙ্গি ডিকষ্টা, ডিসুজা, রোজারিও

ডেভিড্সনেরা? ওরাই যে বেশি আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রেছে এতোদিন নিজেদের রাজার জাত মনে করে! হোম্ বলেছে ইংল্যাণ্ডকে।

হেমের গল্প মনে প'ড়ে গেলো —।

চমৎকার গল্প বলতো নকলনবীশ হেম ঘোষ। মার্কম্যান ছিলো। প্রোমোশন পেয়ে বেচারা চাকরি খোয়ালো। গেট সারেঙ হওয়াই তাঁতীর গরু কেনার মতো কাল হ'লো—। গেটে মাল পাশ করার সময় পার্টির কাছে চার আনা ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা প'ড়ে চাকরি গেল হেমের। হেম গল্প ক'রতো। কালো কুৎকুতে বেরসো-কাঠ ডালি সায়েবের বাবার গল্প। তিনি খাঁটি ইংরেজ বলে দাবী করতেন; পিওর য়ুরোপীয়ান্। তা সায়েব খাঁটিই যদি তো অমন পাকা পালিশ করা মেহগনি কাঠের মতো রঙটা—!

হেমের বানানো কিনা জানিনা। ঐ সন্দেহ-প্রশ্নে সায়েব নাকি তখনকার অল্পশিক্ষিত কর্মচারীদের বুঝিয়ে দিতেন যে, ইংল্যাণ্ড থেকে আসার সময় ব্লাক-সী-তে প'ড়ে গিয়েই তাঁর রঙটা কালো হ'য়েছে।

ঐ ব্ল্যাক-সী-স্নাতদের কি হবে কে জানে।—

তোমাকে দিইনি সুখ—।

কাকেই যেন দিয়েছি—। কাউকেই না।

দুঃখই দিতে পারি শুধু—। স্বপ্নাকেও আমার অন্য কিছু দেয়ার সাধ্য হ'লোনা—। সেদিনের হালকা মেঘের ফাঁক দিয়ে

রূপো-গলা-ম্লান-রোদে আর্কেডিয়ার 'লনে' আঘাত করতে হ'লো তাকে। চরম আঘাত—। ওর চোখ যদি তখন দেখতে তুমি। যদি দেখতে! হয়তো বিরাট একটা ত্যাগ করার ইচ্ছে জাগতো মনে। মোচড়ে মোচড়ে বুকের মধ্যের সমস্ত প্রীতি চোখের রাস্তায় অশ্রু হ'য়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিলো শুধু—। কিসের যেন অন্তঃক্ষরণ হচ্ছিল। কেন দেরী করলাম? কেন সাবধান করিনি আগে থেকেই? কেন?—

এতোদিন পুরুষের স্বাভাবিক চরিত্রবশেই বোধ হয় বলি-বলি ক'রেও তোমার কথা বলতে পারি নি ওকে। কেউ আমাকে চাইছে, ভালোবাসছে এই মনে করার যে মাদকতা, বিশ্বাস কর—শুধু সেইটুকুর জন্যেই। ওটা কি স্বভাবের দোষ? না অভাবের?

স্বপ্না অনেক কিছু আশা আকাঙ্ক্ষার দুরু দুরু বুক নিয়ে এসেছিল ভাবতে কান্না ঠেলে আসে।

কোনোদিন এমন ক'রে একা ডাকি নি ওকে—। কোনোদিনও না। অনেক কিছু ভেবে আসার ঔজ্জ্বল্য দেখেছিলাম ওর চোখ জুড়িয়ে-দেয়া চোখে।

পাঁচটার কিছু আগেই পৌঁছলাম আর্কেডিয়ায় পাপক্ষালন করার ব্যাকুলতায়। স্বপ্নার ব্যাকুলতা আরো বেশি। দেখলাম সে আমার আগেই এসে ফুলবাগানে পায়চারি করছে—। আমাকে দেখেই আরতির পঞ্চপ্রদীপের মতো ওর দাঁতের আলো জ্ব'লে উঠলো—।

—Oh Arcadia!

মানুষ বুঝি সবকিছু ত্যাগ করতে পারে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারে জাগতিক আর যা কিছু ঐশ্বর্য, শুধু এরই জন্যে। মুহূর্তের জন্য ভাবলাম সব ছেড়ে শুধু ঐটুকুকে সম্বল করে হবো উধাও—। পারলাম কই? চা-টা এটা-সেটার পর আসল কথা—।

—আপনাকে আজ ডেকে এনে সময় নষ্ট করানোর কারণ আছে অনেক। কতকগুলো এমন অন্যায় করেছি যা অকপটে স্বীকার না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই আমার।

—সময় নষ্ট কেন বলছেন? কেমন সুন্দর লাগছে বিকেলটা—। মুখ নিচু ক'রে ব্রীড়াবনতা বাসর-বধূর মতো বলল স্বপ্না—। ওর চোখ মুখের রক্তিমতা দেখে প্রমাদ গণলাম আমি—।

একটু থেমে, বলতে চেষ্টা করতে লাগলাম, ধীরে-সুস্থে, গুছিয়ে-গাছিয়ে—আপনি জানেন কিনা জানি না, আজ সকালে আমি চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি একমাসের নোটিসে।

—এটা আপনি ভালোই ক'রেছেন। বাবাকে তো দেখছি, এখানের চাকরি আপনার জন্যে নয়। বাবা কি রকম হ'য়ে গেছেন দেখেন নি—? বাড়ির বাবা আর ওখানকার সমাদ্দার সায়েবে আকাশ পাতাল তফাত—। সেদিন বাবাই বলছিলেন, আপনি নাকি বেপরোয়া হ'য়ে গেছেন; কাউকে মানেন না।

—আসল কথা তা নয়। আমি একটা ভীষণ অপরাধ ক'রেছি জেনে শুনে—। যদি ক্ষমা কোরতে পারেন তো কোরবেন; না পারেন তো যা অভিশাপ দেবেন মাথা পেতে নেবো—। কিন্তু না বলতে পারলে নিঃশ্বাস সরল হচ্ছেনা আমার—।

বড় বড়, বুকের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পেতে-পারা চোখ তুলে চাইলো স্বপ্না—।

—আপনার সঙ্গে মিশে মুগ্ধ হয়েছি। আর গন্ধ পেয়েছি পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কের। আমাদের বয়সে প্রীতি শ্রদ্ধা যা ব'য়ে নিয়ে আসে তা জেনেও চুপ ক'রে থাকার পাপ ক'রেছি ব'লে অনুশোচনার অন্ত নেই আমার—।

ব'লেই তোমার সমস্ত কথা বলে দিলাম স্বমি! Settled হলেই যে আমাদের বিয়ে হবে তাও—।

কিন্তু কী দারুণ মানসিক শক্তি আর চরিত্র বল দেখলাম বলার পর—।

মুখখানা নেহাতই উল্টো-পেরিস্কোপ—অন্তর-সমুদ্রের সমস্ত ছবিই তাতে ভেসে ওঠে—তাই। সেই মুখই একটু আধটু বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করল যা! আর কিছু নয়—। কয়েক মুহূর্ত যেন স্নায়ুর সঙ্গে দাঁত-নখের সংগ্রাম করল স্বপ্না ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে; তারপর সোজা হ'য়ে বসল।

—তাতে কি হয়েছে? না না এতে পাপ করার কথা ভাববেন না। মনে করার মতো এমন কিছু হয় নি বোধ হয়। সব ঘনিষ্টতার পরিণামই কিছু এক নয়!

বুঝলাম আরো কিছু কঠিন কথা বলতে গিয়ে সামলে নিলো। সহজ হওয়ার চেষ্টা করলো—। হাসলো—।

এরপর প্রায় দু'ঘণ্টা বেশ সহজে যাকে বলে বন্ধুত্বপূর্ণ আব-হাওয়ায় আমাদের কথাবার্তা চললো নানা বিষয়ে। এতো শক্ত ব্যাপারটা এতো সহজ হ'তে দেখে ভালো লাগার কথা হ'লেও সত্যি বলতে কি, আমার বিস্বাদই লাগলো—।

মনের কোন অজানা কোণে ব্যর্থতার কাঁটাই যেন খচ্ খচ্ ক'রে উঠলো বার বার—।

আসল মনোভাব গোপন করতে গিয়ে আমাকেই পাল্টা আঘাত করলো স্বপ্না—। শুধুমাত্র ভাবতে ভালো লাগছিলো যে, সে কিছু না হওয়ার সুষ্ঠু অভিনয় করছে। মনে মনে এই ব'লে আত্মপ্রসাদের পিঠে হাত বোলাচ্ছিলাম—সু-অভিনেত্রী স্বপ্না সমাদ্দার—!

আশ্চর্য—!

ঐ বিমল আনন্দের দুর্বলতায় নিজের ওপর হালকা ধারণা হচ্ছিলো না তাই বা বলি কী ক'রে?

তবে স্থানকালটা যদি হতো মধ্যযুগের ফ্রান্স, রোম আর রোমান আমল, বিবিলিক্যাল ফিলিষ্টিন্? একটা কাণ্ড ঘটতো নিশ্চয়ই। হয় আমি খুন না হয় তুমি।

মানুষ যে সভ্য মার্জিত হ'য়েছে আর তার প্রকাশ করতে পাচ্ছে আচারে ব্যবহারে, বিশেষ বিশেষ এবং সর্বাঙ্গীণ জৈব প্রবণতাকে দমন, ক'রে তার প্রমাণ পেলাম।

আবেগ উচ্ছ্বাস স্বাভাবিক মানববৃত্তি অস্বাভাবিক, কৃত্রিম ভদ্রতাটাই সব—। সমস্ত—।

একসময় কখনো না-দেখা একটু বেশিই হাসলো স্বপ্না।

—আজ কিন্তু আপনাকেই আমার খাওয়ানো উচিত ছিলো!

—কিন্তু নেমন্তন্ন ক'রেছি আমি—!

—আর আপনি যে চলে যাচ্ছেন! 'ফেয়ারওয়েল' বলে তো একটা ব্যাপার আছে—।

—সে তো একমাস পরে —

—বেশ একদিন নেমন্তন্ন রইল। আশা করি চাকরির ব্যাপারে আমাদের সংস্পর্শে এলেও চাকরির মতো আমাদের দেখবেন না!

—সেকি? একি ভোলার? আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। সুপ্রভাদিকে বলবেন দোষ ত্রুটি যেন ক্ষমা করেন। একদিন ওঁকে নিয়ে আসুন আমার ওখানে!

—আচ্ছা। কি করবেন ঠিক করেছেন? হরিণ-চোখ তুলে চাইলো স্বপ্না। স্বপ্নে-দেখা চাউনি।

—এখানে তো মনোমত কিছু হ'লো না! ভাবছি য়ু-কে, গিয়ে আরো একটু উচ্চ শিক্ষা নিয়ে আসবো। ব্যবস্থাও ক'রেছি কিছু-কিছু ভেতরে-ভেতরে—।

—খুব ভালো! স্বপ্না উৎসাহ দেখালো চোখে মুখে। তারপর আর জমলো না। কেমন যেন আকস্মিক ভাবে সেদিন উঠলাম আমরা—। কথা গেলো ফুরিয়ে। স্কুলে পাশে-বসা ছেলের সঙ্গে যেমন বহুদিন দেখা-না-হওয়া উত্তর-জীবনে, কিছুক্ষণ পরেই অস্বস্তিকর লাগে, কতকটা সেই রকম মনোভাব নিয়ে আমরা উঠলাম।

কী বেঁধে রাখে মানুষকে? ভিত্তি কোথায় সম্পর্কের? একটা ইণ্টারেষ্ট? ভাবতে ভালো লাগে না।—

স্বপনে নয়, দোঁহে নয়, কোনো কিছুর মোহেই যে ছিলাম পুরোপুরি তাওতো নয়; তবু অনিবার্যভাবে জানতে বাকি থাকলো না একদিন যে—জাগার বেলা হ'লো—! যাবার বেলাও—। ঠিক একমাস পর—।

এর আগেই আমার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হওয়ার সংবাদের সঙ্গে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডক টু'র কাছে চিঠি এসেছে বাঁধা গতে—এস্, ডক টু, উইল প্লিজ সি ছাট্ শ্রী ঘোষাল ষ্টপস্ ওয়র্ক অন—। আসলে তার আগেই কার্যত আমি কার্য বন্ধ করেছি—। একদিন আগেই। আমার জায়গায় এসেছেন প্রবেশনার ব্যানার্জি, আমার প্রথমদিনের মতোই য়ুনিভারসিটির তাজা ছাত্র; চার্জ বুঝে নিয়েই বলেছেন, 'আজ আর থাকতে হবে না আপনাকে, চলে যান!

আলিঙ্গনের ঢেউ খেয়েছি, নিয়েছি বিদায়—।

—আবার হয়তো দেখা হয়ে যাবে কখনো কোলকাতার রাস্তায়! আসার আগে ব'লেছেন উনি।

—নিশ্চয়ই !

জানি এ সুর আর ফুটবে না কোনোদিন,—কোনোও দিনও না। এইবার বাইরে—। ব্যস্। শেষ—।

ঘন কালো পেন্সিলে আঁকা ছবির মতো এখানকার অদ্ভুত আকাশ ছাতার মতো মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম তোমার না-দেখা-এই ক্ষুদে অন্য জগতে—।

সে তো কাল।

আর আজ ছেড়ে চলেছি—।

এ বন্দরের কাল হ'লো শেষ—। সত্যি সত্যি—।

তবে যাবার বেলা মুক্ত কণ্ঠে ব'লে যেতে পারছি, যা দেখেছি যা শুনেছি তুলনা তার নাই !—

সোনা-গলা-সকাল।

এমন, ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ-সহজ ভোর তো দেখি নি। মুক্তি বলেই কি এমন? যাওয়ার মধ্যে মানুষের একটা পিছ-টান থাকেই, সুখের যাওয়াতেও ; ফেলে যাওয়ার বেদনা কোথায় যেন বাজে রিনরিনিয়ে—।

ভোরে সুরিনাম কোয়ার্টার্স ছেড়ে কিং জর্জেস ডক ঘুরে এসেছি শেষবারের মতো—। দেখা সাক্ষাত—। বিদায় সম্ভাষণ। শেষ—। সকালের—পিল্-পিল্ পিঁপড়ের সারি দিয়ে--নিয়মিত কাজে চলেছে মানুষ। আমিই ব্যতিক্রম—।

ওয়েষ্ট সাইডের দু'নম্বর গেটে পৌঁছে গেলাম হাঁটতে হাঁটতে। সব ঠিক তেমনই আছে। এইতো সেদিন প্রথম স্বাধীন কার্য-ভার নিয়ে এলাম এখানে দুপুরের ডিউটিতে—। এইতো সেদিন! অনাত্মীয়, বিদেশী মনে হচ্ছে আজ—। এগিয়ে চললাম তবু—।

দু'নম্বর গুদামের মধ্যে দিয়ে কোয়ে লাইনে গিয়ে পড়লাম। জাপানী জাহাজের ভিড় ওয়েষ্ট সাইডে। আয়রন-ম্যাঙ্গানীজ 'ওর' বোঝাই হচ্ছে দিনরাত। শেড চেকার দীনবন্ধু ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো—। বেঁটে খাটো, শক্ত সমর্থ, হীরে-মানিক-মনের দীনবন্ধুবাবুর ম্লান চোখের ভাষা শুনতে পেলাম।

—আমরা আপনাকে ভীষণভাবে মিস্ করবো স্যার। তবু বলি, আপনি বেঁচে গেলেন এ-নরক ভোগ থেকে। আপনার জায়গা নয় এটা—।

হাসলাম প্রতি-নমস্কার ক'রে—।

—চলুন, একটু সেকশনটা বেড়িয়ে সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত ক'রে যাই। দু'নম্বরের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা ক'রে পা চালালাম মন্থর গতিতে—। এই জায়গাটা—।

ঠিক—। চার নম্বর কোয়ে লাইনে থমকে দাঁড়ালাম আবার একবার—। জীবন যুদ্ধে রামচাঁদ প'ড়েছে এইখানে। না, কোনো চিহ্নই নেই। রক্তের দাগ কবে ধুয়ে মুছে সাফ্। মনের কোণে ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে শুধু—। কয়েক মিনিট পাহাড়ের নিশ্চলতা এলো আমার মধ্যে—। অনেকেই এলেন আশে পাশে। লক্ষ্য করলাম না। মন তখন ভেসে চলে গিয়েছিলো রামচাঁদের আত্মকাহিনীতে। গাঁট্টাগোঁট্টা রামচাঁদের গলার মালা বনলতা ওর মা'র পেছু পেছু ঘুর ঘুর করছে—।

কতোদিন হ'য়ে গেলো—। কোথায় কী অবস্থায় আছে কে বলতে পারে। ফিরে চাইলাম—।

—আচ্ছা, সেই জাহাজে রং করতে করতে যে লোকটি দুর্ঘটনায় প'ড়েছিলো এখানে, তার সংসারের খবর কেউ জানেন?

—সতীশবাবু জানেন—। দীনবন্ধু বললেন, দাঁড়ান ডেকে আনছি।

রাজ বাড়ির ঘণ্টার ঢং ঢং! না, বেলা ব'য়ে যাবার নয়, এক নম্বর ঝোলা ব্রীজটা খুলবে। হাতীকে 'খেদা 'অপারেশনে খোঁয়াড়ে পোরার মতো, দুপাশে দুটো কাছি লাগিয়ে একখানা জাহাজকে লক গেট দিয়ে টেনে গঙ্গা থেকে ডকের কৃত্রিম জলাধারে আনা হ'য়েছ। এবার অন্দর মহলে নিয়ে যাওয়া—। ট্যাগ লঞ্চ 'রোজ' আর 'ডাফোডিল' ফেউ লেগে আছে পেছনে সামনে। ওদিকে ইষ্ট সাইডে আর দু'নম্বর ডকের কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে জাহাজের ফাঁকে ফাঁকে। কাজ, তীব্র কাজ, আর শব্দ। কিসের তাগিদের জ্বর-বিকারে বন্দর কাজের শব্দে ভুল বকছে।

—নমস্কার! বলুন স্যার।

সতীশবাবুর হাসি মুখ। লম্বা ছিপছিপে, কালো-কালো। খুব লম্বা বহরের ধুতি মালকোচা দিয়ে পরা সুন্দর ক'রে—। স্মার্ট।

বনলতার কথা জিজ্ঞেস করলাম, রামচাঁদের মার কথা।

শুনে খুশি হবেন, বঙ্কুদার অক্লান্ত চেষ্টায় বনলতার আবার বিয়ে হ'য়েছে বছরখানেক হ'লো। ছেলেটার কেউ কোথাও ছিলোনা। বঙ্কুই সমস্ত ব্যবস্থা ক'রেছে। ওরা আবার সুখের মুখ দেখেছে।

—আর রামচাঁদের মা?

---তিনিও তো ওদের সঙ্গেই আছেন। যেন সেই ছেলে বউ। বঙ্কুদা অদ্ভুত, অসম্ভবকে সম্ভব ক'রেছে। রামচাঁদের মা পুত্র-শোক ভুলে গেছেন বললেই হয়।

—সত্যিই খুশি হলাম।

ওঁদের কাছে বিদায় নিলাম। কি রকম—কি রকম চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন ওঁরা। দূর থেকে চেয়ে আবার হাত নাড়লাম।

হঠাৎ অতি পরিচিত বর্ষা-সন্ধ্যায় গ্রামের পুকুর পাড়ে ব্যাঙের সমবেত সঙ্গীতের মতো, হাসপাতালের কোনো ওয়ার্ড থেকে ভেসে আসা রোগীর একঘেয়ে গোঙানির মতো, একটা শব্দ। চকিত হ'তে হ'লো—। ক্রমশ স্পষ্ট হ'লো শব্দটা। ছ'নম্বর গুদামের দক্ষিণপ্রান্তের হেভী-লিফট্ জিবিং ক্রেনটা শিফ্ট করা হচ্ছে—।

—মারো জোয়ান!

—হেঁইওঁ!!

—আউর থোড়া!!

—হেঁইওঁ!!!

—ডাল রোটি!!!!

—হেঁইওঁ—!!!!

—চিংড়ি ভাত—!!!!

—হেঁইওঁ—!!!!

লচ্চুর গ্যাঙ কাজ ক'রছে বোধহয়। অনেকদিন ওয়েষ্ট সাইডে ছিলাম না। এগিয়ে গেলাম।

—মারো জোয়ান!

—হেঁইওঁ—!!!

—সাহাব আয়া!!

—হেঁইওঁ—!!!—

—নমস্কার স্যার—

মদৎ আর জিগির শুনতে শুনতে হঠাৎ বাঙলা অভিবাদনে চমকে উঠলাম। ভালো ক'রে দেখিনি—।

—অবিনাশ!

অবাক। কতকগুলো পিওন-বই স্কুলের ছেলেদের মতো বুকে চেপে ধরা। নীল বুশশার্ট পরা, আটনম্বরের পিওন সেদিনকার অবিনাশের মুখটা দেখতে পেলাম যেন।

—তুমি টিণ্ডাল নাকি?

—হ্যাঁ স্যার! আপনার কৃপায় গ্যাঙে এসে আমার উন্নতি হয়েছে স্যার। রষ্টার গ্যাঙের টিণ্ডালে একটিং দিয়েছে।

—বেশ বেশ! বাঃ!

খুশির রোদ-ঝিলমিল অবিনাশের মুখখানা।

পতন অভ্যুদয় পন্থা—

এখানে রামচাঁদ প'ড়েছে, কিন্তু অবিনাশ তো উঠলো!

ওর মাস্টার মশাই ঠিকই বলতেন। যুগ শারীরিক পরিশ্রমেরই। টিকে থাকতে হ'লে ওকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। অবিনাশ পেরেছে। বাঙ্গালীরা নাকি পারে না? ধ'রে থাকেনা ব'লে।—আমি দেখিয়ে দেব স্যার—!

সেদিনের ওর কথাগুলোর স্মৃতির টেপ-রেকর্ডে ধরা ছিলো, বেজে উঠলো আবার, সময় বুঝে।

—তা কতোক্ষণ করছো শিফটিং? সব যে গলদঘর্ম।

—আর বলবেন না স্যার, এখানকার ক্রেন লাইনটার দোষ আছে। এই ক্রেনটা ঠেলতে গেলেই লাইন থেকে চাকা প'ড়ে যায়—। ডকমাস্টারের ইঞ্জিনিয়ার সায়েবকে কতোদিন রিপোর্ট দিয়েছি। কিচ্ছুই হলো না! পাল সায়েবকে একটু আপনি যদি বলে দেন স্যার!

—আচ্ছা! ওদের আর কিছু না ব'লে সামরিক ব্যারাকের মতো এল্ শেপের রাণীগঞ্জ টালির লাল টোপর পরা আমার ওয়েষ্ট সাইড অফিসে শুভদৃষ্টি দিলাম।

দূর থেকেই অফিসের কয়েকজন পিওনের সসম্ভ্রম অভ্যর্থনা—।

—কোন সায়েব? জিজ্ঞেস করলাম।

—বাসু সায়েব স্যার—। লেবার অফিসে রয়েছেন এখন। বলল রসিদ। হাসি-হাসি ম্লান মুখ। সমস্তই জানে—।

—আমাদের ছেড়ে চললেন স্যার ?

—তোমরা আর থাকতে দিলে কই ?

—সে কি স্যার ? ভালো জায়গা পেয়েছেন নিশ্চয়ই ?

—রাজা সায়েবকো আচ্ছা জায়গা জরুর মিলবে। রামজী উপুর আছে ! রামপেয়ারী এমন ভাবে ওপর দিকে চাইলো যেন নবদুর্বাদল দশরথাত্মজকে দেখতে পেয়েছে।

ওদের ইংগিতে আসছি ব'লে লেবর অফিসের দিকে গেলাম। বাইরে থেকে তুমুল তর্কের পাঞ্চজন্য শুনে বুঝলাম বাসু সায়েব কার ওপর কড়া কড়া উপদেশের আষাঢ় নামিয়ে দিচ্ছেন। ঘরে ঢুকেই ওদের চেয়ে আমি বেশি অবাক—। রোজারিও আর বাসু। সেই প্রথম দিনের একই রোজারিও—। হঠাৎ ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে গেল চার বছর। সে—ই প্রথম দিন ঝিলিক দিয়ে দিয়ে উঠলো মনের কোণে-কোণে—। ফ্লাশব্যাকে চার-চারটে বছর দেখে নিলাম এক লহমায়—।

—তুমি এখানে রোজারিও ?

—হ্যাঁ স্যার। সুপারভাইজার হয়েছি।

—ভালো, ভালো। শুনে খুব খুশি হলাম। উইলকিনসন কোথায় ? সেও হ'য়েছে নিশ্চয়ই !

—না স্যার, সে সুপার-কারগোই আছে। আরো শক্ত কাজে আছে। কয়লা ঠেলছে কোল-ডকে।

খুব স্বাভাবিক। এ জগতে রোজারিওরাই উন্নতি ক'রবে। বিবেচক ওরা। নগণ্য ভাদুড়িরও মান রক্ষে ক'রেছে সে ভবিষ্যৎ ভেবে। আর উইলকিনসনরা পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। জীবন যুদ্ধে পালিয়ে বাঁচার উপায় নেই। পালালেই ফল পেতে হবে উল্টো—। উইলকিনসনেরও তাই হয়েছে। আমিও কি ভুল করলাম না ?

বাসু উঠে এসে জড়িয়ে ধরলেন। বেশ মোটাসোটা হ'য়েছেন বাসু। বিয়ে-থা করে যাকে বলে স্থিতু হওয়া, তারই তৃপ্তির ছাপ ওঁর সর্বাঙ্গে—।

—আপনার কাছ থেকে শুরু, শেষও আপনার কাছ থেকেই হাসলাম। আমার জায়গায় এসেছেন বাসু সেকশন্‌কে টোন আপ করতে।

—আমার মনে হচ্ছে বেশ খানিকটা লেবর নষ্ট করেছি আপনাকে শেখাতে। আপনি অন্য কাজে থাকবেন বোঝাই গেছলো। যাই হোক শুভেচ্ছা রইল। বেশ হালকা ভাবে বললেও চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠলো বাসুর।

—আমার সঙ্গেও আপনার শুরু আর শেষ। চিয়ারিও স্যার! রোজারিও হাত বাড়িয়ে দিলো—। বেশি কথা বললেন না কেউ। সেই প্রথমদিনের কথা ভিড় ক'রে মনের সমস্ত চর-গুলোই দখল করতে চায়—। সংক্ষিপ্ত বিদায় নিয়ে বারান্দায় এলাম সবাই।

হঠাৎ তপেনের স্পোর্টকার খানা শব্দ ক'রে থামলো ইয়ার্ড অফিসের কৃষ্ণচূড়া গাছটার ছায়ায়। খোলাগাড়িতে দু'জন ফিরিঙ্গি মেয়েকে রেখে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামার মতো নামল তপেন।

—আমার চেক বইটা ফেলে গেছি বাসু; পেয়েছ?

—আচ্ছা লোকতো, চেক বই ফেলে যাও? দাঁড়াও দেখি। একটু ভান ক'রে দিয়ে দিলেন বাসু ড্রয়ার টেনে বার ক'রে। মুখে ইংগিতপূর্ণ হাসি।

—হ্যাভিং এ ফাইন টাইম? মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে তো?

—দূর! আমার দিকে চেয়ে বলল, চললে ঘোষাল? তোমাকে ভীষণ মিস্ করবো। আজ সময় নেই, পরে দেখা ক'রবো। চেক বইটা ছোঁ মেরে নিয়ে দৌড়ে গাড়িতে উঠে

সেলফ ষ্টার্টারের চাবুক মেরে গাড়ি ছুটিয়ে দিলো গাঁক গাঁক ক'রে! হাত তুলে বিদায় জানানো ছাড়া আর কিছুর সময় পেলোনা। অবাক লাগলো। তপেন চিরকালই একটা আশ্চর্য। ওর পরিবর্তন নেই।

ওয়েষ্ট সাইডের কিছু সংখ্যক কর্মচারীর একটা ক্ষুদ্রদল আমাকে ঘিরে চলল চার নম্বর গেট পর্যন্ত, কাজকর্ম ছেড়ে শেষ বিদায় দিতে—। দশ নম্বরের শেড্‌ফোরম্যান মিঃ রায়, বারো নম্বরের মিঃ চক্রবর্তি আট নম্বরের ফণী ঘোষও। কেউ বললেন ভালো ক'রেছি কেউ বললেন মন্দ। দুই মতামত থেকে স্বর্ণ-সিদ্ধান্ত নিলাম আমি, ভালোমন্দ দুই ক'রেছি—। ভার একদিকে হ'লে চলে না, ভারসাম্য চাই—বারো নম্বরের পেছনের ইয়ার্ডে পি, সি, এঞ্জিনের ধোয়ামোছা—। অহেতুক কান্নার মতো ষ্টিম ছাড়ছে এঞ্জিনগুলো—। বাউণ্ডারী-ওয়ালের বাইরে পোর্টপুলিশ অফিসের ওয়ারলেস ট্রান্সমিটারের শিরদাঁড়া কেঁপে কেঁপে, কেঁপে কেঁপে চ'লেছে আজো। একি ম্যালেরিয়া ওর? কী ধরনের ম্যালেরিয়া? গেট থেকে বেরোবার আগে পেছন ফিরলাম গুদামগুলোর ছাত ছাড়িয়ে, গলা বাড়িয়ে উঁকি মেরে, শেষ বারের মতো কি দেখে নিচ্ছে আমার ওয়েষ্ট সাইডের ক্রেন-গুলো? ওদিকে নির্লিপ্ত পৃথিবী তার অসংখ্য চিমনী-চুরুট থেকে ধূম উদ্গীরণ করে চলেছে অবিরাম। একি ধূমপান মত্ততা!

কালো-সোনা কোলডক্‌কে ডানদিকে ফেলে এগিয়ে চললাম দু'নম্বর ঝোলা ব্রীজ পার হ'য়ে। কোলডকের সামনেই একখানা গ্রীক জাহাজে কয়লা বোঝাই হচ্ছে। কুলি-কামিনদের সিল্যুট। ডকের ভারি গাঢ়-সবুজ জলের ওপর তেল প'ড়ে বর্ণচ্ছত্রের সৃষ্টি হয়েছে এখানে সেখানে।

এক ধরনের পাঁশুটে 'সী-গল' সমানে ডীপ-সী ফিশিং ক'রে চলেছে, নীচু হ'য়ে উড়ে উড়ে। সারাদিন ব্যস্ত থাকে ওরা, সারাদিন—। ছু'নম্বর ডকের দিকে একবার বৈরাগী দৃষ্টি দিলাম। অভিমানাহত দৃষ্টি—। ঐ-ই দূরে হেভী লিফট্ ইয়ার্ড, ধোঁয়া-ধোঁয়া আমার ভবিষ্যতের মতো অস্পষ্ট। পিঠ বার করা জলহস্তীর মতো নিঃঝুম হ'য়ে পড়ে আছে বড়ু সারেঙের বোট গুলো। ঐ বোটই আমাকে প্রায়-বেকারীর তীরে দিলো পৌঁছে। মাথায় করে নিয়ে যেতে হলো সোনার ধান নয়, হেরে যাওয়ার বোঝা। খানিকটা ইচ্ছাকৃত ঘাড়ে নেওয়া অপমান। আজ কতো অর্থহীন মনে হচ্ছে বোটগুলোকে। নিঃশ্বাস পড়লো আমার—।

পাঁচ নম্বর গেটের মধ্যে দিয়ে হাইড্রলিক্ এঞ্জিনিয়ারের অফিস নজরে পড়ল। একটা ইটের গম্বুজের মতো, চিমনীর মতো স্তম্ভ, যা দিয়ে কখনো ধোঁয়া বেরোতে দেখি নি। একভাবে দাঁড়িয়ে রোদ, বৃষ্টি, ঝড় সহ্য করতে দেখেছি সমানে দাঁড়িয়ে, চার-চারটে বছর। সহিষ্ণু স্তম্ভ।

ছু'নম্বর গেট দিয়ে এক নম্বর ডকে প্রবেশ করে রাস্তার পাশে শাল গাছগুলোর ছাতার তলায় তলায় এগিয়ে চললাম মন্থর গতিতে।

—ঘোষাল! জাষ্ট এ মিনিট! চীৎকারে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম টেলিফোন এক্সচেঞ্জের দোতলার জানলায় ডকের বিস্ময় মিঃ লিউইস। আমাকে হাত তুলে অপেক্ষা করতে বলছেন—জাষ্ট এ মিনিট! ছুটি নিয়ে য়ু-কে গিয়েছিলেন আটমাসের জন্যে—কবে শেষ হলো ছুটি? কয়েক মুহূর্ত পরেই একখানা স্যাণ্ডউইচের দফারফা করতে করতে এগিয়ে এলেন উনি—। আমাকে চেয়ে থাকতে দেখে বললেন,—তুমি কি জানতে না যে, মিস জর্জের ব্রেকফাষ্টের অর্ধেক আমার?

শুধু কি তাই—! আর বলতে না দিয়ে জানতে চাইলাম কবে রিজ্যুম করলেন উনি—।

—ওনলি ইয়েসটারডে—। তুমি নাকি রিজাইন করেছ ঘোষাল? আই টুক ইট্ টু বি এ ব্লাফ্। রিয়েলি?

—কথাটা সত্যি স্যার! আজ চলে যাচ্ছি। আপনি কোথায় পোষ্টিং পেয়েছেন?

—স্পেশ্যাল ডিউটি। উইদাউট পোর্টফোলিও। এইভাবে একটা মাস চললেই ছুটি।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলাম—।

এ্যাম্ ক্লোজলি ফলোইং য়ু, মাই বয়! নেক্ এ্যাণ্ড নেক্। ফিরে এসে আমাকেও রিজাইন করতে হ'লো অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

—কেন স্যার?

হঠাৎ সদানন্দস্বরূপ মিঃ লিউইসের মুখে মেঘ নামলো—।

—হার হাইনেসের জন্যে! মিসেস বিলেতে সেট্‌ল করতে চান তাঁর দাদাদের মতো। আমার লাইফ মিজারেবল ক'রে তুলেছিলেন। এতোদিনের—সমস্ত ছেড়ে আবার নতুন ক'রে আরম্ভ করতে হবে। ঠিক ক'রে এসেছি। বাট আই ডোণ্ট লাইক্ লণ্ডন ওয়েদার! উপায় নেই। এ-বয়সে ডিভোর্সের কথা ভাবা যায় না। সমস্ত টাকা মিসেসের হাতে ব'লে নয়, আই রিয়েলি লভ হার!

এবার একটু জোর দিয়ে বললেন—এবং আমি কোলকাতাকে ভালোবাসি। আমার জীবনে আর আনন্দ নেই ঘোষাল, মাই-ডিয়ার চ্যাপ, য়ু-কে'র আবহাওয়ার মতোই নিরানন্দ আমি।

জীবনে এই প্রথম লিউইস সায়েবের ছলোছলো চোখ দেখার দুর্ভাগ্য হ'লো। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। হঠাৎ চাঙ্গা হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন—

—আচ্ছা মিসেস ম্যাকিনটশ্ নাকি তোমাকে—? সত্যি- ?

—কিছুটা—।

—খুব এগ্রেসিভ ? —যাবার আগে একটা উপকার ক'রে যাবে ঘোষাল ?

—বলুন—!

—আজ তোমার বাসায় লাঞ্চ করবো। সেই সময় মিসেস ম্যাকিনটশের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে ? দিস্ ইজ মাই লাষ্ট, ও নো, নট অর্ডারস্,—দিস্ ইজ এ রিকোয়েষ্ট !

আমার চোখ কপাল ছাড়িয়ে উঠতে চাইলো—। শ্মশান-বৈরাগীর প্রেম নিবেদনের মতো শোনালো কথাটা। একদিকে তপেন, অন্যদিকে তার বস্। লিউইস সায়েবকে দেখে কিন্তু মনে হলোনা যে অস্বাভাবিক কিছু বলছেন তিনি। একটা পেন্সিল চেয়ে নেওয়ার মতোই ছোট্ট রিকোয়েষ্ট যেন—। ঘাড় একদিকে নাড়বো না দু'দিকে নাড়বো ঠিক করার আগেই উনি নিজেই নাড়িয়ে নিলেন— না বোলোনা, লক্ষ্মীটি! বল, হ্যা !

—আচ্ছা ! 'ইতি গজ'র মতো বললাম— লাঞ্চে আসবেন ! 'শুধু' শব্দটা অর্ধোচ্চারিত রইল—

থ্যাঙ্ক্ ! ব'লেই হঠাৎ হোঁচট খেতে খেতে উল্টোমুখো দৌড় দিলেন উনি টেলিফোন এক্সচেঞ্জের দিকেই। বোধ করি ক্লার্ক ইনচার্জ মিস্ জর্জের ব্রেকফাষ্টের সমস্ত পদগুলো তখনো শেষ হয়নি।

আমার ঠোঁটের ওপর দিয়ে একটা মৃদু হাসির ঢেউ ব'য়ে গেলো। আর সে ঢেউ চললই; ঢেউএর পর ঢেউ। কারণ ইষ্ট সাইড্ অফিসের কাছাকাছি যেতেই লক্ষ্য করলাম আমাকে দেখতে পেয়েই, কি একটা কথা সুপারিন্টেডেন্ট-এর কাছে অর্ধসমাপ্ত রেখে, সমাদ্দার সায়েব, কি যেন একটা জরুরি কাজ

মনে পড়ল, এই রকম ভাব দেখিয়ে, হঠাৎ গাড়িতে উঠে ভোঁ দৌড় দিলেন ডক অফিসের দিকে। ঠোঁটের হাসির ঢেউ তাই আমার শান্ত হ'তে চাইলো না সহজে।

সাতপাঁচ না ভেবেই পাঁচ-সাত শেডের মাঝে দাঁড়ালাম 'কী' লাইনে, 'শিয়ার লেগ' দানবের পায়ের তলায়, ব্রবডিঙনাগের কাছে গ্যালিভারের মতো।

এইখানে ধান্নু প'ড়েছিলো গমের বস্তার চাপে। তার স্থূল পাকস্থলী যে গমের কাছে ছিলো দুর্গম সেই গমেরই পথ সুগম হ'লো তার সূক্ষ্ম প্রাণের কাছে। ছিনিয়ে নিলো এক মুহূর্তে। পেটে না খেয়েও পিঠে সইতে হয়েছিলো বেচারাকে। অত আতিশয্যের মধ্যেও তার ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা ছিলোনা, সমুদ্রের পিপাসা মেটানোর শক্তির অভাবের মতোই।

বেচারা ধান্নু! আর যশমতিয়া?

দূর থেকে অফিসে আসার পথে দেখতে পেয়ে শুভ্রাংশু সেন আবার আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, যেমনটি দাঁড়িয়ে ছিলেন ধান্নুর দুর্ঘটনার দিনে।

কতো, কতো স্মৃতি বিজড়িত ডক। শুভ্রাংশু সেন সর্বাঙ্গ-শিল্পী,—কথা ব'লে এই শেষ ভারি উপলব্ধিটুকুকে নষ্ট করলেন না।

নীরব-মৃদু হাসিতে জানালেন অভিবাদন। ফেরার পথে জিজ্ঞেস করলাম ধান্নুর যশমতিয়া আর ছেলেমেয়েদের কথা—।

—খুব খারাপ স্যার! ছেলেটাকে একটা চাকরি যোগাড় ক'রে দেয়া হ'য়েছিলো; রাখতে পারলো না; বিগড়ে গেলো হঠাৎ। আর মেয়েটা যেন কোথায় চলে গিয়েছে। ঘুঁটে-টুটে কুড়িয়ে দিন চলে ধান্নুর 'মতিয়ার'।

ওদিকে ঝিংড়ি গেছে মারা—। দেশে গিয়ে দেহ রেখেছে ঝিংড়ি। দিন পনরো হ'লো ওর মৃত্যু সংবাদ এসেছে আমার কাছে—। এখন আর কে দেখবে যশমতিয়াকে— ?

শুনলাম শুভ্রাংশুবাবু মাঝে মাঝে নানা ভাবে সাহায্য করেন তাকে—।

—চললাম ভাই ! হাত বাড়িয়ে দিলাম ওঁর দিকে,—আমি জানি, আপনিই ঠিক্ দেখবেন এদের। আপনাদের মতো কয়েক-জনের ওপরই ভরসা শুধু এদেরই নয়, হয়তো সমগ্র মানবজাতিরও !

হাতে গরম চাপ দিয়ে চ'লে এলাম—।

ডক ওয়ানের সুপারিনটেনডেণ্ট্ মিঃ মুখার্জিব সঙ্গে দেখা করলাম এবার শেষবারের মতো। উনি, শুনি লোক ভালো নয়। আমার ব্যাপারে কিন্তু এ প্রবাদ অসত্য। উঠে এসে আলিঙ্গন ক'রলেন—। চা খাইয়ে দিলেন বিদায়—। শেষ চায়ের আসরে এখানকার এ, এস্, মজুমদারও দিলেন যোগ।

পিওন-খালাসিদের অভিবাদনের যথাযথ উত্তর দিতে দিতে এক নম্বরের সিংহদ্বার দিয়ে এ বন্দরের অন্দরমহল থেকে চিরকালের জন্যে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে চললাম পায়ে পায়ে—।

আকাশ থেকে নেমে এসেছে আলোর সংকেত ; অন্তরে যে চিরন্তন মানুষটি বিবর্তনের মালা গেঁথে গেঁথে চ'লেছেন, যাঁর অকারণ অবারণ চলাই প্রাণস্পন্দন, তিনি যেন বিশ্ব বাউলের একতারায় ডাক দিয়ে সাড়া পেলেন আমার—। —যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল ! তাঁর আদেশ শুনেছি আকাশের আলোয়, ঋতুর বিবর্তনে, বাতাসের গানে, জলচ্ছ্বাসে আর পাখির কল কাকলিতে। ভেতর থেকে বাইরে এসে সামনে দাঁড়িয়ে সেই বিশ্বপুরুষ ডাক দিয়েছেন ; বিশ্বমাঝে ছাড়া পাবার ডাক। শুনিয়েছেন—জোয়ার এসেছে ! বন্দর ছাড়ো— !

ষ্ট্রাইক্ দি টেণ্ট্!

মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে বাসায় এলাম শুধু মাত্র বাসাটাকে ছেড়ে যেতে, চিরকালের মতো—। সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে। এরপর বাসায় এলো জোয়ার, মানুষের জোয়ার। প্রথমে এলেন মিসেস্ ম্যাকিনটশ্ উগ্রতম পোশাকে। একগুচ্ছ টকটকে লাল ফুল আমার হাতে তুলে, দিলেন বিদায়।

—আমার যেন মনে হচ্ছে, আমারই জন্যে তুমি চ'লে যাচ্ছ। আমি কি,—আমি কি ভেলভেট্-টাইগ্রেস?

হেসে উঠলাম হায়নার মতো।

—সুইটেষ্ট্ কাওয়ার্ড! ব'লে আমার গালে প্যাট্ করলেন ছোট ছেলের মতো—।

—বিদায়কালীন দুর্বহতা, মানসিক শিলাবৃষ্টি সহ্য করতে পারিনে আমি। চললাম স্রুব্রট, তুমি গেলে রাত ক'রে ফিরবো। চিয়ারিও!

শর্ট পরা। টেনিসখেলোয়াড়-সুলভ কাটাছাঁটা জামা। কটাক্ষ ক'রে গাড়িতে উঠলেন লাফিয়ে। টাইগ্রেসের সতেজ গর্জনে লাফ দিলো গাড়ি সামনের দিকে। ব্যাপারটা বুঝে নিতে বেশ কিছুক্ষণ লাগলো আমার। নিঃশ্বাসও পড়ল স্বস্তির। লিউইসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার অন্যায় থেকে পেলাম রেহাই—!

ব'সে পড়লাম বারান্দার বেতের চেয়ার খানায়। ঠিক বারোটা। বুঝি বা একটু ঘুমও এলো—। স্বপ্ন দেখছিলাম? কিসের শব্দে চমকে উঠে তন্দ্রা গেলো ছুটে। চেয়ে দেখি—দাঁড়িয়ে আছো তুমি একি! . জোয়ারই এসেছে। দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার

নয়, মনের আঁধার, পরে আলোর জোয়ার। দু'খানা গাড়ি ততক্ষণ প্রবেশ করেছে কোর্ট ইয়ার্ডে—। সুপ্রভাদি, প্রত্যোৎ একখানায়, অন্যটায় স্বপ্ন বোঝাই,—একা স্বপ্না—।

প্রদীপের আলোর ম্লান-স্নিগ্ধ হাসিতে অভ্যর্থনা করলাম এগিয়ে গিয়ে। ওদের আসার কথা ছিলো, একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করার কথা—। গাড়ি থেকে নেমেই সুপ্রভাদি মৃদু ধমক দিলেন—

—বারে ছেলে! বেশ তো নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে আছেন? যাওয়ার উত্তেজনায় টান-টান হ'য়ে থাকবেন তো!

তারপর একপাশে নিয়ে গিয়ে জনান্তিকে বললেন—।

—স্বপ্নাকে কি বলেছেন? ক'দিন ধরেই দেখছি কেমন-কেমন। কাল ওদের বাড়ি ছিলাম রাতে—। বারে বারেই ঘুম ভেঙ্গেছে ওর নিঃসঙ্গ কান্নার বর্ষণে—। আর শেষ রাতে ।—

সুপ্রভাদির হাত দু'খানা নিজের হাতের মধ্যে জোড়া ক'রে নিয়ে নমস্কারের ভঙ্গিতে বললাম—আর বলবেন না সুপ্রভাদি; লক্ষ্মীটি! সমস্ত ওলট পালট হ'য়ে যাবে তাহলে—।

—আপনি কি জানতেন না?

আপনাকেই বলা হয়নি; অন্যায় হয়েছে! দু'তিন দিনের মধ্যেই লিখে জানাবো—। আমার অপরাধ নেই জানবেন! এই আশ্বাস দিয়ে সকলের মধ্যে এলাম আবার। লক্ষ্য করলাম আধফোটা ফুলের গাম্ভীর্য স্বপ্নার মুখে। দু'একটা সাধারণ কথা ব'লে অতি উৎসাহ দেখিয়ে লাঞ্চের ব্যবস্থার তদারক করতে গেলো সে হাসি মুখে। আমরা গল্পগুজব করতে লাগলাম প্রত্যোতের ছাদভাঙ্গা হাসির ফাঁকে ফাঁকে—।

লিউইস সায়েব লাঞ্চে এলেন না। জানতাম আসবেন না।

যখন লাঞ্চের কোনো ব্যবস্থা হয়নি তখনই নিজেকে নিজে ক'রেছেন নেমন্তন্ন। পরে ব্যবস্থা হ'য়েছে নিশ্চয়ই—। আর ম্যাকিনটশ্‌ গৃহিণীর সঙ্গ সুখ ? সময় যে মাত্র একমাস।

আমরা যে এতো হৈ চৈ করলাম, কিন্তু মণি সায়েবের বাড়ি থেকে না সাড়া, না শব্দ, না স্বাভাবিক কৌতূহল। মনে হ'লো যেন কেউ নেই বাড়িতে—। জানলার আড়ালে অদৃশ্য চাউনি পর্যন্ত বন্ধ।

লাষ্ট-লাঞ্চ শেষ ক'রে প্রদ্যোৎ চলে গেলো শেষ ক্ষেপের মালপত্র আর চাকরকে নিয়ে বড় গাড়িখানায় ওর ফ্ল্যাট হ'য়ে হাওড়া স্টেশনে। আমরা একটু পরে সোজা যাবো মন্থর গতিতে স্বপ্নার গাড়িতে—।

ঠিক হ'য়েছে কয়েকদিন থাকবো বাড়িতে, তারপর ফিরে এসে পাড়ি দেবো সমুদ্র-পার—।

এর আগে সুপ্রভাদি আমাদের একান্তে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন একাধিকবার—।

—স্বপ্না, পারেন তো আমাকে মার্জনা ক'রবেন। লনে বেড়াতে বেড়াতে মৃদুকণ্ঠে বলেছি।

—সুমিতাদিকে আপনি নিশ্চয়ই সমস্ত বলবেন। ওঁকে আমাকে ক্ষমা করতে বলবেন। ভুল বুঝতে করবেন মানা। না জেনেই—। চোখ চিক্ চিক্ ক'রে উঠলো স্বপ্নার—।

—আর কোলকাতায় এলে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসবেন।

অঙ্গীকার করলাম—।

—তোমাদের যে দেখি যাবার ইচ্ছেই নেই।

তাড়া দিলেন সুপ্রভাদি। হঠাৎ চিঠির বাক্সটা নাড়াচাড়া শুরু ক'রে দিলেন—ব্যাপার কি ? কোন সকালে ডাক দিয়ে গেছে জানেনেই না দেখছি !

—ডাকপিওন যদি সামনে থাকতো তো গেয়ে উঠতাম বেসুরো—তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তা জানে না।

হালকা করে দিতে চাইলাম ভারি মুহূর্তগুলোকে।

—আর রসিক হ'লে ডাকপিওনও গাইতো—ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই, তারই লাগি—ইত্যাদি! হেসে বললেন সুপ্রভাদি। স্বপ্নাকেও হাসতে হ'লো তাল রেখে—

এবার যাত্রা হ'লো শুরু—।

তিন নম্বর গেটের সামনে দিয়ে প্রধান সড়ক ধ'রে যেতে চাইলাম। ছ'টো বেজে গেছে। আফটারনুন্ ডিউটি থাকলে হয়তো কিছুক্ষণ আগে এখান দিয়ে যেতাম কাজে। আর আজো কাজেই যাচ্ছি। অন্য কাজে। গাড়িকে বললাম মরাল গমনে যেতে। ফিরে ফিরে চাইতে হবে শেষবারের মতো।

সেদিন সকাল মনে হ'লেও, সে আজ সত্যিই হ'লো কতো কাল! চার বছর। প্রতিদিনের বেলফুলের-গাঁথা গোড়ে। বদল করাই হ'লোনা শুধু—। যেন সেদিনের দেখাই দেখছি আবার। দৃষ্টিভঙ্গিরই তফাত শুধু যা। পোর্ট আর্মড্ পুলিশের হেডকোয়া-টার্স ফেয়ার ওয়েদার হাউসের সামনে মোড় নিয়ে পূবমুখো হ'তেই পথ আটকালো ছ'নম্বর ব্রিজ। এখানে ওয়েদারকে ফেয়ার হতে ক্বচিৎ দেখা গেছে। ব্রিজ নিজেকে ছ'ভাগ ক'রে দিয়ে পথ ক'রে দিচ্ছে এক কাজ শেষ করা, পাড়ি-দেয়া জাহাজকে। অকূলে তরী ভাসাতে ব্যস্ত সে। এই দেহের ভেলা নিয়ে যে আমিও সাঁতার দিয়েছি, তার দিকে কি নজর নেই? হয়তো নজর বেশি ব'লেই —। ভিড়ের লেজের দিকে চার নম্বর গেটের সামনে থামলো গাড়ি—। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম জাহাজ খানা ভাসার উত্তেজনায় ব্লু-পিটারের নিশানা উড়িয়েছে পত্‌পতিয়ে। কাঁপা গলায় শীতেরদিনে মুখ দিয়ে শাদা বাষ্প বেরোনোর সঙ্গে শব্দ তুলছে—ভোঁ—।

তার ভোঁ-দৌড়ের প্রস্তুতি। এখুনি দূরের এক নম্বর ব্রিজও পথ ছেড়ে দেবে সম্রাজ্ঞীর সম্মানে। লক্ গেটের সিংহদ্বারের ডালা যাবে স'রে। জাহাজ গঙ্গালাভ ক'রেও ত'রে যাবে অজাগর গরজে ফোঁসা সাগরকে—। মন ভ'রে দেখে নিতে নামলাম গাড়ি থেকে। দূর থেকে চার নম্বর গেটের গেট ওয়ার্ডার গোপাল চ্যাটার্জিকে দেখেও নেমেছি। ডক শ্রমিক য়ুনিয়নের সভাপতি শ্রীচ্যাটার্জি। দেখা করা উচিত—। দেখতে পেয়ে উনিও উঠে এসেছেন ইতি মধ্যে।

—আপনার কাছে আমাদের একটা অপরাধ হ'য়েছে!

—কী ব্যাপার?

—ঘাট সারেঙ বতুকে আমরা না জেনেই সমর্থন করেছিলাম আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপারে—।

—সেতো আপনাদের কর্তব্য—।

—হ'লেও,—বতু সত্যিই চোর—! যাবার আগে শুনে যান, কাল সে ধরা প'ড়েছে এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চের হাতে স্মাগ্‌লড মাল নিয়ে, বামাল সমেত যাকে বলে—! আর এই ধরানোর পেছনে আছে আপনার বিশ্বস্ত পিওন রমজান আলি। আপনার ব্যাপারের পরদিনই চুপি চুপি খবর দিয়েছিলো পুলিশে।

আমরা সত্যিই দুঃখিত আপনার জন্যে—।

মনটা নড়ে উঠলো। এ-যে বিদায় বেলার মালাখানি!—

—দেখুন ও ব্যাপারটা উপলক্ষ্য মাত্র। আমি যেতামই। তবে ঐ ব্যাপারে আমার ষ্ট্যাণ্ডও ঠিকই ছিলো; কর্ত্তৃপক্ষ বুঝ-লেই সান্ত্বনা। এরপর নানান কথা এলো কথায় কথায়। য়ুনিয়নের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধেও। আশার আলো দেখলাম শ্রীচ্যাটার্জির চোখে। ওদিকে ব্রিজও সহজে যেতে দেবেনা।

সেই প্রথম দিন নবাগতকে সহজে আসতে দেয়নি এপারে,—মনে আছে তো? আজ বুঝি প'ড়েছে মায়া?

ভিড়ের মধ্যে থেকে খাকী ছেঁড়া ধলধলে ট্রাউজারের একজন আমাকে সম্বোধন ক'রে, কথা ব'লে উঠলো সামনে এসে, জোর ক'রে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে—।

—এ, এস্? ক্যান হেলপ য়ু ইন গুড পোষ্টিং! ডু য়ু নো মি?

আশ্চর্য। মিঃ ভাতুড়ি। তিনি ছাড়া আর কেউ বা হবেন? সেই প্রথম দিন দেখার মতোই—। রোজারিওর বদলে আমাকে ডাক দিয়েছেন শুধু। কিছুদিন আগেও একবার কথা ব'লেছেন সাহায্য চেয়ে। একবার গাড়ির দিকে তাকালাম। সুপ্রভাদির দৃষ্টি এড়ায়নি। কারণ গাড়ির খুব কাছেই যে! আবার বললেন মিঃ ভাতুড়ি— ওয়াণ্ট রেকোমেণ্ডেশন? হুম টু বি রেফারড্? বোভিন্? সমাদ্দার? অল ফ্রেণ্ডস্! আই ক্যান গেট য়ু দি আপার গ্রেড। গিভ মি ফাইভ রুপিজ ফর দি প্রেজেণ্ট, এ লোন্,—। ওণ্ট য়ু?

বললাম আমি সে চেষ্টার বাইরে, কারণ রিজাইন্ ক'রেছি।

—রিয়েলি? দেন য়ু আর মাই বেষ্ট্ ফ্রেণ্ড ইন্ দি য়ুনিভার্স। আই কিক্ড এওয়ে কমিশনারস্ সার্ভিসেস্ মাইসেলফ। বীং এ ফ্রেণ্ড, য়ু শুড গিভ মি থার্টি চিপস্ এট্‌লিষ্ট!

ব'লে আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে মুখ ঘোরাতেই—আমি দেখতে পেলাম—ওঁর নজর পড়ল গাড়ির ভেতর সুপ্রভাদির দিকে—। অমনি কেমন হ'য়ে গেল মুখখানা—। জোর ক'রে হাসিটাকে টেনে রেখে আমায় বললেন—ও নো, আই ওয়াজ জোকিং! য়ুড্ য়ু এক্‌সেপ্ট্ দিস্ এজ এ টোকেন্ অফ্ ফ্রেণ্ডশিপ?

আমাকে অভিভূত ক'রে দিয়ে উনি পকেট থেকে বাঁকা-তোবড়ানো, তামাক বেরিয়ে আসা, লাল অক্ষর লেখা একটা

কম দামী সিগ্রেট্ বাড়িয়ে ধরলেন। রাহুগ্রাসের পর থেকে ভাদুড়িকে কখনো কোনো জিনিস কাউকে দিতে দেখা যায়নি। এই প্রথম। এই প্রথম উনি নেয়ার বিপরীত কিছু করলেন। প্রত্যাখান করতে পারলাম না; দিলাম হাত বাড়িয়ে। উনি ক্ষয়ে যাওয়া-কালো ছোপ ধরা দাঁতগুলো সুন্দর ভাবে মেলে ধ'রে বললেন,—থ্যাঙ্ক!

একবার গাড়ির অন্দর মহলে পাঠিয়ে দিলেন দৃষ্টির চোরকে, তারপরই আবার একটু হেসে—সী য়ু এগেন্! ব'লে নড্ ক'রে যেন জোর ক'রে পা টানতে টানতে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন—। গাড়ির দিকে ফিরে দেখলাম সুপ্রভাদি ঘন ঘন রুমাল দিচ্ছেন চোখে, আর স্বপ্না, যেন সুপ্রভাদির ব্যাপার কিছুই দেখতে পায়নি, এমন ভাবে অন্যদিকে চেয়ে সামলাচ্ছে সমস্ত দিক—।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যেন সাতরাজার ধনের সন্ধান পেলাম। ব্রিজ বন্ধ হবার ঘণ্টা বাজলো মন্দিরের ঘণ্টার মতো—।

গাড়িতে উঠে ব'সে আড় চোখে দেখলাম, দুধ উথ্‌লে গেলে পাত্রের গায়ে যেমন দাগ পড়ে তেমনি দাগ সুপ্রভাদির গালে—।

পিঁপড়ের সার চলতে চলতে যেমন হঠাৎ উল্টো মুখোদের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ায় ক্ষণেকের জন্যে, তেমনি মানুষে মানুষে, রাস্তা খুললেই দু'মুখী জনতার ঠোকাঠুকি হ'য়ে যায় প্রতিমুহূর্তেই। সকলেরই তাড়া। গাড়ির আবার অন্য ব্যবস্থা। একমুখো গাড়ি পার হ'য়ে গেলে তবে অন্য মুখোদের ছাড়া হবে ব্রিজের ওপর। সেই ব্যবস্থায় আমাদের আরো কিছুক্ষণ দেরি হলো। হোক।

সী-গলের উড়ে চলা, জাহাজের অকূলে ভাসার প্রস্তুতি তো দেখলাম! ওদিকে খুলে দেয়া হয়েছে এক নম্বর ব্রিজ। রাজহাঁসের মতো ভেসে চলেছে জাহাজখানা। পেছনে সামনে কাচ্চা-বাচ্চা,

ট্যাগলঞ্চ 'রোজ' আর 'ডাফোডিল'। জাহাজখানার নামটা প'ড়ে ভালো লাগলো—'ওশন্ ওয়ে'! ডক্ জলাধারের বুকে ব্রিজের ওপর উঠলো আমাদের গাড়ি। বার্থে বার্থে সার সার জাহাজ নোঙর করা—।

সেজদার হাসিটা মনে এলো হঠাৎ—।

—নোঙর কিরে গাধা?

—হ্যাঁ নোঙরই তো! অন্যায় কি বলেছে ও?

মেজদার সাফাইও।

এক নতুন তাৎপর্য। নোঙর তো বাঁধার জন্যে নয়, ভাসার জন্যে; ভেসে চলায় ক্ষণিক ঝিম লাগার, উৎসাহ, শক্তি সংগ্রহের জন্যেই না!

বাইরে বিরাট পৃথিবীর প্রাণস্পন্দনের শব্দ, গাড়ির ভেতর আমরা যেন স্পন্দহীন। শুধু অন্তরে অন্তরে স্মৃতি রোমন্থনের অস্ফুট গুঞ্জন হৃৎপিণ্ডের পেণ্ডুলামের টিকের সঙ্গে ঠিক মিলিয়ে চলেছে। কথা ব'লে উপলব্ধির জাল ছিঁড়ছি না আমরা। গাড়ি দু'নম্বর গেট পেরিয়ে ওয়েলফেয়ার অফিসের সামনে আটকা পড়ল। চাইলাম! কলিমুদ্দিনের দল ঠিক দাঁড়িয়ে ম্যারাথন-অপেক্ষায়। ওরা মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে হাসির ফুলঝুরি জ্বালিয়ে দিলো আমাদের দিকে চেয়ে। বুঝলাম কারণ। গাড়ির মেয়েরাই ওদের লক্ষ্য। স্বাভাবিকও। বোঝার আমিই একমাত্র প্রাণী তাই রক্ষে।

'আমিনিয়া' হোটেলকে পাশে রেখে এগোলাম। সেখানে চলেছে মুসলমান শ্রমিকদের খানাপিনা, ওদের ট্রাডিশন্যাল ষ্টাইলে—। ডান দিকে ট্রাম ডিপোর উল্টো দিকে, ডক লেবার বোর্ডের তারের বেড়া ঘেরা এলাকায়, খোঁয়াড়ে ভেড়া রাখার মতো মানুষ ভর্তি করা। ষ্টিভেডোর-শ্রমিকরা বিভিন্ন জাহাজে

কাজের বুকিং নিচ্ছে। মাইক্রোফোনে 'রক্তকরবীর' খোদাই-করদের মতো সংখ্যা ধ'রে ধ'রে বুকিং বাতলানো হচ্ছে সাড়ম্বরে—।

ট্রাম-ডিপো ছাড়িয়ে গাড়ি এগিয়ে চললো—। পাশে স্বপ্নার নিঃশ্বাসের ওঠা নামা শরীরের ডানপাশ দিয়ে নিখুঁতভাবে অনুভব করলাম। এতো কাছে হয়তো জীবনে আর কোনদিন আসবে না সে। দেখা হবে, ভদ্রতার পরিমাপ রেখে চলবে কথাবার্তা, মনগোপনের অভিনয় চলবে সারা জীবন। স্বপনচারিণী হ'য়েই থাকবে সে,—চিরকাল, চিরকাল! বাস্তব হবে অন্য কোনো ভাগ্যবানের জীবনে। ব্যথা লাগে ভাবতে। হিসেবে একটু এদিক ওদিকের জন্যে বিভিন্ন হবে জীবনের প্রধান সংখ্যা। এমন সম্পর্কের যোগফলটা শূন্য? শূন্যটা শুধু বাঁ দিকের শূন্যই থেকে যাবে?

এতো কাছে থেকেও বহুদূরে পাড়ি জমালাম আমি মনে মনে। আমার স্বাভাবিক মানসাভিসারে বাধা ছিলো না। সবাই চুপচাপ।

ষ্টেশনে পৌঁছেই শাখা নদীর মতো ভিন্ন পথ ধরবো আমি, গতি যাবে পাল্টে। কখনও কখনও সাত সাগরের জোয়ার আনবো মনে, স্বাদ নেবো এক সমুদ্রের। আবার ভাঁটার দিনে স্মৃতির গুণ ধরে হেঁই-টান দিয়ে চলতে হবে উজান বেয়ে জীবনের পণ্য নিয়ে, পূর্ব অভিজ্ঞতার অববাহিকায়, পলিমাটির আশায় আর চিত্রের নিসর্গরাজ্যে—।

চাকরির স্থায়িত্বের শেকড় গেড়ে নিশ্চিন্তি আর সন্তুষ্টির রস আহরণ করা বোধ হয় হ'য়ে উঠবেনা আমার কোনো দিনও। মানসিক গঠনটাই ঐ দর্শনের প্রতিকূল। সন্তুষ্টিতে থেমে যাওয়া

প্রকৃত জীবনের মৃত্যুই—। যেতে যেতে হ'য়ে ওঠা ; হ'য়ে হ'য়ে যাওয়াটাই জীবন।

এখুনি গাড়ি খিদিরপুরের মোড় ছাড়িয়ে আদিগঙ্গার পুল পেরিয়ে রেসকোর্সের পাশে গিয়ে পড়বে। যেখানে জোসেফের রক্ত ধুয়ে মুছে গেছে সেখান থেকে বন্দরের সম্পর্ক মুছে যেতে চাইবে বাইরের দিক থেকে। কিন্তু অন্তরে? একটা জিনিসকে চোখের আরো, আরো কাছে আনতে থাকলে, আর দেখাই যায়না এক সময়। তেমনি বন্দর তার আশ্চর্য প্রাণস্পন্দন নিয়ে রইলো আমার অন্তরের রঙমহালে।

ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীটের ঐদিকটায় মাইকেল দত্ত ষ্ট্রীটের মোড়ে সুলতারা থাকতো। এখনো কি আছে? বোধহয় না। সুলতার কি মনে পড়ে সেই খারাপ ছেলেটিকে, যে একদিন তাকে সত্যি ভালবেসে তারই জন্যে প্রাণ দিয়েছে? বোধহয় না। জোসেফের মুখ কি তার রক্তের মতোই মুছে গেছে ওর স্মৃতি থেকে? তাও বোধহয় না।

একখানা চার এঞ্জিনের ডাকোটা বিকট শব্দে উড়ে চলেছে পূব থেকে পশ্চিমে বিকেলের কাকের মতো। ওর যে যন্ত্রণা-কাতর আর্তনাদ তা মাটির টানকে অস্বীকার করার বিদ্রোহ-জিগির—। অস্বীকার করার মধ্যে যে স্বীকার করা থাকে সূক্ষ্ম শরীরে। মাধ্যাকর্ষণকে স্বীকার ক'রেই ওর চীৎকার। শান্ত হয় ও মাটি ছুঁলেই। বন্দরের এই মাইক্রোকোজম্ আমার মনের ভূগোলের নতুন একটা দ্বীপ—আমাকে টানবে চিরকাল, এমনি ক'রেই টানবে।

যতো দূরেই যাই, ডাক দিয়ে সাড়া পেতেই হবে, হবে নিতেও। ওর আকর্ষণ গুঞ্জন তুলবে মনে মনে। আর এ জগৎ তার কাজের জীবনকে পরিক্রমণ ক'রে চলবে অবিরাম

অবিশ্রাম। সাইরেনের ছুরিতে সারা দিনটা ঘণ্টার ভাগে ফালা ফালা হবে প্রতিদিন। প্রহর গুনে চলবে সাইরেন-পেচক। ভাহুড়িরা তেমনি ঘুরে চলবেন। আর সবাই আট-আট ঘণ্টায় ভাগ করে নিয়ে দিনের সুতোয় গ্রন্থি লাগাবে। কাজের বিশ্রামের, গল্প গুজবের।

আমার জন্যে এখানকার কোনোই ক্ষতি হবেনা, স্বাভাবিক-ভাবেই বাজবেনা বেসুর, পড়বেনা ছেদ। একই তালে ব'য়ে চলবে জীবন। আমার কিন্তু নিস্তার নেই। অবসরে, অনবসরেও।

একদিন মঙ্গলগ্রহের অভিযাত্রীরা স্পেসে পৌঁছবার আগে যেমন ক'রে গ্রাম্য মায়ের মতো সোনার পৃথিবীর দিকে মোহমুগ্ধ করুণাঘন দৃষ্টিতে তাকাবে শেষবারের মতো, তেমনি, আদি-গঙ্গার ব্রিজ পেরিয়ে গাড়ির মোড় নেবার অবকাশে, পেছনের কাঁচ দিয়ে আন্দাজে আন্দাজে, কাজের ধোঁয়ার চাঁদোয়া টাঙ্গানো ঘোলাটে-আকাশ-এলাকাটায়, চুরি ক'রে উঁকি দেয়া উদ্ধত ক্রেন দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া বন্দর-জগতটাতে, শেষবারের মতো প্রীতি-করুণ দৃষ্টির আলো ফেললাম। শেষবারের মতো। অন্য আহ্বান এসেছে আমার। কালের যাত্রায়, পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলেছি, সুমি। এ স্রোত আর ফিরবেনা কোনদিন। মোড়ের পুলিশকে পাশ ফেরার অবসর না দিয়ে, ষ্টিয়ারিং-এর গলা মুচড়ে মুখ বাঁকানো হ'লো গাড়ির, সাঁ ক'রে—আর্তনাদ করিয়ে—।

আর আমি শুনতে পেলাম আমার মন-ভ্রমরের গুনগুনানি —হে বন্দর, বিদায়!